ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন

রাসবিহারী দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন

রাসবিহারী দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BHARATIYA DARSHANE BHABBAD KHANDAN
(Refutation of Idealism in Indian Philosophy)
Rashbehari Dutta

প্রকাশকাল :

প্রথম মুদ্রণ—নভেম্বর, ১৯৮৯

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন, (নবম তল)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

দীপ্তি প্রিন্টার্স

৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

মূল্য : আটাশ টাকা

Published by Sri Sibnath Chatterjee, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education). New Delhi.

ভারতে লোকায়ত দর্শন চর্চার পথিকৃৎ
আচার্য দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে
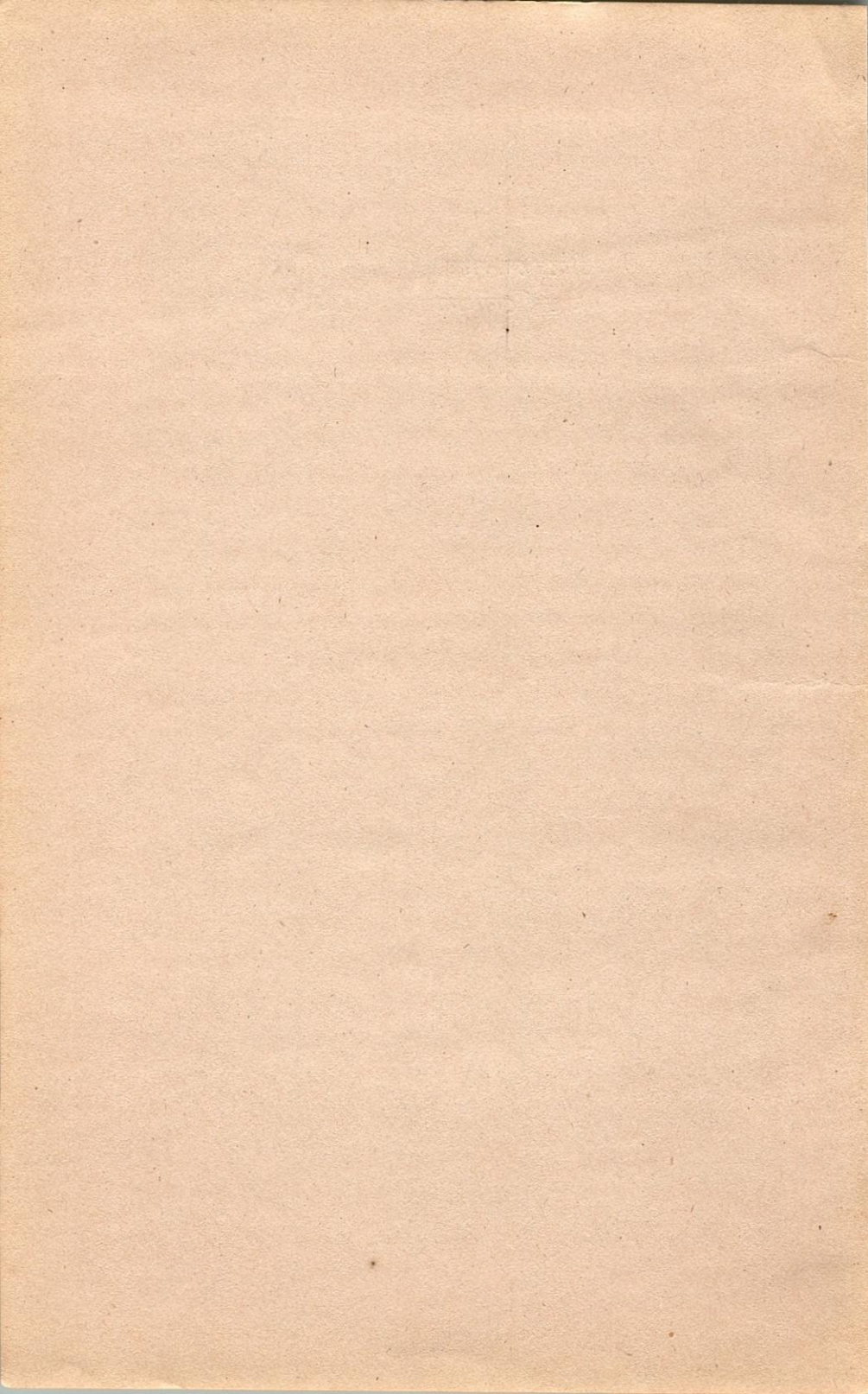
ভূমিকা

ভারতবর্ষে দর্শনচর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। সমাজ-বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে নিত্য নতুন মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় দর্শন। সমাজ পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের মানুষের চিন্তা-রাশির ঘাত প্রতিঘাতের পথ ধরে এগিয়ে ক্রমশ এই দার্শনিক চিন্তাভাবনা-গুলি বিপরীতমুখী ধারায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। একদিকে ভাববাদ অদ্বৈত বেদান্তে এসে তার পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। অপরদিকে ভূতবাদ লোকায়ত পথ ধরে বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক (?) দর্শনের অন্তঃ-স্রোতে সক্রিয় থেকে বস্তুবাদী ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছে। আশ্চর্যের বিষয় জীবনমুখী বস্তুবাদী ধারার এই প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করে অধিকাংশ মানুষ ভারতীয় দর্শন বলতে অধ্যাত্মবাদ, বড়জোর ভাববাদ বুঝে থাকেন। আর আমাদের আশৈশব শিক্ষা এই প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করতে উৎসাহী করে না। অথচ উপনিষদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত বস্তুবাদী দর্শনচিন্তার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, তা নিয়ে গর্ব করার কারণ আছে। ভারতীয় লোকজীবনের এই অন্তরঙ্গ দর্শন ভবিষ্যৎ ভারতের অন্যতম দিগ্‌দর্শন হতে পারে।

ভারতীয় দর্শনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌টির অনুকূলে বিদ্বৎসমাজের মনো-যোগ আকর্ষণ করার জন্য বর্তমান গ্রন্থটির পরিকল্পনা। এ বিষয়ের পথিকৃৎ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সস্নেহ শিক্ষা আমাকে এই কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থই যে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছি, তা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থটির রচনা ও পরিমার্জনার কাজে অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের, এম, এ, ডি, লিট (ব্যাকরণ তীর্থ) কাছে এমনই গভীরভাবে ঋণী যে তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তেমনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের নির্দেশেই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে

অধ্যাপিকা কণকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অশেষ উপকার করেছেন।

এই গ্রন্থটি রচনার সময় থেকে প্রকাশের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের লোকায়ত দর্শনচর্চার পাঠচক্রে অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস এম, এ, পি, এইচ, ডি, তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে গ্রন্থটির বিষয়বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষভাবে ঋণী আমি ইনস্টিটিউট অব ফিলোজফিক্যাল রিসার্চের অধ্যাপক নবকুমার নন্দী ও অধ্যাপক মানিক বলের কাছে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রসঙ্গে এন, বি, এর শ্রীযুক্ত বরুণ সরকার ও কবি শ্যামসুন্দর দে'র নামও উল্লেখ না করে পারছি না।

প্রকাশনার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রাক্তন কার্য নির্বাহক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা ও বর্তমান কার্যনির্বাহক অধ্যাপক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাসবিহারী দত্ত

১লা নভেম্বর, ১৯৮৯

৮৪, বি/১৫ দমদম কাশীপুর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪

সূচীপত্র

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন

প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ভাববাদ খণ্ডন

ভাববাদের অর্থ

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন বিচার দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে। প্রথমত ভাববাদ বলতে আসলে কি বোঝায়, তার সংজ্ঞাই বা কি? দ্বিতীয়ত ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের স্থান কতটুকু, কারাই বা সঠিকঅর্থে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদী বলে চিহ্নিত?

যত সহজে প্রশ্ন দুটি তুলে ধরা গেল, উত্তর কিন্তু তত সহজ নয়। দর্শনের ইতিহাসে, তা কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে, ভাববাদ যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, এ বিষয়ে কণামাত্র সংশয় না রেখেও প্রথম প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভাববাদের নির্দিষ্ট কোন স্বীকৃত সংজ্ঞা আজও নিরূপিত হয় নি। বিশ্লেষণের সময় এ তথ্য প্রমাণিত হবে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যদি ততোধিক বিস্ময়ও তুলে ধরে তবুও বলার কিছু নেই। কেননা অনেকের মতে ভারতীয় দর্শন ভাববাদসর্বস্ব দর্শন। এমনকি এমন ধারণাও বর্তমান যে ভাববাদ হলো ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিভূমি যার উপর ভর করে ভারতবর্ষের সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। এই বদ্ধমূল ধারণার সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের স্থান কতটুকু এ প্রশ্ন করাটাই তো মূঢ়তার পরিচায়ক। কিন্তু তথ্য ভিন্ন কথা বলে। বিশ্বাস ও তথ্যকে একভাবে বিচার করা সমীচীন নয়।

যুগের পর যুগ শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বংশানুক্রমে ভারতীয় দর্শন যে ভাববাদসর্বস্ব এই বিশ্বাস পোষণ করে এসেছে। অবশ্য এর পেছনে সুনির্দিষ্ট সূক্ষ্ম কারণ বর্তমান। স্বার্থরক্ষার তাগিদে? কর্তৃপক্ষই এসবের জন্য দায়ী। শিক্ষা কর্মসূচী এমনভাবে সাজানো যে শৈশব থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত উক্ত পাঠই নিতে হয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অজান্তেই প্রভাবিত হয়েছেন শিক্ষিত সমাজ। বিরল ব্যতিক্রম ভিন্ন সকল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাই রপ্ত-কথাই বলেন। শুধু

কি শিক্ষিত সম্প্রদায়, নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই শিক্ষা—ব্রতকথা, পাঁচালি, ভারতকথা, রামায়ণ গান, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভাবিত করা হয়েছে। আর নানান সংস্কারের মাধ্যমে এমন বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে, যে ভাববাদের বিরোধিতা যারাই করে তারা বিধর্মী, পাপী, নরকগামী, ঘৃণ্য। তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো বারণ।[1]

যত সহজে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলো তত সহজে কিন্তু এই বক্তব্য সূচীমুখ পায় নি। দীর্ঘ অনুশীলনের পর আধুনিক চিন্তাবিদগণ, ঐতিহাসিক কি দার্শনিক, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সম্পত্তি সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি। বৈদিক সাহিত্যে শ্রেণীর উল্লেখ পাই সব থেকে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের দশম মণ্ডলে দ্বাদশ ঋক্[2]-এ সর্বপ্রথম যে শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তা যথাক্রমে দ্বিজ ও শূদ্র। দ্বিজ হলো যাদের দুবার জন্ম। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ও উপনয়নে। দ্বিজদের মধ্যে আবার ভাগ ছিল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্য। যাগযজ্ঞ, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ব্রাহ্মণরাই করতেন। যুদ্ধ বিগ্রহ শাসন পরিচালনা যারা করত তারা রাজন্য। ক্ষত্রিয় নাম তখনও সমাজে প্রচলিত হয় নি। বৈশ্য সম্প্রদায় কৃষিকর্ম ও বাণিজ্যে পটু। এরা সকলেই আর্যসম্প্রদায়ভুক্ত। আর ভারত আগমণের পর স্থানীয় অধিবাসীদের যখন যুদ্ধে পরাজিত করতো তখন বিজিত অধিবাসীদের বেঁধে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করত। শ্রেণীগর্ব ও পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষায় সেই ক্রীতদাসদের আর্যদের সেবায়, পরিচর্যায় লাগানো হত। ক্রমে আর্য সম্প্রদায় পরিণত হয় শাসক সম্প্রদায়ে আর স্থানীয় বিজিত অধিবাসী পরিণত হয় প্রজায়। এইভাবে আর্যরা হয় শাসক, অনার্যরা শাসিত। তবে সব সময় যে এই বিভাজিকা অটুট ছিল তা নয়। কিন্তু আর্য প্রাধান্য কালে কালে তাদেরই আচার বিচার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। ফলে আর্য ও অনার্য, শাসক ও শাসিত চিহ্নিত হয় দ্বিজ ও শূদ্র হিসেবে। দ্বিজ শাসকশ্রেণী, শূদ্র শাসিত শ্রেণী। এখানে একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরী। ঋগ্বেদের শুরুতে যে মণ্ডলগুলি বর্তমান সেখানে শূদ্রদের কোন প্রকার উল্লেখ নেই। দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্তে এসে তার পরিচয় পাই। কোন কোন পণ্ডিতদের মতে দশম মণ্ডল হলো প্রক্ষিপ্ত অংশ। যাই হোকন কোন বর্ণভেদ প্রথা শাসক

শ্রেণী উদ্ভাবিত কৌশল এ বিষয়ে আধুনিক চিন্তাবিদগণ অনেকাংশেই একমত। আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরতে পারি। "...শূদ্ররা আসলে ছিলেন আর্যদের হাতে পরাভূত ও বশীভূত স্থানীয় অধিবাসী।"[৪] শুধু যে ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে তা নয় পরবর্তীকালে বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে যখন বিমূর্ত সত্তার আবির্ভাব-ক্ষণ বিশেষ করে উপনিষদ পর্যায়ে এ নিয়ে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে।[৫] বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে এই জগত পূর্বে ব্রহ্ম রূপেই বর্তমান ছিল। তিনি নিজেকে জানলেন 'আমিই ব্রহ্ম'। আমি একা, তাই সম্পূর্ণ ব্যক্ত নয়। এই ভাবে তিনি ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করলেন। এই ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। তাই রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নীচেই বসেন। তারপরও ভাবলেন তিনি সম্যক্ ব্যক্ত নন। তিনি বৈশ্যজাতি সৃষ্টি করলেন। তবুও অপূর্তি তাঁকে চিন্তিত করল। তিনি শূদ্র জাতি সৃষ্টি করলেন। শূদ্র জাতি সকল মানুষকে পোষণ করে। এতেও তিনি পরিতৃপ্তি বোধ করলেন না। তিনি ধর্ম সৃষ্টি করলেন। এই ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ও ক্ষত্রিয়। এই ধর্মই সত্য, সত্যই ধর্ম।

এই উপাখ্যানটি অতীব চিত্তাকর্ষক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র জাতি সৃষ্টি করেও নিস্তার নেই। শাসন নিরূপদ্রব নয়। শাসনকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে গেলে আইনের প্রয়োজন। ধর্ম অর্থে নিয়মকানুন, আইন বোঝাচ্ছে। বর্তমানে যাকে আমরা আইন বলি প্রাচীনকালে তাকেই ধর্ম বলা হত। এই ধর্ম বা আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই আইনই শক্তি। কেননা এই আইনের সাহায্যে বলহীন লোকও বলবানকে শাসন করে থাকে। এই আইনই সত্য, সত্যই আইন। এইভাবে এখানে দর্শন ও রাজনীতিকে একাকার করে দেখা হয়েছে। দার্শনিকের কাজ হলো সত্য অনুসন্ধান। আবার সত্য আর কিছু নয় চূড়ান্ত আকারে আইনই। এই আইনের সাহায্যে শাসক-সম্প্রদায় শাসন বজায় রাখে। এই বক্তব্য থেকে যা প্রমাণিত তা হলো শিক্ষা-দীক্ষা-সামাজিক আদর্শ অনিবার্যভাবে শাসন নিয়ন্ত্রিত। কর্তৃপক্ষই নিজের প্রয়োজনে সকল কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে মানুষের সামনে হাজির করে। ফলে চলমান সমাজ-আদর্শ শ্রেণী-আদর্শ হিসেবে প্রতিফলিত।[৬] আর ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে তা যে কতখানি চণ্ড পদ্ধতিতে ব্যবহৃত

তার উদাহরণ তুলে ধরলে পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন। শাসনে অনুশাসনে ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে দুই প্রকারের শাস্ত্র সমধিক প্রসিদ্ধ, যথাক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি। বেদ হলো শ্রুতি আর ধর্মশাস্ত্র হলো স্মৃতি। সকল ধর্মের মূল হলো এই শাস্ত্র। এ নিয়ে কোন তর্ক করা চলবে না[৬]। বেদ হল ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বাণী। আর স্মৃতি হলো ব্রহ্মার পৌত্র স্বয়ম্ভূ মনুর বাণী[7]। ফলে উভয়ই অবশ্য পালনীয় কর্তব্যে পড়ে। এই কর্তব্য গুলি কি? কারা, কিভাবে পালন করবে? এ প্রসঙ্গে মনুর স্পষ্ট উক্তি—বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থপাঠ ইত্যাদিতে কেবল দ্বিজ-দেরই অধিকার আছে। অর্থাৎ দ্বিজদেরই কেবলমাত্র মনন করার অধিকার রয়েছে, শূদ্রদের নেই। তাহলে শূদ্রদের অধিকার কি? মনু বলেছেন, পরমপিতা ব্রহ্মা শূদ্রদের জন্য একটি কর্মের ভারই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা হলো[৪] দ্বিজসম্প্রদায়ের সেবা শুশ্রূষা করা। অর্থাৎ শূদ্রদের কেবল শ্রমের অধিকার রয়েছে। এখান থেকে স্পষ্টই অনুমেয় যে দ্বিজসম্প্রদায় অবসরের সঙ্গে যুক্ত আর শূদ্র সম্প্রদায় শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। এই ভাবে ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে কর্ম ও শ্রমকে ঘৃণা করা হয়েছে। আর শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মানুষের চেয়ে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মনুই মানবধর্মশাস্ত্রে বলছেন তাদের আহারের জন্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণ বসন ও তৃণশয্যাই যথেষ্ট[৯]। তাদের ধনসঞ্চয়ের কোন অধিকার নেই। তাতে অবসরভোগী সম্প্রদায়ের প্রভূত কষ্ট হবে। আর ধনসঞ্চয় করবেই বা কেন তাতে তাদের কোন লাভই নেই। কারণ কেবল দাসত্ব করার জন্য তারা সৃষ্ট। প্রভু যদি কোন ভাবে কোন দাসকে মুক্তিও দেন তাহলেও শূদ্র কোনদিন দাসত্ব মুক্ত হতে পারে না[10]। এভাবে কেবল শূদ্রকে যে বেঁধে ফেলা হয়েছে তাই নয়। এমনকি দ্বিজ সম্প্রদায়কেও নানাভাবে অনুশাসনের শেকলে বেঁধে ফেলা হয়েছে। এই সকল অনুশাসন শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমেই করা হয়েছে। মনু স্পষ্ট করেই বলেছেন এমনকি দ্বিজসম্প্রদায়ের কেউ কেউ যদি শ্রুতি-স্মৃতির অবমাননা করে তাহলে তাদের যে শুধু ঘৃণা প্রকাশ করা হবে তাই নয় সাধু ব্যক্তিরা সমাজ থেকে তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেবেন[11]। এই ভাবে আমরা একের পর এক উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি যার মধ্য দিয়ে দেখাতে পারি যে

দর্শনের সঙ্গে রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। যেমন শাসনবজায় রাখার জন্য আইনের প্রয়োজন তেমনই ভাবজগতে শাসন বজায় রাখার জন্য অনুশাসনের প্রয়োজন। আর সেই অনুশাসনের জন্য যে মাধ্যম প্রয়োজন তা হলো সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন। এই ভাবে একে একে সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন ক্রমশই কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী কালে কালে গড়ে উঠেছে। আর অপাঙ্‌ক্তেয় শিক্ষা বঞ্চিত শূদ্র সমাজের মধ্যেও তা চারিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রতকথা, পাঁচালী, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে। দ্বিজসম্প্রদায়ের থেকে বহুদূরে হলেও তারা এই সব কথকথার আসরে উপস্থিত থেকে ধর্ম কথা শুনতো। ভয়-ভীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ-স্নেহ-ভালোবাসা সবেতেই মুখরোচক কাহিনীর পাঁচন তৈরি করে এই সব সভায় পরিবেশন করা হত। ফলে চলমান যুগের সমাজ, মানুষ সেই যুগের শাসন নির্দিষ্ট সমাজ-আদর্শকে ধ্যান-জ্ঞান করতে বাধ্য হত। ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের উপর পীড়ন তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলায় সেই সামাজিক আদর্শকেই তারা মনন করে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হত। কিন্তু এত সব করেও ব্যতিক্রমী ধারা প্রবাহকে আটকে রাখা যেত না। কারণ শাসিত প্রজার ক্ষোভ-দুঃখ-সংগ্রামও অনুরূপ এক অন্তঃপ্রবাহ যা শাসক চক্ষুর অন্তরালে যথারীতি প্রবাহিত থাকত। তাই সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনে তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি আত্মপ্রকাশ করেছে চিরটাকাল।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে সেই ব্যতিক্রমী স্রোতকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই ব্যতিক্রমী স্রোত যে তৎকালীন শাসক-সুধী সমাজকেও চিন্তিত করত তার প্রমাণ তাদের আদেশ-নির্দেশ-ফরমান থেকেই অনুধাবন করা যায়। যে শ্রুতিকে তাঁরা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলেছেন এক সময় সেই শ্রুতি বা বেদকেই আবার অপাঙ্‌ক্তেয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন[১২]। কেননা শ্রুতি, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, ধনুর্বেদ, নক্ষত্র বিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা, নীতিশ্রাস্ত্র, ভূতবিদ্যা কেবল মন্ত্রবিদ্‌ করে তোলে। আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয় না। এগুলি নামসর্বস্ব বিষয়মুখ। বিমূর্ত, বিষয়বিমুখ বিদ্যা এ সকল নয়। এ গুলি তাই বর্জনীয়। এরই জন্য আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিন, বলে নারদ ব্রহ্মবিদের দ্বারস্থ হন।

এই ভাবে দেখা যায় যে, যে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হচ্ছিলেন, যুগের প্রয়োজনে সেই সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনকেই অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। কারণ অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে সেগুলি সুপ্রযুক্ত নয়। ফলে দেখা যায় বেদের অন্তভাগ উপনিষদই প্রাধান্য লাভ করে। উপনিষদে বেদ নিন্দিত হতে থাকে। সমাজে উপনিষদ ক্রমশই মহনীয় হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে অসংখ্য উপনিষদ।

কিন্তু কালে কালে সেই উপনিষদও নানাভাবে নিন্দিত হয়। কারণ সমাজদ্বন্দ্ব উপনিষদগুলিকে বেশি বেশি আশ্রয় করতে থাকে। উপনিষদ নামের গ্রন্থে শিক্ষা-সংস্কৃতির জগত ভরে ওঠে। তা যে মহনীয় নয়, তা ভাবাদর্শ সংরক্ষকদের প্রচেষ্টায় উপলব্ধি করা যায়। যার পরিণতিতে দেখি কেবল মূল এগারটি উপনিষদই বেদান্ত নামে টিকে থাকে। আর অসংখ্য উপনিষদ কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যায়। যেগুলি টিকে থাকে তাতে শ্রেণী ভাবাদর্শ অটুট। বেদান্তে যে ভাবাদর্শ সূচীমুখ তাই ভাববাদ নামে চিহ্নিত।

যুগের পর যুগ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই ভাববাদ তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বজায় রেখে এসেছে শাসনে-অনুশাসনে। স্বভাবতই এ কথা দাবী করা যেতে পারে যে ভাববাদ কি, এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া এমন কি কঠিন কাজ? বরং বেশ সংক্ষিপ্ত কথায় ভাববাদকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে।

এখন আমাদের ভাববাদের অর্থ ও তার সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রয়োজন। দর্শনের ইতিহাসে, ভাববাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা থেকে একথাই ভাবা স্বাভাবিক যে ভাববাদের অর্থ সুস্পষ্ট। তার স্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বর্তমান। কিন্তু তথ্য বিপরীত সিদ্ধান্ত তুলে ধরে[১৪]। হতবাক্ হওয়ার কথা এই যে ভাববাদের এখনও পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই।

ভাববাদ শব্দটিকে ঘিরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। নানান চিন্তাবিদ শব্দটিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সবগুলোরই যে দার্শনিক তাৎপর্য যথাযথ তা ভাববার কোন কারণ নেই। কেননা এই

সব সংজ্ঞা সব ভাববাদী সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে যারা ভাববাদী বলে স্বীকৃত তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে নি।

তার অর্থ এই নয় যে ভাববাদ সম্পর্কে কোনপ্রকার ধারণা করা যাবে না। ভাববাদ তার জটিল প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণের হাতে বিভিন্নমুখী রূপ পেলেও সকল প্রকার বিভিন্নতার মধ্যে তার একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি রয়েছে। এই ভাববাদ বিভিন্ন ভাববাদী সম্প্রদায়কে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্যে সমন্বয় সাধন করে আসছে। ভাববাদের অর্থ ও সংজ্ঞা নিরূপণের প্রচেষ্টা এখান থেকেই শুরু করা যেতে পারে।

চিন্তাবিদ রাধাকৃষ্ণণের মতে[14] প্রাচ্যে আর্য ঋষিগণ যখন বেদ-উপনিষদে ভাববাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন, সক্রেটিস এবং প্লেটো সেই কাজ করেছেন পাশ্চাত্য দর্শনে। তিনি দীর্ঘ অনুশীলনের পর স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁাচেছেন, আমরা যদি পরস্পরবিরোধী দর্শন সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মূল স্রোতধারা লক্ষ্য করে এগোই, ভাষা ও পরিবেশন প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভাববাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হব। বিশেষ করে যে শক্তি সমস্ত ভাববাদী সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করে রেখেছে।

আমরা রাধাকৃষ্ণণ নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু তবুও নিশ্চিত যে ভাববাদ শব্দের বহুল ব্যঞ্জনা এড়ানো যাবে না। কারণ সম্পূর্ণ কল্পাশ্রয়ী হলেও যুগের পর যুগ ভাববাদ বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে করতে নানান রূপে সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভাববাদ শব্দটি ভাব বা ধারণা থেকেই এসেছে। ভাব বা ধারণা আসলে হলো চিন্তা। কিন্তু সাধারণ অর্থে যে কোন প্রকার চিন্তাকে বুঝলে ভুল করা হবে। ভাব বা ধারণা বলতে এখানে বিশিষ্ট চিন্তা 'শুদ্ধ চৈতন্য' অর্থে বোঝানো হয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মানুষ প্রতিনিয়ত এই পৃথিবীতে নানা বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে জীবন অতিবাহিত করে আসছে। নিরাপত্তার স্বার্থে মাথা খাটিয়ে ঘর গড়ে প্রকৃতিকে বশে এনে নিজের সুখ সমৃদ্ধির সর্বৈব চেষ্টা করেছে। ফলে মানুষের বুদ্ধিই তার প্রধান চালিকাশক্তি। আমরা যে

কোন কাজ করি না কেন তার পূর্বে একটা পরিকল্পনা করি। যেমন আগে ভাগে ভেবে নিই কি করতে যাব বা কি করা দরকার। আর কিভাবে করব ইত্যাদি। বোঝার সুবিধার্থে একটা বাস্তব উদাহরণ নেওয়া যাক। বাস্তবে যে কোন কাজ করার পূর্বে ভাবনা বা ধারণা করা প্রয়োজন। যেমন সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে ইঞ্জিনীয়ারের প্ল্যান, ছক বা পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই ছক অনুযায়ী রাজমিস্ত্রী বাড়িটি তৈরি করে। ছক না থাকলে চূণ, ইট, সিমেন্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও বাড়ি তৈরি হয়ে যায় না। এমন কি মিস্ত্রী থাকলেও না। সেই রকম এই ক্ষুদ্র বাড়ি থেকে শুরু করে তাবৎ বৃহৎ বস্তু বা বিষয়ের পেছনে কারো না কারো প্ল্যান বা পরিকল্পনা আছে।

এই ভাবে আমরা এই ছোট খাটো বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে যদি সুবিশাল বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবি তাহলেই বুঝতে পারব, না জানি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পেছনে কতখানি শক্তিধরের পরিকল্পনা রয়েছে। যদি বাড়ি থেকে শুরু করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছোই তবে আমরাও কল্পনা করতে পারব যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে সেই পরিকল্পনা বা ছক। সেই পরিকল্পনা বা ছকই হলো ভাব, চিন্তা বা ধারণা।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যাবে যে এই ভাব বা ধারণা যে কোন সাধারণ মানুষের ভাবনা বা ধারণা নয়। কেননা সাধারণ মানুষের ভাবনা বা ধারণা সীমিত। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা পোষণ করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। সেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি নন— স্বয়ং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। অতএব সর্বশক্তিমান ভগবানই হলেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই ভাব ধারণা বা পরিকল্পনা থেকেই জগতের সৃষ্টি। এই ভাব বা ধারণা আসে মন থেকে মন আবার আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। ফলে আত্মাই পরম বা চরম অস্তিত্ব। যেখান থেকে সকল কিছুর সৃষ্টি। এই আত্মা অসীম, অনন্ত, অজর, অমর, সর্বব্যাপী ও শুদ্ধচৈতন্য। ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই এই আত্মা থেকে আসে আবার অবশেষে এই আত্মাতেই বিলীন হয়। আত্মাই ব্রহ্মের শাশ্বত

অধিবাস, একমাত্র স্থান। এই জগত আত্মাময়।

আমরা যত সহজ ও সরল করে ভাববাদের ব্যাখ্যা করলাম আদপেই ভাববাদ এত সহজ ও সরল নয়। ভাববাদের সংজ্ঞা আলোচনাই তার প্রমাণ। ভাববাদের আমরা বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা পাই। কারলাইল[15] ব্যক্তিগত ভাববাদের কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত ভাববাদ বলতে এখানে কর্তব্য ও শৃঙ্খলার নিয়মে বাঁধা জাগতিক বা বৈষয়িক জীবনের আদর্শের কথা বলা হয়েছে। কারলাইল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এই ব্যক্তিগত ভাববাদ মুখ্যত ঐহিক সুখ সর্বস্ব চরম ভাববাদের বিরোধিতা করেই গড়ে উঠেছে। ফলে ব্যক্তিগত ভাববাদ কালে কালে যে আকার ধারণ করেছে তা হলো ধর্মীয় নীতি নিয়ম নিয়ন্ত্রিত আধ্যাত্মিক জীবন যা আমরা পুরাণ-পুঁথি ও গল্প-উপন্যাসে পেয়ে থাকি। প্রাচ্যে যেমন পুরাণ-পুঁথির উদাহরণ তুলে ধরা যায়। তেমনি পাশ্চাত্যে গল্প-উপন্যাস হিসেবে দান্তের ডিভাইন কমেডিয়া ও গ্যায়টের ফাউস্ট এর উল্লেখ করতে পারি।

কারলাইল আলোচিত ব্যক্তিগত ভাববাদ ছাড়াও একদল চিন্তাবিদ ভাববাদের শাশ্বত বা চিরন্তন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে ভাববাদ বলতে এক অবিনশ্বর পরম সত্তার তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। যা শুদ্ধ চৈতন্য, বুদ্ধ, একমাত্র সত্তা। এই শুদ্ধ চৈতন্য বা পরমাত্মা থেকেই এই বৈচিত্র্যময় জগৎ এসেছে। জাগতিক ভোগের শেষে, পুনরায় পরমাত্মাতেই সকল কিছু বিলীন হয়। এই পরমাত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়-কর্তা। কিন্তু এই পরমাত্মা সর্বস্ব ভাববাদের কোন সঠিক স্বীকৃত রূপ নেই। এই ভাববাদকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরোধাদের নাম উল্লেখ করতে পারি। যথাক্রমে যাজ্ঞবল্ক্য-প্লেটো, শঙ্কর-স্পিনোজা, বসুবন্ধু-বার্কলে ইত্যাদি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার যে যাজ্ঞবল্ক্য ও প্লেটো, শঙ্কর ও স্পিনোজা যেমন ভাববাদকে তত্ত্ববিদ্যাগত দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তেমনই বসুবন্ধু-বার্কলে জ্ঞানবিদ্যাগত দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। শুধু পাশ্চাত্য দর্শনেই ভাববাদের যে বিভিন্ন প্রকার পাই তা হলো—প্লেটোর তত্ত্বগত ভাববাদ, বার্কলের

আত্মগত ভাববাদ, কান্টের আভাসিক ভাববাদ ও হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ ইত্যাদি। আধুনিক পণ্ডিতগণ কার্যতই বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হন যখন একই ভাববাদ নিয়ে নানারকম বৈপরীত্যের সন্ধান পান।

তা বলে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে এর থেকে দূরে থেকেছেন তা কিন্তু নয়। এখানে আমরা আধুনিক বিদ্বান অধ্যাপক ইউয়িং এর নাম উল্লেখ করতে পারি। ইউয়িং পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁর বৃহদায়তন গ্রন্থে ভাববাদের বিভিন্ন দিকের এক মনোজ্ঞ চুলচেরা বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। প্লেটো থেকে শুরু করে আধুনিক চিন্তাবিদ ক্রোচে, কানিংহাম, জেন্টিল পর্যন্ত ভাববাদের সকল পুরোধাদের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন। বর্তমানে সেই সকল চিন্তাবিদগণের উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করে অধ্যাপক ইউয়িং নিজে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তারই উল্লেখ করব।

অধ্যাপক ইউয়িং[16] বলেছেন উক্ত দার্শনিকগণ তাঁদের নিজ নিজ ব্যাখ্যার বিভিন্নতার অধিকারী হলেও তাঁরা যে আসলে ভাববাদী এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। আবার স্পষ্ট করে এও বলেছেন এর মানে এই নয় যে এঁরা কোন স্বীকৃত সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে পেরেছেন। অথচ সাধারণের স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। স্মিথ তাঁর গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, যে সকল দর্শন সর্বসম্মত ভাবে স্বীকার করে যে আধ্যাত্মিক সত্তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে, তারা ভাববাদী। অধ্যাপক ইউয়িং স্মিথের এই বক্তব্য অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত করলেন, স্মিথের সিদ্ধান্ত ব্যাপকতা লাভ করে যদি বলা যায় 'ঈশ্বরে বিশ্বাসী মাত্রই ভাববাদী'। এখান থেকে ভাববাদ কি, তার একটি মোটামুটি সাধারণ ধারণা পেলাম। এই সিদ্ধান্তটি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা পরে বিবেচিত হবে।

এবার দ্বিতীয় ভাবনার প্রসঙ্গে আসি। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের স্থান নিয়ে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর একজন পণ্ডিত ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ আলোচনা করতে গিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের আদৌ কোন স্থান আছে কি? এই প্রসঙ্গে তিনি সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে যে ঝড় উঠেছিল তার কথা উল্লেখ

করেছেন। আর তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তাঁর গবেষণা গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ক্ষুরধার যুক্তিগুলোর সমাহার করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মিলিত সিদ্ধান্ত হলো : ভারতীয় দর্শনে কোন ভাববাদ নেই। কারণ তার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো স্বতন্ত্র স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। অধ্যাপক পি, টি, রাজু[17] বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। কেননা ভাববাদকে ঈশ্বরবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে সমমূল্যায়ন কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। আর এই বক্তব্য থেকে তো কোনমতেই স্বীকার করা যায় না যে ভারতীয় দর্শনে কোন ভাববাদ নেই। বরং উল্টোটাই ঠিক। আধুনিক পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[18] পূর্বসূরীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ তো আছেই, আর তা কোথায় কোথায় কোন কোন দার্শনিক ও কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় কিভাবে তুলে ধরেছেন তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ভারতীয় দর্শনে উপনিষদ-চিন্তাবিদদের কয়েকটি শাখা, মহাযান বৌদ্ধ ও অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় ভাববাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সতর্কীকরণ ও করেছেন এই বলে যে পরিসর যাই হোক না কেন এর থেকে এমন কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয় যে ভাববাদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা সীমিত। বরং তিনি একথা জোর দিয়েই বলেছেন যে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ যত স্বল্প পরিসরে অগ্রসর হোক না কেন তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব যে কুঁড়েঘর পর্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে বিস্তৃত তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না। পাঠক মাত্রেই নিজের নিজের জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করেছেন। অতএব স্বীকৃত সত্য হলো এই যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

এখান থেকে এটুকু স্পষ্ট যে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের স্থান নিয়ে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় ভাববাদ কোঠা থেকে যে কুঁড়েঘর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। এখন যেটুকু পর্যালোচনা করার তা হলো ভাববাদের স্থান কতটুকু। কিংবা কারাই বা সঠিক অর্থে ভাববাদী।

এখন প্রশ্ন আমরা কি ইউয়িং আলোচিত ভাববাদের নিরিখ নিয়েই

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের অবস্থার পর্যালোচনা করব? এর উত্তরে বলা যায় যে অধ্যাপক ইউয়িং যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা সম্পূর্ণত পাশ্চাত্য দর্শন নির্ভর। প্রাচ্য দর্শন চিন্তার সমূহ প্রতিফলন এখানে সঙ্গত কারণেই অনুপস্থিত। আমরা যদি ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউয়িং-এর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভাববাদী দার্শনিকগণের অধিকাংশই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসাবে ঈশ্বরকে মানতে রাজি নন। এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তারূপে ঈশ্বরকে সরাসরি অস্বীকার করেই তাঁদের মতবাদ গড়ে তুলেছেন।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের সর্বজন স্বীকৃত জনক নাগার্জুন। তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব শূন্যবাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সম্ভবপর সকল রকম অস্তিত্বই দ্বিধাহীনভাবে খণ্ডন করেছেন। ভাববাদের সমর্থনে তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হলো মধ্যমক শাস্ত্র। ঈশ্বরতত্ত্ব খণ্ডন ও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ঈশ্বরতত্ত্ব খণ্ডন রূপ আলোচনার জন্য একটি ছোট রচনা লিখেছিলেন[১৭]: **ঈশ্বর কর্তৃত্ব নিরাকৃতি বিষ্ণোঃ এক কর্তৃত্ব নিরাকরণ**। তিনি এখানে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন অথবা প্রচলিত ধারণা যে বিষ্ণু হলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা তা নানান যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন। এখন প্রশ্ন নাগার্জুন যদি ভাববাদীই হন তাহলে ঈশ্বর খণ্ডন রূপ ভাববাদ পরিপন্থী কাজ করতে গেলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী আলোচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য আলোচনা করলে দেখা যাবে ঈশ্বর খণ্ডনরূপ এমন দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু নাগার্জুন নিয়ে আরো কৌতূহল জাগানো প্রশ্ন পাঠকের মনে উঁকি দিতে পারে। আর তা যুক্তিযুক্ত, অনিবার্যও। কারণ ভারতীয় দর্শনের অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রই জানেন যে নাগার্জুন বুদ্ধদেবের শিষ্য। বৌদ্ধ দার্শনিক হিসাবে পরিচিত। বৌদ্ধদর্শন সূচনালগ্ন থেকেই বেদ-উপনিষদ-বিরোধী আর্য সংস্কৃতির প্রতিবাদী দর্শনরূপে চিহ্নিত। স্বয়ং বুদ্ধদেবই আর্য সংস্কৃতির গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়

আপামর শূদ্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যসর্বস্ব, রাজন্যপুষ্ট মন্দিরে মন্দিরে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছেন। যিনি শিষ্য পরম্পরায় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে উৎসাহিত করা তো দূরের কথা কখনো শিষ্যদের মধ্যে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সুযুক্তি সহকারে নিবারিত করতেন। এ নিয়ে এক বহুল শ্রুত গল্পও আছে বৌদ্ধ পুস্তিকায়[২০]।

শিষ্য পরিবৃত বুদ্ধদেব একদিন নানান দার্শনিক উপদেশ দিচ্ছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহল বশতঃ প্রশ্ন করে: এই জগত ছাড়িয়ে কি অতীন্দ্রিয় জগত রয়েছে? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা? সুখ-দুঃখ কন্টকিত জীবন কি ঈশ্বর বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন? এই সকল প্রশ্নের সময় বুদ্ধ মৌন ছিলেন। তাঁর মৌনীভাব শিষ্যদের নিরাশ করে। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। তাঁর মতে মানুষ যখন 'ক্ষুৎ-তৃষ্ণাকাতর' দুঃখ কষ্টে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে তখন এইসব প্রশ্ন মূল্যহীন।

বেদ-উপনিষদ-বিরোধী, আর্য-সংস্কার-বিরোধী বৌদ্ধদর্শনই যে কি করে কালে কালে ভাববাদসর্বস্ব দর্শন হয়ে উঠল তা গবেষণার বিষয়। আধুনিক চিন্তাবিদ রিস ডেভিড্‌স্ বলেছেন বুদ্ধদেব নিজেই বৌদ্ধদর্শনের এই পরিণতির কথা আশঙ্কা করেছিলেন[২১]। বিশেষ করে যখন উচ্চ-বিত্তদের মধ্য থেকে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল বৌদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন দেখা গেল নাগার্জুন, অশ্ব ঘোষ প্রমুখ শিষ্যগণ ভাববাদের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই রূপান্তর কিভাবে সম্ভব হলো এ নিয়ে পাঠক মনে ধাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের পূর্বাপর ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের এই কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবে।

বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে অন্যতম নাগার্জুন ও অশ্বঘোষ সহ মহাযান বৌদ্ধাচার্যগণ মূল বৌদ্ধদর্শন থেকে দূরে সরে গিয়ে বৌদ্ধ আঙ্গিকেই সম্পূর্ণ নতুন দর্শন ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। ফলাও করে ঢাক পিটিয়ে মহাযানগণ এ কাজ করেন নি। বরং এ কাজ করেছেন নিঃশব্দে থেকে থেকে বৌদ্ধ দর্শনের প্রচ্ছায়ায়। নাগার্জুন কিংবা অশ্বঘোষ তাঁদের প্রচারিত শূন্যবাদ কিংবা বিজ্ঞানবাদ, মূল বৌদ্ধদর্শনেরই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এ কথা বিশেষ জোর

দিয়েই বলেছেন।

শূন্যবাদ নাগার্জুন প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ দৃষ্টিতে শূন্যবাদকে প্রায় নাস্তিক্যবাদ মনে হবে। কিন্তু এই শূন্যবাদকে বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদের আলোকে বিচার করলে ভুল করা হবে। নাগার্জুনও নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু নাগার্জুনের নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি বৌদ্ধ ধারানুসারী বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনোই ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করেন নি। তাঁর ঈশ্বরবাদ খণ্ডন ভাববাদের ভিত্তি স্থাপনের জন্যই।

নাগার্জুন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে চরম ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঈশ্বরবাদ খণ্ডন অপরিহার্য। তাই নাগার্জুন প্রতিষ্ঠিত শূন্যবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো আমরা যে জগতে বাস করি তা সম্পূর্ণতই অলীক। আর যেহেতু অলীক তার উদ্ভবের প্রশ্ন ওঠে না। অতএব এই জগতের একদিন উদ্ভব হয়েছে এই চিন্তাও উদ্ভট।

নাগার্জুনের মতে এই জগত উদ্ভূত একথা স্বীকার করলে তো অনিবার্যভাবেই ঈশ্বরবাদ স্বীকার করতে হয়। কেননা যার উদ্ভব বা সৃষ্টি আছে তার উদ্ভবকর্তা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে উদ্ভূত বিষয়ের অস্তিত্বও আছে। কারণ স্রষ্টা যা সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণত শূন্য অস্তিত্বহীন একথা অসংগত ও পরস্পরবিরোধী।

তাই নাগার্জুন প্রতিষ্ঠিত শূন্যবাদের মূল বক্তব্য পরম সত্তা বা চরম অস্তিত্ব শূন্যতা বা তথতা। আর সবই অলীক। বাহ্যবস্তু বলে কিছু নেই। কিন্তু এই শূন্যতার অর্থ নাস্তিক্য নয়। অনস্তিত্বও নয়। অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোন কিছু দিয়েই এই শূন্যতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে শূন্যতা বা তথতা, পারমার্থিক সত্য বা একমাত্র তত্ত্ব। নাগার্জুনের মতে এই দৃশ্যমান জগত হলো বিভিন্ন সম্বন্ধ সৃষ্ট এক অধ্যাস। বস্তুমাত্রেই সম্বন্ধনির্ভর, আপেক্ষিক। আর যা আপেক্ষিক তা স্ববিরোধী। কিন্তু সত্তা কখনোই স্ববিরোধী হতে পারে না। স্ববিরোধিতাপূর্ণ সকল কিছুই অসত্য। এই দৃশ্যমান জগৎ তাই অসৎ। মাধ্যমিক মতে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক নির্বিকার পারমার্থিক সত্তা বর্তমান। এইভাবে নাগার্জুন দু'প্রকার

সত্যের যথাক্রমে সংবৃতি ও পারমার্থিক সত্যের কথা বলেছেন। সংবৃতি সত্য জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রজ্ঞার মাধ্যমেই এই সংবৃতি সত্য থেকে পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পরমার্থ উপলব্ধিই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাই মুক্তি। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ মায়িক, অবভাস মাত্র। অতএব জগৎ সম্পর্কিত লোক ব্যবহারমূলক জ্ঞান মিথ্যা বা ভ্রম। এইভাবে নাগার্জুন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে রহস্য উদ্দীপক অভিনব উপলব্ধি তুলে ধরলেন। নির্বিকার, নিরবয়ব, অনির্বচনীয় পরমসত্তা, শূন্যতা বা তথতাই একমাত্র তত্ত্ব যা চরম ভাববাদকেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

নাগার্জুনের এই ভাববাদকে যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে অধ্যাপক ইউয়িং শেষ পর্যন্ত স্মিথের বক্তব্য অনুসরণ করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে ঐশ্বরিক কোন সত্তা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছেন তা আদৌপেই ধোপে টেকে না। আর তা হবে শূন্যবাদের তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঝুঁকিসর্বস্বও। কারণ স্মিথের যে উপলব্ধ তত্ত্ব তা জগতের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেই। কিন্তু চরম ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে ঈশ্বরতন্ত্রের অস্বীকার করতেই হয়। চরম ভাববাদ বা ঈশ্বরবাদ পরস্পরবিরোধী। একটির প্রতিষ্ঠা করতে হলে অপরটির নস্যাৎ প্রয়োজন।

অবশ্য এখান থেকে একথা ধরে নেওরার কোন হেতু নেই যে নাগার্জুন আধ্যাত্মিকতাকে পুরোপুরি বর্জন করেছেন। পরবর্তীকালে নিজস্ব উপলব্ধি থেকে বুঝেছিলেন যে শূন্যবাদকে শেষ পর্যন্ত নস্যাৎবাদ বলে যেন কেউ ভুল না বোঝে। ঠিক এই কারণেই নাগার্জুন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

নাগার্জুন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব নিয়ে সমকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে যে আলোচনা পাওয়া গিয়েছে সেখানে নাস্তির বদলে অস্তির সপ্রশংস উপলব্ধি-পূর্ণ মূল্যায়ন রয়েছে। শূন্যতার অর্থ তথতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সতর্কীকরণ-সহ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে তিনি মূল্য দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এই আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব পরম বা চরম সত্তার বোধ থেকেই উপলব্ধি করতে হবে।

অতএব চরম ভাববাদই এখানে নাগার্জুনের দর্শনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে চিহ্নিত। চরম ভাববাদে বস্তুজগতের কোনরূপ অস্তিত্ব নেই। আর

যেহেতু বস্তুজগত নেই নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসেবে ঈশ্বরেরও প্রয়োজন নেই। লোক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতরূপে আমরা যা দেখি তা নিছক ভ্রম মাত্র। যেমন মায়া, মরীচিকা, স্বপ্ন ইত্যাদি মিথ্যা তেমনই লোকব্যবহার-সর্বস্ব যে জ্ঞান তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এইভাবে চরম ভাববাদ অলীক মায়াবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

অধ্যাপক ইউয়িং-এর সিদ্ধান্তকে যদি গ্রহণ করতে হয় তবে দেখা যাবে ভাববাদীরাই চরম ভাববাদ-বিরোধী। সেই বিরোধিতা কেবল নাম মাত্র নয়। চরম ভাববাদের বিরুদ্ধে জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করতে এতটুকুও পরাঙ্মুখ নয়। কেবলমাত্র আত্মগত ভাববাদী দার্শনিকগণই এই জগতের অস্তিত্বকে অলীক মায়াবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অপরাপর চরম ভাববাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক যেমন হেগেল, বলেন চরম সত্তা হলো আত্মা যাকে চিন্তন, ধারণা বা ঈশ্বররূপে ব্যাখ্যা করা যায়। হেগেল চরম ভাববাদী হয়ে ও বস্তু জগতকে কখনোই অলীক ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর মতে পরমাত্মার প্রকাশ হিসেবে এই বস্তুজগত সত্য। দ্বন্দ্বতত্ত্বের মধ্য দিয়ে তিনি এই জগত ব্যাখ্যা করেছেন।

হেগেলের মতে চিন্তন বা আত্মাকে উপলব্ধি করতে গেলে তার নঙর্থক দিক বস্তুজগতের আকারকে স্বীকার করতে হবে। এভাবে অস্তি ও নেতির দ্বন্দ্ব চরম আকার পরিগ্রহণ করে। সেই চরম আকারকে পুনরায় অস্তি ও নেতির দ্বন্দ্বে বস্তুজগতের রূপই গ্রহণ করতে হয়। এভাবে হেগেল কখনোই বস্তুজগতকে অলীক বলেন নি। বরং স্পষ্টতই বলেছেন পরমাত্মার অস্বাভাবিক করণই হলো বস্তুজগত। এইভাবে হেগেলীয় ভাববাদ অলীক সর্বস্ব আত্মগত ভাববাদের চরম প্রতিবাদরূপেই নিজস্ব পথ ধরে ভাববাদের গতিধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে হেগেলীয় ভাববাদকেই বা কতক্ষণ টিকিয়ে রাখা যায়। তার অবিকৃত আদি পবিত্রতায়। হেগেল-পরবর্তী সমালোচক-গণ বিশেষ করে মার্কসবাদী চিন্তানায়কগণ হেগেলীয় ভাববাদকে ভাববাদের চরম আকার ব্যাখ্যা না করে বস্তুবাদের সঙ্গে আপসকারী ভাববাদ হিসেবেই ব্যাখ্যা করতে চান। হেগেলীয় ভাববাদ তাই বস্তুগত ভাববাদ রূপে চিহ্নিত।

চিন্তানায়ক এঙ্গেলস[22] বলেন ডেকার্ট থেকে হেগেল, হবস্ থেকে ফুয়েরবাক পর্যন্ত অন্তর্বর্তী দার্শনিকগণ কখনোই কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বিবেকের অনুশাসনে অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতি বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও শিল্পবিকাশ তাঁদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করত। এক্ষেত্রে এটুকু মনে রাখা দরকার এ বিষয়ে বস্তুবাদীদের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, ভাববাদীদের মধ্যে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ভিন্নভাবে—যেমন বস্তু ও আত্মার মধ্যে সমঝোতায় সর্বেশ্বরবাদী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। এইরূপে হেগেলীয় দর্শন হলো পদ্ধতি ও বিষয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগে বস্তুবাদকে ভাববাদী আঙ্গিকে ব্যাখ্যা। এঙ্গেলস স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন যে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও শিল্প বিকাশের ফলে একসময় চরম ভাববাদকে বিরোধী মতবাদের সঙ্গে রফায় পৌঁছোতে হয়েছিল। তবে ভাববাদের প্রয়োজনে ভাববাদকেই বস্তুবাদের সঙ্গে রফা করতে হয়েছিল হেগেলের ক্ষেত্রে এমন কথা ভাববার অবকাশ নেই। এই নিরিখেই হেগেলীয় দর্শনের বিচার প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টও প্রায় একইভাবে বস্তুজগতকে ভ্রম আখ্যা দিয়ে তাঁর দার্শনিক ভাববাদ গড়ে তুলেছেন। তিনি পূর্বসূরীদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন,[23] ইলিয়াটিক স্কুল থেকে শুরু করে বার্কলে পর্যন্ত যেন একটা ফর্মুলায় আটকে ছিলেন। সেই ফর্মুলা হলো, সমস্ত সংজ্ঞাই যা সংবেদন বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয় তা ভ্রম মাত্র। কেবলমাত্র যে সকল ধারণা অবিমিশ্র বোধের দ্বারা অর্জিত হয় তাই সত্য। এই কথাটাই বিশদ-ভাবে কান্ট তাঁর 'ক্রিটিক অফ পিওর রিজন' গ্রন্থে পুনরাবৃত্তি সহ ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু ক্রিটিকের দ্বিতীয় মুদ্রনের সময় কেবল ভাববাদের খণ্ডন বলে একটি বিশেষ রচনার সংযোজন করেছেন যাতে তাঁর প্রচারিত দার্শনিক ভাববাদকে কেউ নিছক ভাববাদ বলে ভুল না বোঝে। এই দার্শনিক ভাববাদকে ব্যক্ত করতে গিয়ে একইসঙ্গে তিনি বস্তুগত ভাববাদ ও ধর্মান্ধ ভাববাদের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। কান্ট[24] বেশ জোর দিয়েই বলেছেন ভাববাদ অর্থাৎ বস্তুগত ভাববাদ হলো সেই তত্ত্ব যা ঘোষণা করে বস্তুর এমন এক বাহ্যিক অস্তিত্ব যা সন্দেহের উর্ধ্বে নয় এবং যাকে

নির্দিষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। এককথায় যা মিথ্যা বা অসম্ভব: পূর্বোক্ত মত হলো ডেকার্টের বিতর্কমূলক ভাববাদ। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এখানে কেবল মাত্র একটি অভিজ্ঞতামূলক ঘটনাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং যা সম্যকরূপে নিশ্চিতও। তা হলো, 'আমি হই'। এর পরবর্তী ভাববাদ হলো বার্কলের ধর্মান্ধ ভাববাদ। তিনি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে বস্তুময় এই আকাশ যাকে কখনোই খণ্ড খণ্ড করা যায় না, যাকে মূলতঃ অনুভূতিশূন্য বলা যায় সেখানে বস্তুর অস্তিত্বের কথা বলার অর্থ, বস্তুর কাল্পনিক অস্তিত্বের কথা বলা। এইভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদ নানা ভাবে প্রবর্ধিত হয়ে অগ্রসর হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ কিন্তু অগ্রসর হয়েছে প্রচ্ছন্ন পথে ধীরে ধীরে নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। তার ফলে কোন সুনির্দিষ্ট সূত্রে উপনীত হওয়া স্বতঃই কঠিন কাজ। আধুনিক গবেষকগণের অধিকাংশই তাই কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছোতে হিমসিম খেয়েছেন। আবার যাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন ও তা কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত হয়ে ওঠেনি। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ[২৫] ভাববাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ধারণাগুলো সব সময়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, কারণ তা হলো বাস্তবিক সত্যের অপরিহার্য অংশ। আর আমরা যদি ওদের ধারণা বা মূল্য হিসেবে ব্যাখ্যা করি তবেই একটি সঠিক ভাববাদী মতবাদ গড়ে ওঠে। ডঃ রাধা-কৃষ্ণণের এই সূত্র যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে ভাববাদের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ ভাববাদ বাস্তব পরিস্থিতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাকে শুধু ধারণাগত আদর্শ বা মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে ভুল করা হবে। বর্তমানে বিকশিত চরম ভাববাদ যে উচ্চমার্গে অবস্থিত রাধাকৃষ্ণণের সূত্র তার বিরুদ্ধেই যায়। আবার একথাও বলে রাখা প্রয়োজন যে রাধাকৃষ্ণণের এই উক্তিকে ভিন্নভাবে দেখলে ভুলই করা হবে। কারণ তাঁর এই বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বোধের বহিঃপ্রকাশ। ফলে এই ব্যাখ্যাকে নিয়ে প্রতিব্যাখ্যায় রত হওয়া সংগত হবে না।

এবার আমরা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। তিনি তাঁর 'ইণ্ডিয়ান আইডিয়ালিজম্' গ্রন্থে[২৬] অধ্যাপক সোরলের ভাববাদ

ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনিও পূর্বাপর পণ্ডিতদের মতোই শেষ পর্যন্ত সেই আধ্যাত্মিকতাসর্বস্ব আত্মা বা চেতনার কাছে পেঁৗছে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যা ইউরোপীয় দার্শনিকগণের ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেই বক্তব্যকেই কোন না কোনভাবে সাহায্য করে।

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[২৭] স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে ভারতীয় দর্শনকে যদি কেবল আধ্যাত্মবাদসর্বস্ব বলা হয় তো ভুল করা হবে। এমনকি তা সম্পূর্ণ অসত্যও। বিপরীত পক্ষে ঘটনা হলো এই যে সংখ্যায় উপেক্ষনীয় অত্যল্প সম্প্রদায়ভিন্ন ভারতীয় দার্শনিকগণ কখনোই ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। আর ঈশ্বরহীন আধ্যাত্মবাদ নিয়ম বহির্ভূত বিশৃঙ্খলা মাত্র। আমরা যদি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে অধ্যাপক দাশগুপ্তের সিদ্ধান্ত যে ভাববাদ আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে তা উপেক্ষা করতে হয়।

এতক্ষণ আমরা ভাববাদ সম্পর্কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নানা সিদ্ধান্ত পেলাম। আর তাদের পর্যালোচনায় দেখা গেল যে কোন একটি সিদ্ধান্তই কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে ভাববাদের পূর্ণাঙ্গ সূত্র নির্দেশ করে না। এখন প্রশ্ন তবে কি আমরা ভাববাদের সূত্র আলোচনা থেকে বিরত হব? নিশ্চয়ই নয়। প্রাচ্যে আধুনিক পণ্ডিতগণ ও পাশ্চাত্যের আধুনিক পণ্ডিতগণের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা সিদ্ধান্তে অন্তত পেঁৗছোতে পারি। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ বার্ট্রাণ্ড রাসেল[২৮] ভাববাদের কোন সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে না পারলেও একথা বলেছেন যে ভাববাদ মনোগত। প্রায় অনুরূপ অবশ্য একটু ব্যাখ্যা করেই বলেছেন ডেল রিপে।[২৯] তাঁর মতে ভাববাদকে বরং আমরা এমন এক মতবাদ বলতে পারি যা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় মন, আত্মা, ধারণা ইত্যাদির উপর। এগুলিই হলো ব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস। ঠিক তেমনি প্রাচ্যে অধ্যাপক দাশগুপ্ত, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ চিন্তাবিদ অনুরূপ সূত্রই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ভাববাদের স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কার্যতঃ উল্টো। যখন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আধ্যাত্মবাদসর্বস্ব বলে সমালোচনা করেছেন তখনই একদল ইউরোপীয় দার্শনিক বলেছেন ভারতীয় দর্শনে আধ্যাত্মবাদের স্থান সীমিত। কেননা ব্যক্তিগত স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রকট। ভারতীয় দর্শনের বস্তুনিষ্ঠ

বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এখানে ঈশ্বর খণ্ডন প্রচলিত। অথচ সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিরল ব্যতিক্রম ভিন্ন পাশ্চাত্য দর্শনে ঈশ্বরকেই নানারূপে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তাই প্রাচ্যদর্শনে ভাববাদ যখন ঈশ্বর খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করেছে পাশ্চাত্য দর্শনে তখন ঈশ্বর সমর্থনকে কেন্দ্র করেই ভাববাদ কালে কালে চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু যে ভাবেই হোক না কেন চরম ভাববাদের ক্ষেত্রে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে কোন ফারাক নেই। উভয় ক্ষেত্রেই, ঈশ্বরতত্ত্ব অপসারিত। অনির্বচনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্রকাশ, অনন্ত, নিরাকার সর্বচরাচরব্যাপ্ত অসীম চেতনিক শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস রূপে চিহ্নিত।

এতক্ষণ আমরা ভাববাদের যে নির্দেশিকাগুলি পেলাম সেগুলি একে একে সুসংহত আকারে প্রকাশ করতে পারি।

ক) ভাববাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে ভাব বা ধারণাই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র উৎস।

খ) সেই ভাব বা ধারণা কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, কারণ ব্যক্তি-বিশেষের মন বা আত্মা সীমিত। অসীম কোন সর্বপ্রকাশ সত্তাই এই ধারণার অধিকারী।

গ) সেই অসীম সত্তার ধারণা কোন ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতায় পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতামাত্রই ভ্রমপ্রসূত।

ঘ) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্জিত জ্ঞান দোষযুক্ত। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বা প্রতীতি কেবল সম্যক জ্ঞান লাভের যথার্থ মাধ্যম।

ঙ) এই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বা প্রতীতি কেবল শুদ্ধ চৈতন্য বা বিমুক্ত আত্মায় অবস্থান করতে পারে।

চ) মুক্ত আত্মার কাছে জগৎবৈচিত্র্য মিথ্যা, মায়া-মরীচিকার মতো প্রতিভাত হয়। মুক্ত আত্মার কাছে একমাত্র পরমাত্মাই সৎ, আর সকলই অসৎ। পারমার্থিক প্রজ্ঞাই মুক্তি বা মোক্ষ।

এই নির্দেশিকাগুলিকে যদি সংহত করা যায় তবেই ভাববাদের অর্থ পরিস্ফুট হয়। ভাববাদ বলতে বোঝায় এক কথায় ভাব বা ধারণা যা জড় ও অজড় সকল জগৎবৈচিত্র্যের একমাত্র আদি অকৃত্রিম উৎস। এখান থেকেই সকল কিছু আসে আবার পরিশেষে এখানেই বিলীন হয়। ভাববাদের

এই মর্মার্থ নিয়েই আমরা পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হব।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ

ভারতীয় দর্শনে প্রকৃত ভাববাদ আছে কিনা এই নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যতই বিতর্ক তুলে ধরুন না কেন ভাববাদ যে ভারতীয় দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব থেকেই বোঝা যায়। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ভারতীয় দর্শনের গভীরে প্রবেশ না করে তার বহিরঙ্গ দিক বিশেষ করে ধর্ম ও ঈশ্বর সাধনার বাড়াবাড়ি থেকে এই রকম এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেবল মাত্র বাহ্যিক দিক লক্ষ্য করে এই প্রকার যুক্তি বা আশ্রয় বাক্য গঠন করার পেছনে কিছু পরিমাণ সত্যতাকে স্বীকার করা গেলেও এর থেকে প্রকৃত ভাববাদ অনুপস্থিত এই সিদ্ধান্ত টানা সম্পূর্ণতই অনধিকারপ্রসূত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে যে ঈশ্বরবাদের কথা বলেছেন তার আবেদন বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত। শুধু শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে ঈশ্বরবাদের ঝোঁক সামাজিক প্রেক্ষাপটের দৌলতে প্রবল হয়। বিশেষ করে নব্যন্যায় ও বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের মধ্যে, এঁরা স্পষ্টতই ঈশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করেন। ভাববাদ আর ঈশ্বরবাদ এক নয়। দার্শনিক নাগার্জুন একথা তো স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ঈশ্বরবাদ চরম ভাববাদের ক্ষেত্রে আত্মঘাতী। আর এই প্রতিষ্ঠিত মতবাদ সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় দর্শনে প্রচলিত।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত, ভারতীর দর্শনে ভাববাদের স্থান নেই, যেমন ভুল তেমনই আর এক সাধারণীকৃত ভুল, ভারতীয় দর্শনে ভাববাদই হলো ভিত্তিভূমি। যার উপর সমগ্র ভারতীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হলো ভাববাদের শেকড় ভারতীয় জীবনযাত্রার এত গভীরে চারিয়েছে যে ভারতীয় জীবনধারা থেকে ভাববাদ নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানান দিক থেকে বস্তুবাদী ধারাকে বিপথগামী, নীতিভ্রংশ, ব্যতিক্রমী

বলে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলেও লোকায়ত বস্তুবাদী ধারাকে সমূলে উৎখাত করা আজও সম্ভব হয় নি। আজও পর্যন্ত একথা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি যে ভারতীয় জীবনে ভাববাদই একমাত্র আদি অকৃত্রিম ধারা। রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড় পরিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে নাগরিক জীবনকে বেঁধে ফেলে ও দাবী অনুযায়ী তা প্রমাণ করা যায় নি।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতীত ঐতিহ্যের ধুয়ো তুলে আধুনিক ব্যাখ্যাকর্তাগণ পর্যন্ত শ্রেণী অবস্থান থেকে সংগত কারণে ভাববাদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দান করেছেন। কারণ শ্রেণীগত দায়বদ্ধতা তাঁদের নিজস্ব বোধ গড়ে তুলেছে। সেই বোধ অনুযায়ী মেধা, শ্রম সমস্ত কিছুই নিয়োগ করেছেন ভাববাদের প্রচারে ও প্রসারে। বিরল ব্যতিক্রম ভিন্ন সকলেই যশ, খ্যাতি ইত্যাদির তাৎক্ষণিক লোভ লালসা বিসর্জন দিয়ে প্রবহমান ভাবধারার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করেছেন।

আমরা এবার আধুনিক গবেষকদের বিশ্লেষিত সিদ্ধান্তগুলি অনুধাবন করব। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের অবস্থান সম্পর্কে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্য হলো[৪০] ভারতীয় চিন্তাধারার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে বলতে হয় যে বহির্জগতের চেয়ে মানুষের অন্তর্লীন জগতের দিকে অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা। কিন্তু এই বক্তব্য আরো ঋজুভাবে প্রকাশ করেছেন একজন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ তুচি[৪১]। তাঁর মতে ভারতীয় চিন্তাধারার, ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো ভাববাদসর্বস্বতা। এই সকল পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ যে বর্তমান তা উল্লেখ করলেও কোথায় কিভাবে ভাববাদ স্ফুরিত হয়েছে সেই অবস্থান স্পষ্ট করে নির্দেশ করেন নি। এ ক্ষেত্রে আমরা একজন বিখ্যাত গবেষকের শরণাপন্ন হতে পারি।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের অবস্থান সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[৪২]। তিনি তাঁর গ্রন্থে বস্তুগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে ভাববাদের অগ্রগমণ উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক দিক থেকে ভাববাদী প্রবণতাকে তিনটি শীর্ষভাগে ভাগ করেছেন—

১) উপনিষদীয় ভাববাদ

২) বৌদ্ধ ভাববাদ

৩) বেদান্ত বা অনুরূপ আকারের ভাববাদ

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। অধ্যাপক দাশগুপ্ত কিন্তু কখনোই একথা বোঝাতে চাননি যে সমগ্র উপনিষদ, সমগ্র বৌদ্ধদর্শন কিংবা সমগ্র বেদান্ত দর্শনই ভাববাদসর্বস্ব। তাঁর গ্রন্থে বরং যা তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তা হলো উপনিষদে এক শ্রেণীর ক্ষমতাশালী দার্শনিক উপনিষদীয় ভাববাদ গড়ে তুলেছেন, যেমন বৌদ্ধদর্শনে মহাযান সম্প্রদায় এবং বেদান্ত দর্শনে গৌড়পাদ, শংকর ইত্যাদি দার্শনিকগণ। তা হলে এতদিনের প্রচারিত ট্রাডিসন যে 'ভারতীয় দর্শন বেদানুসারী আধ্যাত্মবাদসর্বস্ব' অধ্যাপক দাশগুপ্তের বক্তব্য তা সরাসরি অপ্রমাণ করছে। তেমনি অপ্রমাণ করছে যে ভারতীয় দর্শন একান্তভাবেই ভাববাদসর্বস্ব। বরং ঋজুভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায় ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের অত্যন্ত সীমিত আবেদন বর্তমান।

অথচ এতাবৎকাল পণ্ডিতগণ এই বিশেষ দিককে তুলে না ধরে, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' ইত্যাদিভাবে অনালোচিত রেখে, শ্রেণীস্বার্থ পুষ্ট করারই চেষ্টা করেছেন। তাঁদের আলোচনায় তাঁরা ভিন্ন আবেদন আমদানি করে ভারতীয় জনমানসকে আচ্ছন্ন করে রাখার পূর্বাপর চেষ্টা করে গেছেন। এ জন্য কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁদের মনে উপস্থিত হয় নি। তাঁরা কোনপ্রকার বিচলিত বোধ করেন নি।

কিন্তু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব চিরকালই থাকে। নানান বিরোধিতার মাঝেও তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিভু নিভু শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখার মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেন যশ, খ্যাতি প্রাণধারণরূপ একান্ত প্রয়োজনীয় দিককেও তুচ্ছ করে। অতীত ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সেই বিরল ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি অধ্যাপক দাশগুপ্তের বস্তুগত ব্যাখ্যাকে তুলে ধরে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ভারতীয় দর্শনের ধারা প্রবাহে নতুন স্রোত-প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। এই সমীক্ষা আধুনিক দর্শনের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের পক্ষে দিগদর্শন হিসাবে সাহায্য করবে।

তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থে[৪৪] তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যেহেতু আধুনিক পণ্ডিতদের সাধারণ ঝোঁক বা প্রবণতা হলো ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের অস্তিত্বকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো, এখন প্রয়োজন দার্শনিক উত্তরাধিকারে ভাববাদের সঠিক ভূমিকা নিরূপণ করা। আমরা দেখেছি একশ্রেণীর উপনিষদীয় চিন্তাবিদ, মহাযান বৌদ্ধ এবং অদ্বৈত বেদান্তবাদী ছাড়া ভারতীয় দর্শনে বলতে গেলে আর কেউই নেই যিনি বা যাঁরা উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অন্তত ভাববাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। অপরপক্ষে যা রূঢ় সত্য তা হলো সংখ্যা-গরিষ্ঠ দার্শনিকই ভারতীয় দর্শনে ভাববাদী নন। এমনকি শুধু পরিসংখ্যান মূলক দিক থেকেই নয় ভাববাদ-বিরোধিতা গুণগত বৈশিষ্ট্যেও সমুজ্জ্বল। ভারতীয় দর্শনে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলেই বোঝা যাবে। যাঁরা ভাববাদ-বিরোধিতায় নিয়োজিতপ্রাণ তাঁরা উদাসীন তো ছিলেনই না বরং সক্রিয়ভাবে ভাববাদ খণ্ডন করেছেন, পায়ে পা মিলিয়ে চেষ্টা করেছেন কি করে তত্ত্বগতভাবে ভাববাদকে নস্যাৎ করা যায়। ভারতীয় পরিভাষায় পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ শব্দ দুটি এ কারণেই প্রচলিত। পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী হিসাবে দেখলে উত্তরপক্ষের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে অনিবার্যভাবে যুক্তিখণ্ডন করতেই হয়।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের এই সমীক্ষা এতদিনের অবহেলিত সত্যকে উন্মোচন করল। ভাববাদ খণ্ডনের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই সমীক্ষা দিশারী হিসেবে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসাকে অভূতপূর্ব প্রেরণা জোগাবে। বর্তমানে সেই কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভাববাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় বস্তুগত চিত্রায়ণ প্রয়োজন। বিশেষ করে ভাববাদের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য, তার গতি প্রকৃতি যার উপর ভিত্তি করে ভাববাদ খণ্ডন দাঁড়িয়ে আছে তার তথ্যনিষ্ঠরূপ তুলে ধরতে হবে।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতির ইতিহাসে দার্শনিক ভাববাদের অস্পষ্টরূপ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে উপনিষদে। অথচ আজও অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন ভারতীয় দর্শনের শুরু বেদ থেকে। উপনিষদ অবশ্য বেদই। বেদ হলো সুবিশাল সাহিত্য কর্ম। শুধু তার অন্তভাগ উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সন্ধ্যাপ্রদীপের সকালের সলতে পাকানোর মতো বেদেই শুরু থেকে দার্শনিক চিন্তার পথ প্রস্তুতি লক্ষণীয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে[1] ভারতীয় জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি বৈদিক যুগ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত যা লক্ষ্য করা যায়, তা হলো যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে জাগতিক স্বার্থের সন্ধান থেকে রহস্যজনক ভাববাদের দিকে উত্তরণ। বেদের প্রথম অংশ কেবল প্রাকৃতিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদির ধর্মীয় ব্যাখ্যা। পরবর্তী অংশের দিকে যে প্রচেষ্টা চোখে পড়ে তা হলো আর্যঋষিগণ নিজেরাই উপলব্ধি করলেন যে যাগ-যজ্ঞে প্রাকৃতিক দেব-দেবতার অবদান ক্রমশ সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সীমিত হয়ে পড়ছে। তখন তাঁরা যাগ-যজ্ঞের সাথে সাথে নৈতিকতা বা নীতিবোধ যুক্ত করলেন। এইভাবে এক নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করল বৈদিক সাহিত্যের শেষ দিকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নীতিবোধসর্বস্ব অধ্যাত্মবাদ। আর এই অধ্যাত্মবাদই কালে কালে দার্শনিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে রহস্যময় ভাববাদে রূপান্তরিত হয়। উপনিষদ আলোচনার সময় উন্মোচিত ভাববাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরব।

এরপর লক্ষণীয় বিষয় যা তা হলো উপনিষদের পর বহু শতাব্দী কেটে যায়, ভাববাদী ধারার কোন একজন প্রথিতযশা দার্শনিককেও দেখা যায় নি যিনি ভাববাদের ঐতিহ্য বহন করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। যদি আমরা ধরে নিই যে ভাববাদের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে তাহলে একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে দার্শনিক ভাববাদকে বেশ কয়েক,শ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে পুনরুত্থানের জন্য। আর তাও ঘটেছে এমন কয়েকজন দার্শনিকের মাধ্যমে যাঁরা প্রধানত ভাববাদ-বিরোধী।

গৌতমবুদ্ধের বিশুদ্ধ শিষ্য হিসেবে সর্বাধিক প্রচারিত হলেও তাঁরা কি ছদ্ম ভাববাদী নন ? উপনিষদীয় দর্শন সম্যক রপ্ত করে রাতারাতি বৌদ্ধ শিষ্য বনে গিয়ে বৌদ্ধ দর্শন বিচারের বারোটা বাজানোর কাজে সিদ্ধহস্ত কিনা তা পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে। অথচ ইতিহাসের কি করুণ পরিণতি ভারতীয় দর্শনের জগতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব বেদ উপনিষদ বিরোধী হিসেবে।

একথা সর্বজনবিদিত যে বুদ্ধদেবের সংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বেদ-উপনিষদ নিরুক্ত ভাববাদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-গুলিকে নস্যাৎ করা। তার বিরুদ্ধে জন-আন্দোলন সংগঠিত করা। উপনিষদীয় ভাববাদের মূলোৎপাটন করা।

বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হবে যদি আমরা উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়কে অনুধাবন করি। উপনিষদীয় ভাববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর বৌদ্ধদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নৈরাত্ম্যবাদ বা অনাত্মবাদ। এক কথায় উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বকে সরাসরি খণ্ডন করা বা নস্যাৎ করা।

কিন্তু সেই বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধপরবর্তী সময়ে শিষ্য পরম্পরায় দু দুটি ভিন্ন ধারা গ্রহণ করে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ দর্শনের ছত্রছায়ায় উদ্ভব হয় এক বিশাল গ্রন্থের। সেই গ্রন্থটি বৈপুল্যসূত্র বা মহাযান নামে খ্যাত। এই বৈপুল্যসূত্রের মধ্য দিয়েই আমরা উপনিষদীয় তত্ত্বের পুনরুত্থান দেখতে পাই।

কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো এই মহাযানসূত্রের কে যে রচয়িতা তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে বুদ্ধশিষ্যদের কেউ কেউ এই সূত্র আবিষ্কারের গল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। প্রচলিত গল্পের একটি হলো যে এই সূত্র ভগবৎভূমি, নাগ-গন্ধর্ব, রাক্ষস ইত্যাদির কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। আবার আর এক জায়গায় বলা হয়েছে নাগদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে নাগার্জুন শতসহস্রিকা পান। সেখান থেকেই এই সূত্রের আবির্ভাব। বু-তন[২] আবার উল্লেখ করেছেন যে সন্ন্যাসী শ্রীমনই হলেন সেই সন্ন্যাসী যিনি পরবর্তীকালে নাগার্জুন নামে খ্যাত।

কিন্তু কেন যে বৌদ্ধদর্শন খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এমন বাঁক নিল তা আজও ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়। বর্তমানে

আমাদের সামনে যা প্রতিভাত তা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় চিন্তা-পদ্ধতিতে ভাববাদের পুনরুত্থান বৌদ্ধ দার্শনিকদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে যাঁরা নিজেদের মহাযানপন্থী বলে দাবী করেন।

ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যগতধারায় তৃতীয় পর্যায় পরিলক্ষিত হয় কয়েকজন দার্শনিকের মাধ্যমে যাঁরা উপনিষদকেই তাঁদের তত্ত্বের আদি গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেন। এই তৃতীয় পর্যায় হলো অদ্বৈতবেদান্ত ভাববাদ। এই পর্যায়ের প্রথম পুরোধা হলেন গৌড়পাদ যিনি শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরুদেব হিসেবে খ্যাত। কিন্তু বেদান্তদর্শনের মূল খ্যাতি ও প্রভাব মূলত শঙ্করা-চার্যের জন্যই। যাঁর আবার অসংখ্য সফল অনুসারী বর্তমান। তাঁদেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও প্রচারে ভাববাদ অন্য সকল ধারাকে ছাপিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মূলত এই ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।
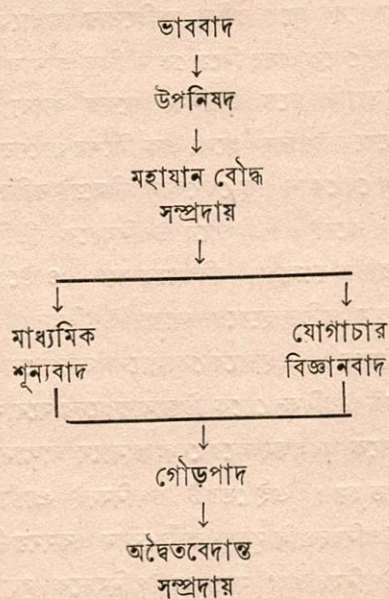
আমরা এবার এই ছক অনুযায়ী একের পর এক ভাববাদের অগ্রগতি নাতিদীর্ঘ আকারে আলোচনা করব।

উপনিষদ ঃ যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য

বৈদিকযুগ থেকে উপনিষদীয় যুগের উত্তরণ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে চিহ্নিত। দার্শনিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে উপনিষদ যে ঐতিহ্যগত অর্থবহন করে তা বেদের শেষাংশ হিসেবে বেদান্ত নামে পরিচিত। যাঁরা বেদকে একমাত্র প্রামাণ্য অভ্রান্ত গ্রন্থ হিসেবে দেখে থাকেন তাঁদের পক্ষে বেদান্ত নামটির তাৎপর্য অনেকখানি। কেননা যে কোন বিদ্যাই হোক তা যে শ্রুতি নিশ্রুত শাস্ত্রীয় তা বোঝাতেই এই নামের বিশেষ প্রয়োজন। এইভাবে দেখা যায় বেদানুগত উপনিষদই কালে কালে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একমাত্র উৎসগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

উপনিষদ কথার অর্থ রহস্যবিদ্যা বা গুপ্তজ্ঞান। উপ-নি-ষদ্ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই তার প্রকৃতি বোঝা যায়, গুরুর নিকট বসে শোনা। বিশ্বাসপূর্বক গোপনে প্রদত্ত জ্ঞান। এই অর্থ নিরূপণ একান্তই প্রচলিত শব্দার্থনির্ভর কেননা সেই যুগে রচিত সাহিত্যের অভাবে ও প্রচার বিমুখ মৌন পণ্ডিতদের কাছ থেকে এসব নিয়ে কোন কিছু জানার উপায় ছিল না। অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থে উপনিষদ শব্দের ব্যাখ্যা এভাবেই পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে উপনিষদ হলো এক বিশেষ ধরণের গোপন পদ্ধতি।

উপনিষদের যুগে যে কোন গ্রন্থ যে কোন বিষয়েই রচিত হোক না কেন তা উপনিষদ অনুসরণ করেই। এইভাবে উপনিষদকে ভিত্তি করেই আনুমানিক দু-শটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে এও উল্লেখ করতে হয় যে সম্রাট আকবরের সময় রচিত হয়েছে আল্লা উপনিষদ। যাতে ঐশ্লামিক মতামতের প্রকাশ রয়েছে। এইভাবে ফোলানো ফাঁপানো কৃত্রিম উপনিষদ ব্যতিরেকে মূল তেরটি উপনিষদ থেকে চিন্তানায়কদের মনোমতো কিছু অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিপাদক অংশকে অবলম্বন করে বেদান্ত নামে আলাদা একটি সূত্রগ্রন্থ পরবর্তীকালে লিখিত হয়। এই তেরটি উপনিষদই প্রাচীন বেদ অনুসারী বলে কথিত। এই উপনিষদগুলি বুদ্ধপূর্ববর্তী কোন একসময় লিখিত। যদিও এদের মধ্যে মৈত্রী উপনিষদ এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদকে বুদ্ধ পরবর্তী বলেও বিবেচনা করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর দার্শনিকগণ কর্তৃক গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

কিন্তু তাঁদেরকে আধুনিক পরিভাষায় দার্শনিক বলা যেতে পারে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। আধুনিক গবেষক ভাণ্ডারকরের মতে[৪] উপনিষদগুলি আমাদের কোন একটি বিষয়ে শিক্ষা দেয় না, বরং বিভিন্ন শাস্ত্র এখান থেকে অনুসৃত হয়েছে। যার ফলে এদের বিভিন্ন বিষয়ে সংকলিত রূপ বলাই বিধেয়, যেমন ঋগ্‌বেদ সংহিতা। অধ্যাপক থিবটও প্রায়[৫] অনুরূপভাবে বলেন যে উপনিষদগুলোয় ওপর ওপর বা ভাসা ভাসা চোখ বোলালেই আমাদের যে ধারণা পুষ্ট হবে তা হলো যে উপনিষদগুলি কোন সুসংবদ্ধ দর্শন উপহার তো দেয়ই না, এমনকি বিভিন্ন গুরুকে নির্দেশ করেও যে মতবাদগুলি সংকলিত তাও নয়। বরং দেখা যাবে একই উপনিষদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত। এই বিতর্কমূলক বক্তব্য অনেকেরই মনে সংশয়ের সৃষ্টি করবে। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে উপনিষদগুলিতে একটি বিশেষ তত্ত্বকেই নানান ভাবে পুষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। চিন্তাবিদ ডু সেন[৬] যা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন সমস্ত উপনিষদেরই একটি মাত্র আলোচিত বিষয় তা হলো আত্মন্ বা ব্রহ্মণ্। আধুনিক গবেষকদের বিতর্কমূলক বক্তব্য অনুধাবন করলে একটি বিষয় পরিষ্কার, তা হলো উপ-নিষদে আত্মন্ বা ব্রহ্মণের আলোচনা আছে ঠিকই তবে দার্শনিক ভাববাদ অনুযায়ী যে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব তার উপস্থিতি প্রতীয়মান করতে যাওয়া বৃথা। বরং এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বিভিন্নমুখী বক্তব্য পুষ্ট উপ-নিষদ থেকে দার্শনিক ভাববাদের বৈশিষ্ট্যের যে বক্তব্য প্রচলিত তাতে কোনপ্রকার গুরুত্ব না দেওয়াই উচিত।

কিন্তু উপনিষদগুলির বস্তুগত বিশ্লেষণ যে ভাবনাই তুলে ধরুক না কেন ব্রহ্মসূত্রের যুগ থেকে একথা বহুভাবে নন্দিত যে উপনিষদগুলিতে দার্শনিক ভাববাদের উন্মেষ ঘটেছে। এই বক্তব্য স্বীকার করার মূলে যথেষ্ট কারণ বা যুক্তি বর্তমান। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে উপনিষদগুলিতে যদি দর্শনের কথা বলতে হয় তাহলে বলব উপনিষদগুলি কোন সুসংবদ্ধ চিন্তা উপস্থিত করে না। এমন কি একথাও বলা যায় না যে কোন একজন ব্যক্তির দ্বারাই কোন একসময় লিখিত। বরং একথা বলা যায় এগুলি হলো বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয় যা বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্ভূত। তার ফলে কখনো কখনো তাদের ঐক্য সংগঠিত না হয়ে কৃত্রিমতাসর্বস্ব মনে হয়। কিন্তু তা

সত্ত্বেও তারা যে এক বিশেষ যুগে বিশেষ গোষ্ঠীর দার্শনিক কৃষ্টিকে প্রতিফলিত করেছে এবং এই বিশেষ দার্শনিক মতবাদ সেই সময়ের প্রতিবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্বকে বাতিল বা নস্যাৎ করে দিয়েছে তা নয়। পরস্পর-বিরোধী বিভিন্নমুখী চিন্তার স্রোতধারা উপনিষদে থাকলেও ভাববাদী ধারা যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তা পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

উপনিষদের যুগে উপনিষদ ঋষিগণ কেবল তাঁদের বোধের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। নানান কথকথার ফাঁকে। মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে যুক্তি ও বিচার পদ্ধতির মাধ্যম প্রয়োজন তা তাঁরা উপলব্ধিই করেন নি। যা করেছেন তা হলো রহস্যোদ্দীপক কথকথায় তাঁদের প্রজ্ঞা তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে অন্তর্লীন প্রমাণ বা যুক্তি যে আত্মপ্রকাশ করেনি তা নয়। সেই উন্মেষপ্রবণ যুক্তিগুলোকে পরবর্তী চিন্তাবিদগণ স্বকীয় পারদর্শিতায় সূচীমুখ করে তুলেছেন। তাই অন্তর্লীন উপনিষদীয় ভাববাদী ধারা ক্রমশই ফুলে পল্লবে বিকশিত হয়েছে দার্শনিক ভাববাদে একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। অতএব ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ ঐতিহ্যগত দিক থেকে উপনিষদীয় ভিত্তি অনুসারী তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

উপনিষদে ভাববাদী চিন্তধারার নানান সংকেতধর্মী বক্তব্যের মধ্যে যা মৌলিকরূপে চিহ্নিত তা হলো আত্মা সম্পর্কিত প্রশ্ন। বৈদিক যুগে মূল মন্ত্র ছিল, আত্মানং বিদ্ধি। আত্মাকে জান। নিজেকে জান। সেই আত্মা-প্রসঙ্গ উপনিষদে এসে দার্শনিকরূপ পরিগ্রহণ করে যখন উপনিষদ ঋষিগণ বলেন, **আত্মা এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ**[6]। আত্মাই একমাত্র চরম অস্তিত্বশীল পদার্থ, এক এবং অদ্বিতীয়। সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, সর্ব শূন্য অবস্থা থেকেই এই বিশাল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, **অস্মাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি**[7]। এক-কথায় এই আত্মা থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি। সকল পদার্থেরই সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আত্মা থেকে সকল কিছুর সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হয়? তার উত্তর প্রসঙ্গে উপনিষদ ঋষিগণ বলেন,[8] **অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ**। ফলে জড় থেকে জীব নয়, জীব থেকেই জড়ের উৎপত্তি। আত্মাই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নামরূপের প্রভেদ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে যে কোন প্রকার সংশয় নিরাকরণ করার জন্য উপনিষদে বলা হয়েছে.[9] **শরীরস্তায় দেহিনঃ।** শরীর কখনোই চেতনার জনক নয়, জনিত। এই জগতের যা কিছুই হোক না কেন, সকল কিছুই জনিত অর্থাৎ সৃষ্ট। আর যার সৃষ্টি আছে তার বিনাশও হয়। কিন্তু আত্মা যা থেকে সকল কিছুর সৃষ্টি তা অমর, অজর, জন্ম-মৃত্যু রহিত। উপনিষদ ঋষির ভাষায়,[10] **ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।** জন্ম মৃত্যু রহিত আত্মা অবিনশ্বর ও অক্ষয় বস্তু। এই আত্মাই একমাত্র চেতন। আত্মা ব্যতীত জগতে সকল কিছুই অচেতন।[11] **আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ।** আত্মাই একমাত্র সেই বস্তু যা বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মাই ব্রহ্মণ্। আত্মার উপলব্ধি মানেই ব্রহ্মণের উপলব্ধি। যখন কোন ব্যক্তির আত্মার উপলব্ধি ঘটবে 'আমিই সেই ব্রহ্ম' তখন সেই আত্মা মুক্ত আত্মা বা পরমাত্মা বলে খ্যাত হয়। সেখানে ব্রহ্ম ও আত্মা একাকার। এই আত্মা বা ব্রহ্মই হলো এক বা একমাত্র পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে[12], **আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।** এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্বে পুরুষরূপী আত্মাতেই বর্তমান ছিল। সেই আত্মা চারদিক দৃষ্টিপাত করে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। উপনিষদের ভাষায়[13] **নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।** আত্মাতে কোন প্রকার ভেদ নাই। এই আত্মা বা ব্রহ্মণের অপর কোন রূপ নেই, চরম সৎপদার্থ। এই চরম অস্তিত্বশীল আত্মাই সকল কিছুর উৎস। আত্মা থেকেই সকল কিছু আসে আবার পরিশেষে সেই আত্মাতেই বিলুপ্ত হয়। অতএব কি আদিতে কি অন্তে, আত্মা বা ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য। এই চূড়ান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মাই যে ধারণা একথা স্পষ্ট ভাষায় তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে[14] এই আত্মা বা ব্রহ্মণ্ চূড়ান্ত অবস্থায় ধারণা ভিন্ন আর কিছু নয়, ফলে এই আত্মা বা ব্রহ্ম ভাবময় একমাত্র চরম অস্তিত্বশীল সত্তা।

এইভাবে আত্মাকে চরম অস্তিত্বশীল সত্তায় উন্নীত করে বস্তুজগতকে সম্পূর্ণ অস্বীকারের মাধ্যমে উপনিষদে ভাববাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই উপনিষদীয় ভাববাদ অনুযায়ী আত্মাই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্য। আর সকলই মিথ্যা। এই যে বৈচিত্র্যময় জগৎ—গাছ, পাখি, ফুল, লতা-পাতা, ঝর্ণা-পাহাড়-নদী সবই মিথ্যা। মায়া-মরীচিকা-স্বপ্ন ইত্যাদি যেমন মিথ্যা তেমনই নৈমিত্তিক প্রত্যক্ষের বৈচিত্র্যময় জগতও মিথ্যা। এদের কোন

প্রকার বস্তুগত অস্তিত্বই নেই। মৈত্রী উপনিষদে বলা হয়েছে, **ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যা দর্শনম্**।[15] এই আপাতক্ষুদ্র সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালে শতসহস্র ধারায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদের মূল স্রোতকে পরিপুষ্ট করেছে। পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকগণ উপনিষদোক্ত সংকেতকে মূল লক্ষ্য করে যুক্তিজালের বিন্যাস ঘটিয়ে নৈমিত্তিক বস্তুজগত অপ্রমাণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই বস্তুজগতকে আখ্যায়িত করা হলো সম্পূর্ণতঃই ভ্রমসর্বস্ব অলীক। ফলতঃ সাধারণ মানুষ যেখানে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতি মুহূর্তে জীবনধারণে সাহায্যকারী প্রকৃতিকে বোধ-বুদ্ধি দিয়ে ধ্রুব সত্য বলে ঠাঁই দিয়েছে তখন ভাববাদী দার্শনিকগণ সেই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা জগতকে মিথ্যা ও বঞ্চনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সব মিথ্যা হলেও আত্মা বা ব্রহ্ম কিন্তু মিথ্যা নয়। বরং চরম অস্তিত্বশীল একমাত্র পদার্থ।

সংখ্যায় কতগুলি উপনিষদ এক সময় প্রচলিত ছিল সেই নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মূল তেরটি উপনিষদই ভাববাদের উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। এই তেরটি উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদকেই আবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু উপনিষদগুলির যে বিশাল সম্ভার, এ সবের কারা যে রচয়িতা, এ নিয়ে কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য রাখা সুকঠিন। কারণ প্রাচীন আর্য ঋষিগণের প্রবণতাই ছিল আত্মপ্রচার থেকে বিরত থাকা। যার ফলে কোন বিশেষ উপনিষদ যে কার লেখা তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তা বলে কি ঋষিদের কাউকে কি জানার উপায় নেই। এর উত্তরে বলা যায় পরবর্তী যুগে রচিত উপনিষদে কিছু ঋষির নাম একটি শ্লোকে পাওয়া যায়। মাণ্ডূক্য উপনিষদে গুরু পরম্পরায় যে নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে তা হলো[16], ব্রহ্মা, প্রজাপতি মনু, উদ্দালকপিতা আরুণি, অথর্বন্, অঙ্গিরস্, ভরদ্বাজ সত্যবহ কাপেয়, রৈক্য, উষস্ত, শাণ্ডিল্য সত্যকাম জাবালি, শ্বেতকেতু, আরুণেয় উদ্দালক, বালাকি, গার্গী, মৈত্রেয়ী, উষস্তিচাক্রায়ণ, অজাতশত্রু, জনক ইত্যাদি। এই নাম সমগ্র উপনিষদ জুড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসেছে। কিন্তু কার্যতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ভাববাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছেন। উক্ত উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে ঘিরে ভাববাদ প্রস্তুতি পল্লবিত হয়েছে।

অবসর নেওয়ার সময় উপস্থিত হলে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য একদিন তাঁর দুই স্ত্রীকে ডেকে তাঁর সম্পত্তির নিষ্পত্তি করতে চাইলেন। সম্পত্তি অংশের প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন, এই সম্পত্তি কি অমরত্ব দানে সক্ষম ? যাজ্ঞবল্ক্য অস্বীকার করলেন। বিষয়মোহ বিষ। বিষয় কখনোই অমৃতলাভের মাধ্যম হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর স্পষ্ট উত্তর[17], **যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্**। যা আমাকে অমরত্ব দান করতে সাহায্য করবে না, তা নিয়ে আমি কি করব। বরং যাতে আমার অমরত্ব লাভ হবে সেই আত্মকথা শোনাও। মৈত্রেয়ীর কথায় যাজ্ঞবল্ক্য প্রীত হলেন এবং গুপ্ত জ্ঞান দিতে শুরু করলেন। এই গুপ্ত জ্ঞানই অমরত্বের একমাত্র সোপান। কেবল যে বৃহদারণ্যক উপনিষদেই গুপ্ত জ্ঞানের কথার উল্লেখ আছে তাই নয়। তেরটি উপনিষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুপ্ত জ্ঞানের উল্লেখ আছে। তবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে দার্শনিক ভাববাদের তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়।

আত্ম সন্নিধানই হলো সেই গুপ্তজ্ঞান। আত্মাই কেবলমাত্র বিজ্ঞানঘন সত্তাসর্বস্ব। বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, জন্ম-মৃত্যুরহিত আত্মাই কেবলমাত্র সত্য। বস্তুরাজি, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কবলিত বঞ্চনার উৎস। আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যা সত্য বলে জানি তা আসলে ভ্রমসর্বস্ব। আপাত সত্যতার পরিচায়ক মাত্র। মায়া-মরীচিকা-স্বপ্ন-ভ্রম যেমন তেমনই বৈচিত্র্যময় বস্তুজগৎ। একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই বস্তুজগৎ কখনো কখনো যেমন আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে তেমনি বঞ্চিত করে। কিন্তু একই বস্তু তো কখনো একই সময়ে দু দুটি রূপ নিয়ে হাজির হতে পারে না। যে যে-মুহূর্তে সাদা সেই মুহূর্তে তা কালো হয় কি ? একই বস্তু একই সঙ্গে সাদা-কালো হতে পারে না। একটু ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন যেতে যেতে কোন চকচকে বস্তুর উপর চোখ পড়লেই মূল্যবান ধাতু প্রাপ্তির আনন্দে ছুটে গিয়েই আমাদের বিভ্রান্তিতে বিমর্ষ হতে হয়। যা ভেবে যাওয়া সেখানে গিয়ে দেখা যায় ভিন্ন বস্তু। চকচকে ঝিনুকে যেমন রূপোর বিভ্রম। তেষ্টায় জলের জন্য ছুটে গিয়ে মরীচিকার বিভীষিকায় যেমন হতাশ হওয়া ইত্যাদি। এই সকল সংশয়,

ভ্রম, স্বপ্ন ইত্যাদি প্রমাণ করে যে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শে যে যে বস্তু-রাজিকে যেভাবে দেখি তা সর্বাংশে সেইরূপ না হয়ে ভিন্ন। অর্থাৎ বস্তুজগৎ কোন না কোন ভাবে বঞ্চনা করে। আর তাই যদি হয় তাহলে বঞ্চনাকারী বস্তুজগৎকে কি করে বিশ্বাস করি যে তা অস্তিত্বশীল। কারণ অস্তিত্বশীল হতে গেলে তার স্থায়ী চরিত্র প্রয়োজন। কিন্তু বস্তু মাত্রেরই চরিত্র তো তা নয়। অতএব প্রমাণিত সত্য যা তা হলো বস্তুজগৎ মিথ্যা ও অসৎ। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে এই সব বস্তু নিচয় ব্যবহারিক তাৎপর্যরহিত। আর ব্যবহারিক সত্য কার্যত মিথ্যাই। এই ভাবে যাজ্ঞবল্ক্য দেখালেন আমরা আমাদের চারপাশের সমস্ত বস্তুজগতকেই সন্দেহ করতে পারি। কিন্তু আমরা যারা সংশয়ে কন্টকিত হচ্ছি সেই সংশয়ের উৎস, সংশয়কারী আমি, আমার আত্মা, তাকে সংশয় করি কি করে? যাজ্ঞবল্ক্য এর পর 'নেতি নেতি' এই নিরীখে সকল কিছুকে অসার, অসৎ প্রমাণ করতে করতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ান। এক সময় উপলব্ধিতে আসে যে সবই মিথ্যা, সবই বঞ্চনাকারী একথা সত্য। কিন্তু এই যে আমি, যে চিন্তা করছে, চিন্তার অধিকারী, তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব তো প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করি। তাকে 'নেতি নেতি' বলে অস্বীকার করি কি করে। এইভাবে সকলই মিথ্যায় পর্য-বসিত হলেও, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় এই যে চিন্তন প্রক্রিয়া বা আত্মা তা তো সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। অতএব প্রমাণিত হলো কেবলমাত্র আত্মাই অস্তিত্বসর্বস্ব। এই আত্মা কি? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, **আত্মা যো ইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ**।[১৪] আত্মা হলো সেই যা বিজ্ঞানময় চেতনাসর্বস্ব, শুদ্ধ চৈতন্য। এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতি, স্বপ্রকাশ। এর জন্ম নাই। মৃত্যু নাই। বস্তুজগতের কোন কিছুই এই আত্মাকে স্পর্শদোষে দুষ্ট করতে পারে না। এই আত্মার পরিপূর্ণ উপলব্ধিতেই, সৃষ্টি-প্রলয়-রহস্যতত্ত্ব সত্যমিথ্যার জগৎকারণতত্ত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হয়। তা সম্ভব হয় কিভাবে যাজ্ঞবল্ক্য তার চাবিকাঠি হিসেবে বলেছেন, **অথাতো আদেশঃ নেতি নেতি**।[১৫]

জগতের সকল কিছুই এই আত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়, আবার এই আত্মা-তেই পরিশেষে লীন হয়। স্থিতিকালে চিন্মাত্রস্বরূপ সমস্ত ভূতের সঙ্গে আত্ম-স্বরূপ হয়ে থাকে। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি যদিও বা সম্ভব কিন্তু কোনভাবেই এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় কারণ ব্রহ্ম সম্পর্কে

সদর্থক কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে এই আত্মা বা ব্রহ্ম অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অরস, অগন্ধ, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, অননুভূত অচিন্ত্যনীয়, অকল্পনীয়, অনির্বচনীয় নিত্য মহৎ সত্তা।[২০] এই ভাবে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই কেবল আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উপায়। সেখানেই মুক্তি, মোক্ষ, সেখানেই অমৃতলাভ, সেখানেই অমরত্ব।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইভাবে জগতের যে অনস্তিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তা সর্বাংশে সাধারণ মানুষের বোধের সীমায় না পৌঁছলেও পরবর্তীকালে ভাববাদী দার্শনিকগণ যেমন নাগার্জুন, গৌড়পাদ, শঙ্কর ইত্যাদি তা যথেষ্ট মুন্সিয়ানায় যুক্তি সহকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী আলোচনাগুলিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মহাযান ভাববাদ

বৌদ্ধ দর্শনের বেদ-উপনিষদ বিরোধী বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকার কথা মনে রেখেও ভাববাদের আলোচনায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রসঙ্গ অচিন্তনীয় নয়। কি করে এক কালের নৈরাত্ম্যবাদী সর্বাত্মবাদীদের সপক্ষীয় হয়ে উঠলেন তা অবশ্য ভাববার বিষয়। শুধু তত্ত্বগত দিক দিয়েই নয় তথ্যগত দিক থেকেও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ধর্মীয় গোঁড়ামীতে পিষ্ট দলিত মানুষের পরিত্রাতা হিসেবে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বুদ্ধদেব ছিলেন প্রতিষ্ঠান বিরোধী জনজাগরণের প্রতিভূ। তৎকালীন পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন সৃষ্টি করে বুদ্বদেব বিজয়ীর বেশে দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

বুদ্ধদেবের আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে উপনিষদের উন্মেষমুখর ভাববাদ প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়। ভাববাদের বিকাশ বিলম্বিত হয়। কিন্তু পুনরুজ্জীবিত হয় যাঁদের দ্বারা তাঁরা বৌদ্ধ অনুরাগী মহাযানপন্থী বলে চিহ্নিত। মহাযানপন্থী বলতে মহান পথের অনুসারী। তাহলে কি বৌদ্ধদর্শনে হীনপথ অবলম্বনকারীও ছিল? রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়[২১] মহাযানপন্থী দেখলেন যদি আদি পন্থায় চলা যায় তো অচিরেই জনমন থেকে মুছে যেতে হবে। তাই তাঁরা বুদ্ধদেবের আদি পথ থেকে সরে গিয়ে

জনচিত্ত জয়ের অভিলাষে নতুন ধর্মের পথ বেছে নিলেন। যা হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। বিশেষ করে সেশ্বর যোগ, উপনিষদ ও ভাগবদগীতার প্রচারিত আদর্শের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত। যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখা গেল বুদ্ধ পরিণত হলেন ভগবানের অবতার হিসেবে। বুদ্ধকে ভগবান আখ্যা দেওয়ার জন্য তৈরী হলো রহস্যোদ্দীপক নানান গল্প-কথা। এই কাজ চলতে থাকল ততদিন যতদিন না মানুষের চিন্তাজগত ভিন্নধারায় প্রবাহিত হয়। রিস ডেভিডস এর ভাষায়[২২] এই কাজ চলতে থাকল যতদিন না আদি বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব জনমন থেকে বিলীন হয়। এইভাবে একসময় দেখা যায় বুদ্ধ ও কৃষ্ণ একাকার হয়ে যায়। আর বৌদ্ধ দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে।[২৩]

মহাযানপন্থীদের মনে জনমন থেকে মুছে যাওয়ার আশঙ্কা কেন স্থান পেল? কি সেই হীনপথ যা আদিবৌদ্ধরা অনুসরণ করতেন? যাগযজ্ঞাদির গোঁড়ামী যখন জনসমাজকে তিতিবিরক্ত করে তুলছিল তখন বুদ্ধদেব তাঁর আন্দোলনের ডাক দেন। জাতপাত ধর্মের দুর্গে তখন জনরোষ ফেটে পড়ে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বুদ্ধদেবের ভূমিকা তখন যুগান্তকারী। সেইসময় বুদ্ধ সম্পত্তির সামাজিকিকরণের কথা তোলেন। ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিমালিকানা উভয় সম্পত্তির পরিণামের কথা সম্যক তিনি অবহিত ছিলেন। সেইভাবে সমাজ মানুষের মনে ব্যক্তি মালিকানা বিলোপের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরেছিলেন।[২৪] তাঁর আত্মবাদ খণ্ডন ও তারই সহায়ক ভূমিকা পালনের ইংগিত। কারণ যেখানে আত্মা সেখানেই 'অহং' 'আমিত্ব'। ব্যক্তি মালিকানা তারই বহিঃপ্রকাশ। সম্পত্তির প্রতি লোভলালসা মানুষের ভ্রাতৃত্বের ভাব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রিরংসা বশবর্তী করে তোলে। তাই বুদ্ধদেবের মতে ব্যক্তি মালিকানাই সকল রকম দুর্নীতি, দুঃখ-দুর্দশার উৎস। তাই বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি সামাজিক মালিকানার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তুলে ধরেন জাতিভেদপ্রথার কুফল। সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল তাঁর চিন্তার মূল অংগ। বুদ্ধদেবের চিন্তার অন্য মূল অংগ হলো দ্বান্দ্বিক বিকাশ অনুযায়ী সকল কিছুর বিচার বিশ্লেষণ করা।[২৫] 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' তত্ত্ব অনুযায়ী জাগতিক ঘটনার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বোপরি বুদ্ধদেবের নিরীশ্বরবাদী ভূমিকা মূল কর্তৃত্বের দুর্গে

এক বিরাট আঘাতরূপে চিহ্নিত।

এইভাবে আদি বৌদ্ধদর্শন প্রচলিত সমাজ দ্বন্দ্বে বিশেষ করে বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের বিতর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[২৬] প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য তুলে ধরে সেই সময়ের প্রতিবাদী সত্তাকে শুধু জাগরিত করেছিলেন তাই নয় তাদের সংগঠিত করার কাজে বৌদ্ধ দর্শন অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল।[২৭] যে প্রতিবাদী লোকায়ত প্রবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল বুদ্ধদেব শুধু যে তাকে উসকে দিয়েছিলেন তা নয় তিনি বলতে গেলে পরবর্তী দর্শন সম্প্রদায়কে সুগঠিত হতেও প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।[২৮] যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি খ্রীঃপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতিতে নানা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সুগঠিত দার্শনিক প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত বিতর্ক। আদি দর্শনের ভূমিকা কি তা আমরা একজন আধুনিক চিন্তাবিদের বক্তব্য দিয়েই থামব। চিন্তাবিদ হিরিয়ানার মতে[২৯] ক্ষণিকবাদ, নৈরাত্ম্যবাদ, ইত্যাদি প্রতিবাদী চিন্তা তুলে ধরে ও ব্যবহারিক জগতে তা প্রয়োগ করে আদি বৌদ্ধ দর্শন গতানুগতিক চিন্তাধারায় বিরুদ্ধ পরিমণ্ডল তৈরী করে সাধারণ জনমানসের বিশ্বাসে প্রতিবাদী ঢেউ প্রবাহিত করেছিল।

এই প্রতিবাদী প্রবাহ তৎকালীন প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ মেনে নেবে কেন? নানান কৌশলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জনজাগরণ তাঁদেরকে হতচকিত করে দেয়। বিস্ময়ের যা তা হলো কিছু কিছু প্রজাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ বুদ্ধদেবের আন্দোলনকে মদত দিতে থাকে।[৩০] বুদ্ধদেবের নিজের জন্ম ও বিকাশ প্রজাতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয়। এমনকি শৈশব ও কৈশোর শিক্ষা প্রতিবাদী চিন্তার নায়কদের সক্রিয় অধ্যাপনায় সম্ভব হয়েছিল।[৩১] কালে কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠ-পোষকতায় সমাজ দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা দিতে থাকে। তাই তার মোকাবিলার রূপ বদলে যায়। একসময় দেখা যায় উচ্চশ্রেণী বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে যোগ্য আত্মতত্ত্ববিদকে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। বুদ্ধদেব কোন জাতি ধর্ম ভেদাভেদ মানতেন না। সকল মানুষের সমান সুযোগ। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে দেখা যায়। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশার শেষ পর্যায়ে বুদ্ধদেব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে উচ্চশ্রেণী থেকে দলে দলে শিষ্য

এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। তাই তাঁর দর্শনের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাকুল হয়ে পড়েছিলেন। রিস্ ডেভিড্সের মতে[৩২] যখনই তিনি (বুদ্ধদেব) যেখানে গেছেন উচ্চবিত্ত ব্রাহ্মণেরাই অত্যধিক উৎসাহ দেখিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। বুদ্ধদেব এও স্বীকার করতেন যে একথা সত্য বিভিন্ন জাতির লোকজন সত্ত্বেও এখানে কয়েকজন ব্যক্তির প্রাধান্য তাঁর কর্ম-পদ্ধতিকে সর্বনাশা পথে পরিচালিত করবে। কেননা তাঁরা সামাজিক আভিজাত্য ও অর্থ সম্পদে বলীয়ান ব্রাহ্মণ শ্রেণী সম্ভূত। বুদ্ধদেবের এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব অন্তর্হিত হওয়ার পর শিষ্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক বাধে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে শিষ্যগণ। শেষ পর্যন্ত মূল দুটি সম্প্রদায় টিকে থাকে। একটি হীনযান সম্প্রদায় যাঁরা বুদ্ধদেবের পুরোনো পথের অনুসারী। আর মহাযান সম্প্রদায় নিজেদের মহান পথের অনুসারী বলে দাবী করে। হীনযান শব্দটি মহাযানদেরই উদ্ভাবিত। হীনযান সম্প্রদায়ের মূল পাঠ গড়ে ওঠে পালি ত্রিপিটককে কেন্দ্র করে। যেখানে অধি-বিদ্যামূলক অতীন্দ্রিয় কল্পলোক সম্পর্কে নিরুৎসাহ প্রকাশিত হয়েছে। ভাববাদী আত্মতত্ত্বে তীক্ষ্ণ সমালোচনা রয়েছে। আর নির্মম পরিহাস যা তা হলো হীনযানদের মূল গ্রন্থাবলী অধিকাংশই বিলুপ্ত। অংশ বিশেষ যা টিকে আছে তা অধিকাংশেই বিকৃত, বিপথ চালিত[৩৩]।

অপরপক্ষে মহাযান সম্প্রদায় প্রায় প্রথম শতাব্দীর দিকে আচমকা নীতি-কথা সম্বলিত বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ আমদানি করে দাবী করল যে এই গ্রন্থগুলিই মৌলিক বৌদ্ধশাস্ত্র সম্মত, একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থগুলির মতবাদ সম্পূর্ণত উপনিষদ-আশ্রয়ী। আমরা এখানে প্রধান প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারি। যেমন অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ললিতবিস্তর, লংকাবতার বা সদ্ধর্মলংকাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যূহ, তথাগতগুহ্যক অথবা তথাগতগুণজ্ঞান, সমাধিরাজা এবং দেশ-ভূমীশ্বরসূত্র ইত্যাদি। এগুলি মহাযানসূত্র হিসেবে পরিচিত। মহাযানসূত্র প্রণেতারা মহান পথের অনুসারী প্রমাণ করার জন্য এবং হীনযানদের থেকে যে পৃথক তা সূচিত করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রেখেই এই সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

আদি বৌদ্ধদর্শন নিরীশ্বরবাদী, জীবন দুঃখময়, নৈরাশ্যবাদ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ ইত্যাদির দ্বারা ক্রমশই শক্তি হারিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে যুঝতে না পেরে হীনবল হয়ে পড়ছিল দেখে মহাযান সম্প্রদায় উপনিষদ উক্ত মোক্ষতত্ত্ব, ভক্তিবাদ ইত্যাদিকে আশ্রয় করে হিন্দুধর্ম ঘেঁষা দর্শন তৈরী করতে সচেষ্ট হলেন[৩৪]। এইভাবে হিন্দুধর্মের রহস্য, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় মহাযান দর্শনের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কি অধিবিদ্যাগত দিক থেকে, কি দর্শনগত দিক থেকে, কি ধর্মগত দিক থেকে মহাযান ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় একযোগে কাজ করতে শুরু করে। এক সময় মহাযান তত্ত্ব ও অদ্বৈত তত্ত্ব একাকার হয়ে যায়।

মহাযানগণ উপনিষদ উক্ত মতবাদকে আত্মসাৎ করতে গিয়ে দেখেন উপ-নিষদে যেভাবে ভাববাদ উক্ত হয়েছে তা নিতান্তই প্রারম্ভিক পর্যায়ের যা কেবলমাত্র উপনিষদের যুগের পক্ষেই যথেষ্ঠ। যুগের অগ্রগতি ও আদি বৌদ্ধ-দর্শনের প্রভাব থেকে উপনিষদীয় ভাববাদকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে হলে তার পরিবর্তন পরিমার্জন ও যৌক্তিক পরিবেশন প্রয়োজন। এইভাবে মহাযানপন্থী শিষ্যগণ প্রথমেই আদি বুদ্ধকে গল্পগাথায় মহিমান্বিত করে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে নতুন বুদ্ধ গড়ে তুললেন। নিরীশ্বরতার পুতিগন্ধ মুছে ফেলে সেশ্বর গন্ধী করে তোলা হলো। অধিবিদ্যাবিমুখতাকে চেপে গিয়ে বোদ্ধদর্শনকে অধিবিদ্যামুখীন করে তোলা হলো।[৩৫]

মহাযান দার্শনিকগণ প্রথমেই তথাগত বুদ্ধ ধারণার পরিবর্তন সাধন করলেন। পূর্বে আদি বৌদ্ধ দর্শনে তথাগত কথাটি যিনি বোধি বা প্রজ্ঞা লাভ করেছেন সেই অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু মহাযানগণ তথাগত কথাটিকে তথাগতগর্ভ নামের অন্তরালে উপনিষদীয় ধারণার উজ্জীবন ঘটালেন। বুদ্ধদেব প্রচারিত হলেন ভগবানের অবতার হিসেবে। ব্যবহারিক জীবনে অবতার হিসেবে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে দার্শনিক রূপও দেওয়া হলো। অধিবিদ্যাগত পারমার্থিক উদ্‌বর্তনের ক্ষমতা তথাগতগর্ভের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। সুবর্ণপ্রভাস ও সদ্ধর্মপুণ্ডরীক শাস্ত্রে অনুরূপ ব্যাখ্যা সংযোজিত করে উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বের পুনর্জাগরণ ঘটানো হলো সূক্ষ্মভাবে। কিন্তু যোগাচার দর্শনে লঙ্কাবতার সূত্রে তা ঘটানো হল খোলা-খুলি 'আলয় বিজ্ঞান'-এর মধ্য দিয়ে। ক্ষণ লক্ষণবাদের তত্ত্বকে পেছনে

ফেলে ছদ্মবেশে চিরস্থায়ী আত্মতত্ত্বকে পাথেয় করা হয়েছে।[৩৬] সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শব্দ প্রয়োগের তারতম্য ঘটিয়ে সুকৌশলে এই রূপান্তর সাধন করানো হয়েছে। আধুনিক চিন্তাবিদ ভ্যালি প্যাউসি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৭] পরবর্তীকালে যখন এ-নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করব তখন একটু বিস্তৃত আকারেই তুলে ধরব।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ কি করে কোথা থেকে এল? এর সঠিক কোন কারণ আজো গবেষণার বিষয়। কিন্তু যে গল্প মহাযান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তা হলো ভগবান বুদ্ধই এইসব মহামূল্যবান বাণী প্রচার করতেন। কিন্তু তৎকালীন শিষ্য প্রশিষ্যগণ ছিলেন অত্যন্ত নিম্নমানের। আর তাদের সত্যিকারের আত্মিক বিকাশ যখন কোন ভাবেই সম্ভব নয় এই সিদ্ধান্তে এলেন তখন বুদ্ধদেব নিজে নাগরাজ্যে তাঁর এই সব মূল্যবান বাণী লুকিয়ে রাখলেন। এই গ্রন্থগুলিই বহু পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে যখন শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ করে মহাযানদের বোধের বিকাশ ঘটেছে। এই সকল সূত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে।

মহাযানরা প্রচার করেন যে তখন বুদ্ধদেব একথাই ভাবতেন যে তাঁর সময়কার শিষ্যদের পক্ষে প্রাচীন পালি ত্রিপিটকই যথেষ্ট। তাই এই সকল মহামূল্যবান পুঁথি নাগরাজ্যে গিয়ে সযত্নে গচ্ছিত রাখেন। এই আশায় যে কোন একদিন শিষ্য প্রশিষ্যগণ স্বকীয় প্রজ্ঞায় এই সকল পুঁথি আবিষ্কার করে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে রক্ষিত হবে বৌদ্ধধর্ম, স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে জনচিত্তজয়ী হয়ে উঠবে।

এই বক্তব্য যে কতখানি তথ্যনিষ্ঠ তা একজন আধুনিক গবেষক তুলে ধরেছেন।[৩৮] যে প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে, কেন সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধ দু দুটো ধর্মীয় ধারার প্রচার করলেন—একটি নিকৃষ্ট অর্থাৎ হীনযান আর একটি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহাযান? অথবা দুপ্রকার সত্য একটি গতানুগতিক (সম্বৃতি সত্য) এবং অন্যটি আসল বা চিরন্তন (পারমার্থিক) সত্য। এর উত্তর হিসেবে সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে নটি সূত্রের একটিতে বলা হয়েছে ভগবান শাক্যসিংহ তাঁর গভীর ধ্যান থেকে জাগরিত হয়ে পুনরায় স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে এলেন এবং সারিপুত্রে উদ্দেশ্য করে বললেন শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর এবং অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের কাজ তথাগতের

অর্জিত সত্যকে উপলব্ধি করা বা তার মধ্যে প্রবেশ করা। বিশেষ করে তথাগতের শুদ্ধ ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা। মহাযান সম্প্রদায়ের শিষ্যগণই যে এই সকল সূত্র রচনা করেছেন এ সম্পর্কে আমরা শ্রাবকগণের নিজেদের বক্তব্যই তুলে ধরতে পারি। তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যে মহাযান সূত্রগুলি তাঁদেরই রচিত। তারনাথের মন্তব্য থেকেই এই বক্তব্য প্রমাণিত[৩৯]। প্রজ্ঞাপারমিতা শত সাহস্রিকা এবং অনেক ধারণী আচার্যের (নাগার্জুন) দ্বারাই আহৃত। শ্রাবকগণের মতে এমনকি নাগার্জুনই এসব প্রস্তুত করেছেন।

বর্তমান আলোচনা থেকে এই অর্থ করা ঠিক হবে না যে আমরা এখানে হীনযান ও মহাযানদের বিরোধ আলোচনা নিয়েই ব্যাপৃত থাকব। বরং আমাদের মূল লক্ষ্যের পথে যেতে হলে বুদ্ধপরবর্তী বৌদ্ধধর্মের যে গোত্রান্তর ঘটেছিল তার ঐতিহাসিক দিককে তুলে ধরতে হবে। এ নিয়ে আমরা যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা ইতিমধ্যেই করেছি। এবার একজন আধুনিক বিদ্বানের উক্তি দিয়ে শেষ করব। চেরবাট্স্কি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন[৪০] এই বলে যে যখন নিরীশ্বরবাদীকে দেখা যায় নৈরাত্মবাদের দার্শনিকপথ পরিত্যাগ করে প্রতিষ্ঠাতার নাম গান, পূজাপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কার চর্চায় চার্চকেও ছাড়িয়ে যেতে তখন স্বতঃই এমন ধারণা পোষণ করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সহসাই দু দুটো সম্প্রদায়ে ভাগ হতে দেখল—প্রাচীন এবং নবীন হিসেবে। অথচ উভয়েই দাবী করে যে তারাই হলো ধর্মপ্রতিষ্ঠা-তার একমাত্র অনুসারী।

এইভাবে মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধদর্শন যে নতুন দিকে মোড় নিল সেই মহাযান সম্প্রদায়ই আবার দু দুটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হলো মাধ্যমিক সম্প্রদায় অপরটি যোগাচার সম্প্রদায়। অথচ এই সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ মূল লক্ষ্য ভাববাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন ঘটায় নি। ভাববাদের চরম বিকাশে উভয়েই যথাসাধ্য করেছেন। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের চরম সত্য শূন্যরূপে চিহ্নিত করায় মাধ্যমিক মতবাদ শূন্যবাদ নামে পরিচিত। আর যোগাচার সম্প্রদায় চরম সত্যের নাম চিত্ত বা বিজ্ঞান বলায় বিজ্ঞানবাদ নামে পরিচিত। এখন ভাব-বাদের বিকাশে উভয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়েই আমরা আলোচনা করব।

শূণ্যবাদ ঃ নাগার্জুন ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ

মাধ্যমিক কারিকা ও তার টীকা

ইতিহাস বিশ্রুত নাগার্জুনই মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। নাগার্জুনকে নিয়ে বিদ্বান মহলে পরস্পর বিরোধী নানা কাহিনী আছে। অধ্যাপক ভেঙ্কটরমন তাঁর নাগার্জুন দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থে[41] বিস্তারিত ভাবে নাগার্জুনের জীবনে যে বৈচিত্র্যময় কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃত, চীনা ও তিব্বতী ভাষায় তা গভীর ভাবে ধৈর্য্যের সঙ্গে অনুশীলন করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাকস ওয়ালেসারের সন্দেহ যে[42] নাগার্জুন নামে কেউ ছিলেন কিনা তা নস্যাৎ করে দিয়ে অধ্যাপক রমন বেশ জোরের সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, নাগার্জুনের জীবনের সম্পর্কে নানান কল্প কাহিনী ছড়িয়ে থাকলেও নাগার্জুন নামে সত্যই কোন একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাপক রমন যুক্তি সহকারে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন যে যদি নাগার্জুন নামে কোন ব্যক্তি নাই থাকবে তবে তাঁরই নামে বিভিন্ন গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে কেন?[43] এমনকি অমরাবতীর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারেও দেখা যায় নাগার্জুনের জীবনের যে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া গেছে তার সঙ্গে গতানুগতিক গল্পের বিশেষ মিল পাওয়া যাচ্ছে। যে সব তথ্য এখানে মিলেছে তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত সাতবাহন রাজার সঙ্গে নাগার্জুনের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর পরবর্তী জীবন তিনি একটি মঠে অতিবাহিত করেছেন। সেই মঠটি আবার তৈরী করে দিয়েছিলেন সেই রাজা সাতবাহনই শ্রী পর্বতের ভ্রমরগিরিতে।

এই সাতবাহন রাজাই ইতিহাসে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নামে পরিচিত। যাকে নিয়েই নাগার্জুন লিখেছেন সুহৃল্লেখা[44] ও রত্নাবলী[45]। রাজা সাতবাহন ঐতিহাসিক দিক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০৬-১৩০ অথবা ৮০-১০৪ সময়ে রাজত্ব করতেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে অধ্যাপক ভেঙ্কটরমন[46] বলেছেন, এখান থেকে যে সম্ভাব্য প্রকল্প গঠন করা যায় নাগার্জুনের কর্মকাণ্ডের সর্বোচ্চ ও সর্ব নিম্ন সীমা ৫০ ও ১২০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে ধরা যেতে পারে।

এমনকি তিব্বতী ভাষায় তাঞ্জুর সংগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায়

১৮০টি গ্রন্থ নাগার্জুনের লিখিত বলে দাবী করা হয়েছে। অধিকাংশই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা। কিন্তু নাগার্জুনের নাম ব্যবহার করে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে তা বিশুদ্ধ, খাঁটি। বিখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিত বুতন্[47] নাগার্জুনের মূল ছটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

সেগুলি হল :—

(১) শূন্যতা সপ্ততি : সকল অস্তিত্বশীল বস্তুই আপেক্ষিক, চরম সদর্থক বা চরম নঙর্থক কোনটিই ঠিক নয়।

(২) প্রজ্ঞামূল : আত্মা কিংবা অনাত্মা থেকে উদ্ভব তত্ত্বের অস্বীকার।

এই দুটি গ্রন্থই মূল গ্রন্থ বলে খ্যাত।

(৩) যুক্তি ষষ্টিকা : যুক্তির মাধ্যমে তত্ত্ব খণ্ডন প্রচেষ্টা।

(৪) বিগ্রহ ব্যাবর্তনী : বিরুদ্ধ মতবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন ও খণ্ডন।

(৫) বৈদল্য সূত্র : বিপক্ষযুক্তি যে স্ববিরোধিতাপূর্ণ তার ব্যাখ্যা।

(৬) ব্যবহার সিদ্ধি : চূড়ান্ত সত্যতার দিক থেকে অনস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাভিত্তির দিক থেকে ব্যবহারিক সত্য মূলতঃ একই।

এই ছটি গ্রন্থের সঙ্গে বিশেষ করে যুক্ত হয়েছে মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র আসলে নাগার্জুনেরই বাণী। চীনা ভাষায় সংরক্ষিত এই গ্রন্থকে ভিত্তি করেই অধ্যাপক ভেঙ্কটরমন তাঁর নাগার্জুন দর্শন লিখেছেন।

দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ পরিবারে নাগার্জুনের জন্ম। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হলো তাঁর জীবনকাল। ভীষণ ক্ষিপ্রধী শৈশব ও কৈশোরেই তিনি ব্রাহ্মণ শাস্ত্রসকলই রপ্ত করেছিলেন। বেদজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধ গ্রন্থসূমহ নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু যতই বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন করতে থাকলেন তার সীমাবদ্ধতা তাঁকে পীড়িত করল। তিনি অদ্বৈতশাস্ত্রকে বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপান্তর করতে চাইলেন। ইতিপূর্বে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন প্রয়াসে সম্ভাব্য সমস্ত স্থানই তিনি ঘুরলেন। কথিত আছে অবশেষে নাগরাজ্যে নাগাদের মধ্যে কিছু শাস্ত্র খুঁজে পেলেন যা তাঁকে সন্তুষ্ট করল। তাঁর

আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি চরিতার্থ হলো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রচলিত গল্পের কথা। বুদ্ধদেব স্বয়ং শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞানার্জন স্পৃহায় অপ্রতুলতা দেখে নাগরাজ্যে এইসব শাস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই সব শাস্ত্রের মধ্যে প্রজ্ঞা পারমিতাসূত্রই হলো অন্যতম।

নাগার্জুন প্রাচীন বৌদ্ধ ব্যাখ্যা মধ্যমা প্রতিপদ্‌কে তাঁর দর্শনের অন্যতম সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেন যার অর্থ হলো মধ্যপথ। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম রাখেন মাধ্যমিক কারিকা। মাধ্যমিক কারিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের টীকা হিসেবে খ্যাত। সেখানে মধ্যমা প্রতিপদ্ বা মধ্য পথকে তাঁর মতো করে তিনি ব্যাখ্যা করেন। মধ্যমা প্রতিপদে অধিবিদ্যক রহস্যের সংযুক্তি ঘটিয়ে চরম সত্তাকে চূড়ান্ত অস্তিত্ব বা চূড়ান্ত অনস্তিত্ব কোনটিতেই ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করলেন। অর্থাৎ অস্তি বা নাস্তি কোনভাবেই চরম সত্তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আর এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে চরমসত্তা না-অস্তি না-নাস্তি। আসলে অনির্বচনীয়। যার কোনরকম ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবে রহস্যোপলব্ধির রাস্তা তৈরী করলেন। জাগতিক ভাষা যেখানে কখনো পৌঁছোবে না।

নাগার্জুন কিন্তু কখনোই বৌদ্ধদর্শনের মূল তত্ত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদ বর্জন করেন নি। বরং তিনি যা করছেন তা হলো শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যেভাবে দরকার ঠিক সেইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ আসলে কার্য কারণ সংবাদ। বস্তুমাত্রেরই কোন না কোন কারণ থাকতে বাধ্য। কেন না কারণ ছাড়া কার্য কখনোই হয় না। কিন্তু নাগার্জুন প্রতীত্য সমুৎপাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্টোটাই করলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টি কথাটাই মিথ্যা। যা কিছুই পৃথিবীতে এসেছে তা শর্তাধীন। আপনা আপনি কোনকিছুই সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টির ব্যাপারটাই মিথ্যা। কোনকিছুই নিজে থেকে বা কোন কিছু থেকে সৃষ্টি হয় না। অথবা উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি, তাও ঠিক নয়। যদি কোন কার্য কারণ ব্যাপার সত্যি সত্যিই থাকতো তবে সব কিছুর একসঙ্গে সৃষ্টি হতো। এইভাবে নাগার্জুন কার্য-কারণ তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি অস্বীকার করেছেন এইজন্যই যে কোন কিছুই বাস্তব নয়। যদি সত্যিই বাস্তব বলে কিছু থাকতো তাহলে নিরপেক্ষভাবে নিজে নিজেই আসতো। কার্য ও কারণের প্রয়োজন হতো না। ফলে বুদ্ধদেব

স্বয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদের যে অর্থ পোষণ করতেন নাগার্জুন তা সরাসরি নস্যাৎ করে বলেন, কোন কিছুর থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি, কথাটাই মিথ্যাপ্রসূত। তাঁর মতে প্রতীত্যসমুৎপাদই শূন্যতা।

যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদাঃ শূন্যতাং তাঃ প্রচক্ষমহে।
সা প্রজ্ঞপ্তিরূপাদায় প্রতিপৎ সৈব মধ্যমা ।।[48]

প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী কোন ধর্মই তার উৎপত্তির জন্য অন্যধর্ম নিরপেক্ষ নয়। আর এই জন্য কোন ধর্মই সৎ নয়। সকল ধর্মই শূন্য। নাগার্জুনের মতে কোন বস্তুর এমন কোন ধর্ম নেই যা অন্য কোন ধর্মের অপেক্ষা করে না। অতএব শূন্যও এমন কিছু নয় যার ধর্ম নেই। প্রত্যেক বস্তুর ধর্মই হল অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধে থাকা। যার ব্যতিরেকে ঐ বস্তু ও তার ধর্মের অস্তিত্বই থাকে না। কাজেই প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বই আপেক্ষিক। আর যা আপেক্ষিক তা সৎ ও নয়, অসৎ ও নয়। নিত্যও নয় অনিত্যও নয়। অষ্ট নিষেধই মধ্যম পথ চালিত করে।

অনিরোধম্ অনুৎপাদম্ অনুচ্ছেদম্ অশাশ্বতম্।
অনেকার্থম্ অনানার্থম্ অনাগমম্ অনির্গমম্ ।।[49]

কিন্তু এই ভাবে বলা হলে দুর্বোধ্য হেঁয়ালী হয়ে যায়। তাই নাগার্জুন সরাসরি রূপাদি বস্তুমাত্রকেই শূন্য নামে অভিহিত করতে চান। যার যথার্থ স্বভাব বা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই শূন্য। এক কথায় যা আপেক্ষিক তাই নিঃস্বভাব। যা নিঃস্বভাব তাই শূন্য। সুতরাং সর্বং শূন্যম্।

সর্বং চ যুজ্যতে তস্য শূন্যতা যস্য যুজ্যতে।
সর্বং ন যুজ্যতে তস্য শূন্যং যস্য ন যুজ্যতে ।।[50]

অতএব শূন্যতাই সকল কিছুর উৎস। শূন্যতা ভিন্ন কিছুই সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবই যে কোন প্রকার ধন নিষ্পত্তিতে শূন্যতার শিক্ষাই দিয়েছেন। অতএব শূন্যতা বলতে নাগার্জুন যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো, এই শূন্য কোনভাবেই অভাবাত্মক কোন কিছু নয়। বরং শূন্যতা হলো এমন কোন কিছু যার মাধ্যমে সকল কিছুর সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টিলাভ করা সম্ভব।

শূন্যতা সর্বদৃষ্টীনাং প্রোক্তা নিঃসরনং জিনৈঃ।
যেষাং তু শূন্যতা দৃষ্টিস্তানসাধ্যান্ বভাষিরে ।।[৮১]

এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একটি অতীন্দ্রিয় সত্তা বর্তমান। যাকে মনোজগৎ কিংবা বহির্জগতের কোন কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই শূন্য। শূন্যতা হল অনির্বচনীয় চরম সত্তা, অথবা পরম ব্রহ্ম। এই অধি-মানসিক চরমসত্তাকে কোন প্রকার চিন্তা বা ভাষা ছুঁতে বা ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু কোন প্রকার ভুল বোঝা ও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এই শূন্য কোনভাবেই নঙর্থক, সম্পর্কশূন্য বা অভাবাত্মক নয়। শূন্যতা এখানে একমাত্র চরম সত্য। জাগতিক অবভাস রহিত প্রপঞ্চশূন্য নিঃস্বভাবত্ব। নিঃস্বভাব এই শূন্য অস্তি না নাস্তি, সদর্থক না নঙর্থক, না উভয়ই। এই শূন্যতা চিন্তা, সংবেদন, স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, শ্রবণ সকল কিছুরই উর্ধ্বে। সকল সময়ের জন্যই অনির্বচনীয়। এ হলো পারমার্থিক সত্য।

সাধারণ মানুষ অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রভাবিত। জাগতিক সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বন্ধনে আবদ্ধ। এককথায় সংবৃতি সত্যে আবদ্ধ। সংবৃতি সত্য দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই সংবৃতি সত্য থেকেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিশেষ করে যখন মানুষ অনুশাসনের মাধ্যমে এই জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তখনই কেবল এই চরম সত্তা, শূন্যতার উপলব্ধি সম্ভব। শূন্যবাদীদের মতে এই জগত সৎ না অসৎ এ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কেননা সকল কিছুই অনির্বচনীয়। শূন্যবাদিগণ এই ভাবে বলেন মৌন ভাবই একমাত্র সত্য। নির্বাণ। আর নির্বাণই শূন্যবাদীদের মতে মোক্ষ।

বৌদ্ধ দর্শনের এই অভিনব মূল্যায়ন অনুধাবন করলেই দেখতে পাবো যে অনুরূপ আলোচনা আমরা উপনিষদেও পাই বিশেষ করে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক বক্তব্যে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও অনুরূপভাবে বলেছেন,[৮২] পরমব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করার যে কোন রকম প্রচেষ্টাই, এভাবে-ওভাবে-অন্যভাবে, যেভাবেই করা হোক না কেন চরম অবিদ্যার পাঁকে ডুবে যাওয়া ভিন্ন তার গত্যন্তর থাকে না। তাই তিনি 'নেতি নেতি' এই উপায়ে পরম ব্রহ্মের স্বরূপের সন্ধান করেছেন।

চেরবাটস্কির ভাষায় মাধ্যমিক শাস্ত্র[৫৩] সাধারণত অনুগামীদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের খ্যাতি পেয়ে এসেছে। এ থেকে এ ভাবনা করা যেতে পারে যে মহাযান হলো সত্য সত্যই নতুন ধর্মের বহিঃপ্রকাশ। বৌদ্ধ দর্শন থেকে যা সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন। আর যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে এবং তাঁদের পূর্বসূরীদের প্রচারিত ব্রহ্মবাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগে পুষ্ট।

নাগার্জুন তাঁর এই শূন্যবাদের সমর্থনে যে মূল যুক্তি দেখিয়েছেন তা হলো প্রমাণ বিধ্বংসন। ভাববাদের সপক্ষে মোক্ষম যুক্তি। নাগার্জুন তাঁর বাণীর অধিকাংশেই প্রমাণ বিধ্বংসন উল্লেখ করতেন। এমনকি এরই জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন. তার নাম হল বৈদল্যসূত্র এবং প্রকরণ। আমরা এখানে সাতকড়ি মুখার্জীর মূল্যায়ন তুলে[৫৪] ধরতে পারি। যদি বস্তু সমগ্রের জ্ঞান হয় একথা দাবী করা যায় এবং বলা হয় যে জ্ঞানের কতগুলি সর্বজন স্বীকৃত উৎস যেমন, প্রত্যক্ষ, অনুমানের দ্বারাই সম্ভব তাহলে প্রশ্ন আসে, এই সকল স্বীকৃত উৎসগুলি কি বৈধ? যদি এই উৎসগুলি যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি বৈধ না হয় তাহলে কখনোই প্রমাণিত হয় না যে যে বস্তুগুলি এদের সাহায্যে জানি তা বৈধ বা বাস্তব সত্য। বিশেষ করে যেভাবে আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করতে অভ্যস্ত। তাহলে প্রশ্ন, জ্ঞানের উৎসগুলি কি বৈধ? এদের বৈধতার সমর্থনে কোন যুক্তিই যদি না দেখানো যায় তবে মূল দাবী যে বস্তুরাজি প্রত্যক্ষ অনুমান দ্বারা প্রমাণিত—তা পরিত্যাগ করতে হয়। অপরপক্ষে যদি কেউ এদের বৈধতা প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তাদের দাবীর সমর্থনে অন্য কতকগুলি জ্ঞানকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অথবা অন্য কোন হেতু যা বৈধতা প্রমাণে সাহায্য করতে পারে তাকে গ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা তবে এখন প্রত্যক্ষকেই ধরা যাক।

যদি কেউ দাবী করে যে প্রত্যক্ষের যাথার্থ্য আছে, তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কিছুকে নির্দেশ করতে হবে তার বৈধতা বা যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য। কিন্তু তখনই অপর একটি প্রশ্ন জাগবে, এই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন যে মাধ্যম, সেই মাধ্যম বা হেতুর বৈধতা কার উপর নির্ভর করে? নিজেই বৈধ না হয়ে প্রত্যক্ষকে বৈধ নির্দেশ করার কোন প্রশ্নই আসে না। একটি সাংকেতিক উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে বিষয়টিকে সহজভাবে প্রকাশ করার জন্য।

যেমন প্রত্যক্ষ যদি বৈধ হয় 'ক' শক্তির উপর নির্ভর করে যার ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ বৈধ হয় না, তাহলে সমানভাবে প্রশ্ন আসবে 'ক' কে নিয়েই। 'ক' কে বৈধ বলে কে চিহ্নিত করবে? তখন তাকে দ্বিতীয় কোন বিষয় যেমন 'খ' কে নির্দেশ করতে হবে তার বৈধতার সমর্থনে। কিন্তু কিভাবে এই দ্বিতীয় বিষয় 'খ' র বৈধতা বিচার্য হবে? তখন সর্বজন স্বীকৃত উপায় হলো তৃতীয় কোন বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যেমন 'গ' যা 'খ' কে বৈধতা দানে সাহায্য করবে। এইভাবে এই তৃতীয় বিষয় 'গ' কে বৈধ হতে হবে। তা না হলে 'খ' র বৈধতা উৎপাদনে সক্ষম হবে না। কিন্তু 'গ' এর বৈধতা আবার কার উপর নির্ভর করবে? তখন নিশ্চয়ই চতুর্থ কোন বিষয়কে সূচিত করতে হবে। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টির বৈধতা আবার কিভাবে নির্ণীত হবে? এইভাবে চলতে থাকবে একের পর এক বিষয় উত্থাপন, আর তা একসময় অন্তহীন রূপ গ্রহণ করবে। কারোর পক্ষেই কোথাও থামার অবকাশ নেই। এইভাবে জ্ঞানের উৎসের বৈধতা প্রমাণের যে কোন প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অতএব এই ধরনের যে কোন প্রচেষ্টাই নিরর্থক হতে বাধ্য। জ্ঞানের উৎসগুলির সাহায্যে প্রমাণিত এই বস্তুসমূহকে এর পর প্রমাণিত বৈধ বিষয় বলে গ্রহণ করা যায় কি?

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলো, প্রমাণ কোন কিছুই প্রমাণ করতে সক্ষম নয়। টীকাকার চন্দ্রকীর্তি বলেছেন যতক্ষণ না নাগার্জুনের এই মূল যুক্তিগুলিকে কেউ খণ্ডন করতে পারেন ততক্ষণ তিনি নাগার্জুনের ভিত্তি ও অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন না। এইভাবে আমরা নাগার্জুনের বিশেষত্ব যা দেখতে পাই তা হলো উপনিষদীয় ভাববাদকে নাগার্জুন যুক্তি-পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দার্শনিক তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

আমরা এই যুক্তিগুলির পুনর্বিবেচনা করব যখন আমরা ভাববাদের মূল বিষয়গুলির উপর আলোচনা সংহত করব। বিশেষ করে নাগার্জুনের রীতি প্রকৃতি, যখন তিনি কার্যকারণ তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। এমন কি বিস্ময়ের যে নাগার্জুন ভাববাদের ভিত সুদৃঢ় করার জন্য যে যুক্তি-পদ্ধতির অবলম্বন করলেন সেই যুক্তি পদ্ধতিকেই অন্যত্র পুনরায় পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে অসার প্রমাণ করানোর চেষ্টা করেছেন। স্ববিরোধিতাপূর্ণ এই সকল তত্ব পরবর্তী

পর্যায়ে আলোচিত হবে।

যেভাবেই নাগার্জুন ব্যাখ্যা করুন না কেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত চরম সত্তা শূন্যতা বা তথতা আসলে উপনিষদীয়, ভাববাদের চরম সত্তা বা পরমব্রহ্মের অনুরূপ। উপনিষদীয় তত্ত্বে যা ছিল সুপ্ত অন্তর্লীন তাই মহাযান দর্শনে যুক্তিনিষ্ঠ বহির্মুখীন। এখানেও তিনি প্রমাণ করানোর জন্য ব্যস্ত যে, যে কোন বন্ধনে আবদ্ধ চিন্তাই চরম সত্তার কাছে কখনোই পৌঁছতে পারে না। চরম সত্তার উপলব্ধি সম্ভব কেবলমাত্র বন্ধনমুক্ত, স্বপ্রত্যক্ষ প্রজ্ঞাপারমিতার উপর। অর্থাৎ অধিমানসিক বিমুক্ত বিচক্ষণতার উপর। অতএব নির্বাণ বা মোক্ষই নাগার্জুন দর্শনে শূন্যতার উপলব্ধি দিতে পারে।

নাগার্জুনের নামের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নামও বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়। তিনি হলেন তাঁরই শিষ্য আর্যদেব। আর্যদেবকে কখনো কখনো তাঁর মানসপুত্রও বলা হয়। সম্ভবত আর্যদেবের জন্ম সিংহলের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। ভারতে তীর্থযাত্রী হয়ে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। আর অচিরেই নাগার্জুনের অন্যতম শিষ্য হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ তাঁরই রচনা বলে দাবী করা হয় তাঞ্জুর গ্রন্থ তালিকায়। যদিও তাদের কতখানি সঠিক হিসেবে ধরা যাবে তা ভেবে দেখার বিষয়। তবে তাঁর আসল গ্রন্থ হল চতুঃশতক শাস্ত্রকারিকা। চারশ শ্লোকে লেখা এই গ্রন্থটির প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যমূল্য রয়েছে। এখানেও বিশেষ দক্ষতার সাথে মাধ্যমিক দর্শনের সপক্ষে বিপক্ষবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।

পরবর্তী শূন্যবাদী সম্প্রদায় : বুদ্ধপালিত, ভব্য ও চন্দ্রকীর্তি

নাগার্জুন ও আর্যদেবপরবর্তী শূন্যবাদে দুজন শক্তিধর দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নতুন জোয়ার সঞ্চারিত হয়। এই দুজন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত হলেন বুদ্ধপালিত এবং ভব্য বা ভাববিবেক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যা তা হলো দুজন দুভাবে মাধ্যমিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বস্তুজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার প্রসঙ্গে বুদ্ধপালিত যখন নাগার্জুনের নঙর্থক দিকের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন তখন ভব্য স্বতন্ত্র তার্কিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বিরোধের

মূল কেন্দ্রবিন্দু হল তর্ক। বুদ্ধপালিত মনে করেন চরম ভাববাদের বিকাশে যদি তর্কবিদ্যাকে মাধ্যম করা যায় তাহলে চরম ভাববাদের অগ্রগতি ধাক্কা খাবে। কারণ তাঁর মতে নাগার্জুনের চরমসত্তা বা শূন্যতার ক্ষেত্রে তর্কের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু ভব্য বুদ্ধপালিত এই যুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে মাধ্যমিক তত্ত্বকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় বা সাধারণ্যে টিকিয়ে রাখতে হয় তো যুক্তির মধ্য দিয়ে তত্ত্বকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। কারণ যুক্তি-সর্বস্ব-তত্ত্ব সাধারণের মনে স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম। এইভাবে নাগার্জুন পরবর্তী শূন্যবাদ বুদ্ধপালিত ও ভব্যের প্রচেষ্টায় তার ক্রম স্থবিরতা থেকে মুক্তি পায়।

পরবর্তীকালে টীকাকার চন্দ্রকীর্তির হাতে শূন্যবাদ পুনরায় প্রাণ সম্পদ ফিরে পায়। আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে চন্দ্রকীর্তিও দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রকীর্তি বুদ্ধপালিত ও ভব্যের দ্বন্দ্বে বুদ্ধপালিতকে সমর্থন করেন। আর শূন্যবাদের সমর্থনে বুদ্ধপালিতের দেওয়া যুক্তিকে পাথেয় করলেন। সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকলেন ভব্যের নব্য ব্যাখ্যা সম্পর্কে। এইভাবে শূন্যবাদ সংরক্ষণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। তর্কপদ্ধতির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার বক্তব্য উপস্থিত করে শূন্যবাদকেই আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর মতে তর্কবিদ্যার কোন প্রকার যাথার্থ্যই নেই বিশেষ করে শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। আর মহাযান প্রতিষ্ঠায় এইভাবে যিনিই এগিয়ে এসেছেন এবং তর্কপদ্ধতির সমর্থনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য গ্রন্থ লিখেছেন তাদের সবার বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর প্রচুর সময় অতিবাহিত করেছেন। শূন্য-বাদ সংরক্ষণে এমন কথাও বলেছেন যে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। চন্দ্রকীর্তির অনলস প্রয়াসে ও প্রভাবে সেই সময় শূন্যবাদের প্রভাবও বেশ বৃদ্ধি পায়।

চন্দ্রকীর্তির পর তাঁরই ধারা অনুসরণ করে সপ্তম শতাব্দীতে শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের এক বর্ধিষ্ণু শাসক পরিবার থেকে আসেন। তিনি সম্ভবতঃ শূন্যবাদের শেষ খ্যাতিমান পণ্ডিত। তিনি বৌদ্ধপণ্ডিত হলেও তাঁর বিশেষ গুণাবলী হলো তাঁর কাব্য প্রতিভা। আর শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠায় সেই কাব্যকে তিনি হাতিয়ার করেন। বস্তুজগতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কাব্যের

মাধ্যমে শূন্যতা প্রতিবাদন তত্ত্ব প্রচার করেন। এই কাব্যিক প্রকাশ এত জনচিত্তহরণকারী হয় যে শূন্যবাদ অন্যান্য বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রচার অতিক্রম করে প্রভাববিস্তারী তত্ত্ব হিসেবে খ্যাতিলাভ করে।

বিজ্ঞানবাদ ঃ অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু

বসুবন্ধু ঃ বিংশিকা ও ত্রিংশিকা, টীকাকার স্থিরমতি প্রভৃতি।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরবর্তী অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম আর এক বিভাগ—যোগাচার-বাদ বা বিজ্ঞানবাদ। কেননা শূন্যবাদ যত সুনিপুণ ভাবেই ব্যাখ্যাত হোক না কেন জনমনে স্থান করে নিতে বেশ সময় লাগে। সেই সময়ে যোগাচার সম্প্রদায় বা বিজ্ঞানবাদিগণ অভিনব ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভাববাদের অগ্রগতিতে নতুন এক গতি সঞ্চার করে। শূন্যবাদের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হয়ে যোগাচারবাদিগণ দেখেন যে যদি সুনির্দিষ্টভাবে চরমসত্তা চিহ্নিত করা না যায়, আর যদি সেই সঙ্গে সুসংবদ্ধ রীতিনীতি গড়ে তোলা না যায় তো মহাযান মতবাদকে জনচিত্তজয়ী করা খুবই কঠিন।

যোগাচার সম্প্রদায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন চিত্ত বা বিজ্ঞানই একমাত্র সত্তা। আধুনিক চিন্তাবিদের উপলব্ধিতে যা ধরা পড়েছে তা হলো পরবর্তী মহাযান সম্প্রদায়[১১] বিশেষ করে যোগাচারগণ কোন ভাবেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের চিন্তায় একটি মাত্র বিষয়ই জাগরূক ছিল যে কোন-ভাবেই হোক একটা সুসংবদ্ধ মতবাদ চাই। যে মতবাদ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করবে কি করে এই জগৎ এল? তার উৎসই বা কী? আর কেবলমাত্র চরমসত্তা কি, সেইটুকু নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। বরং কিভাবে সেই চরম সত্তা থেকে জগতের অস্তিত্ব প্রকাশ পেল তারই ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। মাধ্যমিক সম্প্রদায় চরমসত্তা, শূন্য বা নির্বানকে আনন্দঘন বলে প্রচার করছেন। অথচ বলছেন তা চেতনার বাইরে। তা হয় কি করে? চেতনার অতীত মানে যা বোঝাচ্ছেন তা হলো এক-কথায় 'চেতনাশূন্য'। তাহলে তো নির্বাণ বলতে অচেতন অবস্থার কথাই বোঝানো হয়েছে। অথচ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে নির্বাণ কিনা আনন্দঘন অবস্থা। কিন্তু আনন্দঘন অবস্থা চেতনা ছাড়া কি করে সম্ভব? এই ভাবে

বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় শূন্যবাদকে চরমভাবে খণ্ডন করে ভিন্ন পদ্ধতিতে চরম-সত্তার ব্যাখ্যা করেন। সেই ভিন্ন পদ্ধতি হলো শূন্যবাদের বিপরীত সিদ্ধান্ত। নির্বাণ হলো শুদ্ধ চৈতন্য বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।

যোগাচার সম্প্রদায় বা বিজ্ঞানবাদিগণ সমস্ত কিছুর মূল বা উৎস হিসেবে একটিমাত্র চেতন সত্তাকে নির্দেশ করেছেন। তা হলো চিত্ত বা মন। এই জগতের বৈচিত্র্যময় বস্তুরাজি যা আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা কেবল ধারণামাত্র। এই ধারণা সেই চরমসত্তা, চিত্ত বা মনেরই অংশ। চিত্ত বা মন থেকেই সমস্ত কিছু আসে। আবার সেই চিত্ত বা মনেই সবকিছু অবশেষে বিলীন হয়। অতএব চিত্ত বা মনই হলো একমাত্র সত্য, চরম সত্য। এই চরম সত্যের [৫৬] উপলব্ধি কেবলমাত্র যোগাভ্যাস ও ধ্যান, নিদিধ্যাসনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি মুক্ত আত্মা বা যোগী বলে তখনই চিহ্নিত হন যখন সাধন মার্গের মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্য উপলব্ধি করেন। এই চরম সত্যই একমাত্র সত্য। কেবলমাত্র যোগীই বস্তুজগতের বন্ধনময় সত্তা ও চরম সত্তার পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম। এককথায় যোগী হলো সেই ব্যক্তি যে বস্তুজগতের প্রহেলিকার মধ্যেও অশুদ্ধ ভাবনা মুক্ত হয়ে যোগসাধনায় সিদ্ধ হন। এ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক উক্তি অভিধর্মকোষে রয়েছে।[৫৭] যোগী হলেন তিনি যিনি শবের উপর বসে ও শুদ্ধভাবনায় অস্তিত্ব ও অন-স্তিত্বের উপলব্ধি করতে পারেন। চেরবাটস্কি আরও সুন্দরভাবে যোগাচার দর্শন কথিত যোগীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায় ও যোগসাধনার উল্লেখ করেছেন কিন্তু যোগাচার দর্শনে যোগচর্চা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[৫৮] যোগাচার দর্শনে স্পষ্টই উল্লেখিত যোগসাধনা হলো সেই অবস্থা যার সাহায্যে স্বয়ং বোধিসত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যে বহি-র্জগতের অস্তিত্ব নেই। সকলকিছুই কেবলমাত্র চিত্ত। নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপায় সম্পর্কেও যোগী সচেতন। এর পরবর্তী পর্যায় হলো, যোগীর পূর্ণ মুক্তি। পূর্ণ মুক্তি বলতে বোঝায় অবিদ্যার প্রভাব থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি। অতএব যোগ হলো একমাত্র মাধ্যম, অন্ত-প্রত্যক্ষের সাহায্যে সর্বোচ্চ সত্তার চরম প্রজ্ঞায় পেঁাছানো।

যোগাচার সম্প্রদায় এই অভিনব ব্যাখ্যার মাধ্যমে দাবী করে যে তারাই বুদ্ধদেবের একমাত্র আসল অনুগামী। কেননা বুদ্ধদেব স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে

সর্বোচ্চ জোর দিয়েছেন শরীর এবং মনের শৃঙ্খলায় জ্বালা যন্ত্রণা মুক্তির পরম আদর্শ হিসাবে। এই ভাবে যোগাচার দর্শন যে অভিনব দর্শন উপস্থিত করল তার মূল তাৎপর্য হল—**সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ**। বাহ্যিক সকল বস্তুরাজিই বিজ্ঞান বা চেতনারই প্রকাশ মাত্র।

যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দুই ভাই অসংগ ও বসুবন্ধুর নাম সর্বাগ্রে, উল্লেখযোগ্য। উভয়েই একই মাতার হলেও ভিন্ন পিতার সন্তান। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দিকে গুপ্ত সম্রাটের সুবর্ণ যুগের সময় কান্দাহারের পেশোয়ারে (পূর্বনাম পুরুষপুর) ও গান্ধারায় যথাক্রমে অসংগ ও বসুবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নন্দ, পরমসেনা ও সম্যক্‌সত্য নামে তিনজন আদি যোগাচারবাদীর নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এঁরা হলেন নাগার্জুনের সমসাময়িক, কার্যত অসংগ ও বসুবন্ধুই যোগাচার মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তারনাথ ও অসংগ বসুবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভূমিকা স্বীকার করেছেন। কিন্তু যোগাচার দর্শন যে নাগার্জুন সমসাময়িক একথা স্পষ্ট ভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন। সেই সময় নাগার্জুনের ব্যক্তিত্ব এতই প্রখর ছিল যে ঐ তিন প্রবক্তা নাগার্জুনকে ছাপিয়ে উপরে উঠতে পারেন নি। তার ফলে এমনকি তিব্বতী ভাষায়ও তাঁদের কোন গ্রন্থ, খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের অসংগ, বসুবন্ধুকে ঘিরেই যোগাচার দর্শনের আলোচনা করতে হবে।

অসংগ ও বসুবন্ধু উভয়েই যোগাচার দর্শনের প্রতিষ্ঠা করলেও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র থেকে তা করেছেন। অসংগর মূল কর্মভূমি ছিল অযোধ্যা। অবশ্য তারনাথ উল্লেখ করেছেন রাজগীরের নালন্দা মঠে অসংগ প্রায় বার বছর যাবৎ ছিলেন। কিন্তু বসুবন্ধুর কর্মকেন্দ্র ছিল কাশ্মীরে। অবশ্য তখন তিনি মূল বৌদ্ধদর্শন অনুগামী বৈভাষিক সম্প্রদায়ের গোঁড়া সমর্থক। বৈভাষিক দর্শনের উপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অসঙ্গের প্রভাবে তিনি বিজ্ঞানবাদী হয়ে ওঠেন। তারপর অযোধ্যায়, কিছুদিন নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হিসেবেও কাটান। শেষ বয়সে মোহমুক্ত অবস্থায় নেপালে দেহ রাখেন। বিজ্ঞানবাদী হয়ে ওঠার পর যে গ্রন্থ লিখেছেন তার মধ্যে বিজ্ঞানবাদের সপক্ষে 'বিংশিকা ও ত্রিংশিকাই' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

পালন করে। গ্রন্থটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে 'বিংশিকা ও ত্রিংশিকা' যথাক্রমে বিশটি ও ত্রিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। কিন্তু এই বিশটি ও ত্রিশটি শ্লোকই বিজ্ঞানবাদের অধিবিদ্যক দিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গ্রন্থ বলা যায়। কিন্তু অসংগ বিশেষভাবে গুরুত্ব স্থাপন করেছেন পরমসত্তার উপলব্ধির উপর। যোগাচারভূমি নামে একটি বৃহৎ শাস্ত্র রচনা করেছেন। যদিও সর্বপ্রথম যোগাচারবাদের মূল সূত্র পাওয়া যায় মহাযান সূত্র হিসেবে লংকাবতার শাস্ত্রে। অসংগই এই যোগাচার দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত। তবুও তিনি বলেছেন যে তিনি হলেন মৈত্রেয়নাথের প্রত্যক্ষ ছাত্র। অসংগের মূল দুটি শাস্ত্র, একটি হলো মহাযানভূমি সূত্র ও মহাযান সূত্রালংকার। এই দুটি গ্রন্থই কিন্তু যোগাচার দর্শনের ভিত্তিভূমি স্বরূপ।

এ পর্যন্ত এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে যোগাচার দর্শন বৌদ্ধ দর্শনে অভিনব ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চেয়েছেন। আর সেই অভিনব ব্যাখ্যায় অধিবিদ্যক দিক সুস্পষ্ট। যোগাচার সম্প্রদায় অনুযায়ী চরম সত্তা হলো শুদ্ধ চৈতন্য, বিজ্ঞানমাত্রতা। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের আলোকে যোগাচার সম্প্রদায়ও শুদ্ধ চৈতন্যের চলমান স্রোত হিসেবে বিজ্ঞান সন্তানের উল্লেখ করেছেন। বাহ্য-অভ্যন্তর জড়-চেতন সকলই বিজ্ঞানের পরিণাম। এই বিজ্ঞানের সমষ্টিকে আলয় বিজ্ঞান বলা হয়। শুদ্ধ চৈতন্য বা বিজ্ঞানমাত্রতাই যেহেতু একমাত্র চরম সত্তা, বাস্তব জগৎ সম্পূর্ণত অসৎ। এই বস্তুজগৎ হলো মায়াময় অবিদ্যা প্রভাবিত পূর্ব পরিকল্পনার পরিক্রমা। একমাত্র সত্য শুদ্ধ চেতনাই হলো আলয়, বিজ্ঞান বা চেতনার ভাণ্ডার। ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই এখান থেকে আসে আবার এখানেই ফিরে যায়। আত্মা বা বিজ্ঞানই হলো পূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মা জীবাত্মার থেকে পৃথক কেননা জীবাত্মা অসত্য, ভ্রমযুক্ত। এই সত্যের আলোকে বিজ্ঞানবাদী পরমাণুতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করেন। পরমাণু ব্যাপারটাই মিথ্যা অনুপযুক্ত ও অযৌক্তিক। কারণ পরমাণুতত্ত্ব বস্তুর স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী। বিজ্ঞানবাদে চিত্ত বা আত্মার অবস্থান কোন কিছুর উপর অবলম্বন করে হয় না। এই জন্য বিজ্ঞানবাদকে কখনো কখনো নিরালম্বনবাদও বলা হয়। চিত্ত, চৈত্যন্য বা বিজ্ঞান স্বাধীন ও স্বয়ম্ভূ। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের আলয় হলো পরমাত্মা বা আলয় বিজ্ঞান। এই পরমাত্মাই জগতের কারণ। পরমাত্মা নিজে কিন্তু কার্য-কারণরহিত স্বয়ম্ভূ, বিশুদ্ধ

চৈতন্য।

শূন্যবাদের মতোই বিজ্ঞানবাদ সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের এই বহির্জগত স্বপ্ন, ভ্রম, মায়া, মরীচিকার সাহায্যে অসত্য ও মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন। এই যোগাচার সম্প্রদায় একটি কূট নিয়মের উল্লেখ করেছেন। তা হলো সহোপলম্ভনিয়ম। যোগাচার সম্প্রদায়ের মতে বস্তুজগত সম্পর্কে সাধারণের ধারণা সত্য। কিন্তু এ সংস্কার ভিন্ন কিছুই নয়। রূপমাত্র ফেনপিণ্ড, বুদবুদ সদৃশ। এইভাবে বস্তুরাজি আসলে অসত্য বা মিথ্যা। বস্তুজগতের যে কোন প্রকার উপলব্ধি যেমন নীল, পীত, দীর্ঘ, হ্রস্ব প্রভৃতি আকার ভিন্ন কিছুই নয়। জ্ঞেয় বিষয় হিসেবে কখনো স্বতন্ত্র উপলব্ধি ঘটে না। তাই নীল ও নীলের ধারণা এক। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুত অভিন্ন। এই ভাবে নীলের ধারণা সত্য কিন্তু বাস্তবজগতে নীলের কোন অস্তিত্বই নেই। নীলাকার জ্ঞান বিশেষই নীল। বিষয়টিকে সম্যক উপলব্ধি করানোর জন্য যোগাচার সম্প্রদায় বিষয়, বিষয়ী ও বিষয় জ্ঞানের সূক্ষ্ম পার্থক্য সূচিত করে প্রমাণ করেছেন যে একজন কখনোই তার ধারণার চৌহদ্দির বাহিরে বিষয়ে পৌঁছোতে পারে না। ফলে একজন কেবল নিজের ধারণাই জানে বা জানতে পারে। কখনোই বাইরের বস্তু সম্পর্কে জানতে পারে না। যোগাচার দর্শনের এই প্রমাণের সঙ্গে আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্কলের প্রমাণের মিল খুঁজে পাই। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে বিজ্ঞানবাদের মূল বক্তব্যও সেই উপনিষদ থেকে নেয়া। উপনিষদে যা আকারে ইংগিতে ছিল তারই দার্শনিক রূপ যোগাচার দর্শনে দেওয়া হয়েছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রায় অনুরূপভাবেই বস্তু জগতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে ভ্রম, স্বপ্ন, মায়া, মরীচিকা ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। যোগাচার দর্শনও তাই করেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ভ্রম, স্বপ্ন, মরীচিকা ইত্যাদি যেমন মিথ্যা তেমনি এই বস্তুজগতও মিথ্যা। তার শুধু আভাসিক সত্যতা রয়েছে। কেবল অজ্ঞানপ্রসূত চিন্তা থেকেই এই সকল যে পরমাত্মাপ্রসূত তার উপলব্ধি ঘটে না। কিন্তু অজ্ঞান বা অবিদ্যার প্রভাব মুক্ত হলে মিথ্যাজ্ঞান লোপ পায়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল উক্তি কোন শক্ত ভিতের উপর ছিল না। বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় জ্ঞানতত্ত্বের কূটতর্ক উপস্থিত করে উপনিষদীয় মতবাদকে শক্ত ভূমি দিয়েছে।

বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় শূন্যবাদীদের মতোই তাঁদের প্রবর্তিত মতবাদ যে উপনিষদীয় মতবাদেরই নামান্তর একথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছেন। কেননা তাঁরা আসলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। আর তাছাড়া তাঁদের প্রচ্ছন্ন দায়িত্ব হলো লোকায়ত বৌদ্ধের প্রভাব থেকে সাধারণের চিত্তকে ভাববাদের দিকে পরিচালিত করা। সেই কাজে নিজেদের উপনিষদীয় ভাববাদ অনুসারী বলে চিহ্নিত করলে অসুবিধা। শূন্যবাদের সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় সরাসরি আত্মার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে উপনিষদীয় ভাববাদের সনাতন ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরূক করে ভাববাদের পরবর্তী বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

অসংগ ও বসুবন্ধু পরবর্তী বিজ্ঞানবাদ স্বমহিমায় টিকে থাকে যোগ্য উত্তরসূরী দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির নিরলস প্রয়াসের জন্য। দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি ক্ষুরধার যুক্তি পদ্ধতি অবলম্বন করে এই প্রবাহকে অব্যাহত রেখে-ছিলেন। কিন্তু বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় যে এই দুই পণ্ডিত যোগাচার দর্শনে তর্কবিদ্যার আমদানি করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি মূল বিজ্ঞানবাদ গ্রন্থাবলীতে তর্কবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুল্লেখ ছিল। বোধ হয় অসচেতন ছিল বললেই ঠিক বলা হয়। চেরবাট্‌স্কি এই প্রসঙ্গে লংকাবতার সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক তর্ক পদ্ধতির আমদানি করে দিগ্‌নাগ তাঁর 'প্রমাণ সমুচ্চয়'-এর মধ্য দিয়ে ও ধর্মকীর্তি তাঁর 'প্রমাণবার্তিকের' মধ্য দিয়ে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নতুন তর্কবিদ্যার প্রবক্তা বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা করব।

পরবর্তী বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ঃ ধর্মকীর্তিঃ প্রমাণবার্ত্তিক
(ভাববাদের সপক্ষে প্রমাণ স্বীকার)।
টীকাকার ধর্মোত্তর ও বিনীতদেব।

বিজ্ঞানবাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে পরবর্তী দুই প্রথিতযশা শিষ্য স্থিরমতি ও দিগ্‌নাগের প্রচেষ্টায়। দিগ্‌নাগেরই অনুসারী হলেন ধর্মকীর্তি। যোগাচার দর্শনের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে উভয়েই যুক্তিপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হলেন। আর এক সময় সর্বস্ব চিন্তা নিয়োগ করলেন তর্কবিদ্যায়।

এইভাবে যোগাচার ভাববাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করলেন। মূল দুটি গ্রন্থ দিগ্‌নাগের 'প্রমাণ সমুচ্চয়' এবং ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক', নিঃসন্দেহে ভারতীয় তর্কবিদ্যার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম।

স্থিরমতি দিগ্‌নাগ পূর্ববর্তী। তিনি সুরাট (বল্লভী) ও নালন্দাকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় যোগাচার দর্শনের অধিবিদ্যক দিকের উপর। আর তাকে ভিত্তি করেই তিনি বিজ্ঞানবাদের উপর বিশেষ টীকা লেখেন। যা এখনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

দিগ্‌নাগ দক্ষিণ ভারতের তামিল প্রদেশে কাঞ্চীর পাশে সিংহবক্ত্র গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উড়িষ্যা। দিগ্‌নাগ ও স্থির-মতির মত অধিবিদ্যক দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু দিগ্‌নাগের বিশেষ অবদান যা তা হলো অধিবিদ্যক দিককে স্থাপিত করার ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্ব ও তর্কবিদ্যার গুরুত্বকে সর্বাধিক স্থান দিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা বিজ্ঞানবাদের অধিবিদ্যক তাৎপর্য কেবলমাত্র জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিপদ্ধতির সাহায্যে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাবে।

অবশ্য দিগ্‌নাগের এই অভিনব চিন্তার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। দিগ্‌নাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও প্রথমে তিনি যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন তিনি হলেন বাৎসীপুত্রীয় গোষ্ঠীর আচার্য নাগদত্ত। এই গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন দ্রব্যের ছায়া হিসেবে। দিগ্‌নাগ এই মতবাদকে উপহাস করায় তাঁকে শিষ্যত্ব হারাতে হয়। এরপর তিনি বসুবন্ধুর কাছে যান ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর আগ্রহ সহকারে গুরুত্ব দিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাই তাঁর গ্রন্থসমূহে অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের তর্কসার সহ সমা-লোচনা দেখা যায়।

ধর্মকীর্তি হলেন দিগ্‌নাগের শিষ্যের শিষ্য। দিগ্‌নাগের শিষ্য হলেন ঈশ্বরসেন। ঈশ্বরসেনের শিষ্য ধর্মকীর্তি। দক্ষিণ ভারতের চোল সীমান্তের তিরুমৈলী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও বলাবাহুল্য

অধিবিদ্যক দিককেই ভিত্তিভূমি করে বিজ্ঞানবাদের অনুগামী হন। আর দিগ্‌নাগের তর্কবিদ্যার প্রতিষ্ঠায় সমগ্র জীবনই তিনি ব্যয়িত করেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন[১৭] তাঁর বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে বসুবন্ধু থেকে শুরু করে ধর্মকীর্তির সময় পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের চরম বিকাশের সময়। সেই সময়ে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থান ত্বরান্বিত হয়েছিল। স্থিরমতি ও দিগ্‌নাগ বসুবন্ধু প্রদর্শিত চরমতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। আর বিশেষ করে বস্তুজগৎ নস্যাৎ করার কাজে সর্বস্ব আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুজগতের সপক্ষে একদিকে ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে অগ্রগতি অব্যাহত রাখলেও তখন চলছিল পরমাণুবাদের জয়জয়কারের যুগ। তাই দিগ্‌নাগ বিশেষ যত্নবান হন একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করতে। তিনি বসুবন্ধুর পরমাণু খণ্ডনকে উপজীব্য করে যে গ্রন্থ লিখলেন তা হলো 'আলম্বন পরীক্ষা'। আজও পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদের সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ বলে পরিচিত। 'আলম্বন পরীক্ষা'-র মূল বিষয় পরমাণুবাদ খণ্ডন। বস্তুবাদের অগ্রগতিতে পরমাণুবাদ প্রাচীন মতবাদের থেকে অগ্রসরমাণ তত্ত্ব হিসেবে নতুন বনিয়াদ নিয়ে ক্রমশই জনচিত্তজয়ী হয়ে ওঠাই ভাববাদীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। তৎ-কালীন ভাববাদী পণ্ডিতেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে এই পরমাণুবাদকে খণ্ডন করতে না পারলে বস্তুবাদকে ধ্বংস করা যাবে না। দিগ্‌নাগ বসুবন্ধুর পথ ধরে তাই দর্শনের ইতিহাস থেকে বস্তুবাদকে চিরতরে উপড়ে ফেলার জন্য একেবারে ভিত ধরে নাড়া দিলেন। নাগার্জুন যা ইংগিতবহ করে তুলেছিলেন বসুবন্ধু তাকে রূপায়িত করেন। আর দিগ্‌নাগ সেই অসমাপ্ত কাজকে বিশেষিত করে প্রকাশ করলেন। পরবর্তীকালে ধর্মকীর্তি ও শান্তরক্ষিত সেই বিশেষিত রূপকে পল্লবিত করেন।

আচার্য বসুবন্ধুর মত দিগ্‌নাগও বললেন কেবলমাত্র ধারণাই সত্যি। তাঁর মতে বস্তুর অস্তিত্ব যদি থেকেও থাকে তা আছে কেবল ধারণায়। ধারণাই তাকে কখনো বিষয় কখনো বিষয়ী রূপে উপস্থিত করে। তাই বাহ্যবিষয় কেবল ধারণার 'গ্রাহ্যভাগ' বা 'আলম্বন প্রত্যয়'। তাই তার বাহ্য-আভাস অস্বীকার করা যায় না কেননা গ্রাহকের কাছে সেইভাবে প্রতিভাত হয়। বস্তুত বিষয় ধারণার বাইরে নেই, থাকতে পারে না।

অন্তর্জ্ঞেয় রূপই বাহ্য অবভাস রূপে ধরা দেয়।[৬০] অতএব যদি একথা বলা যায় যে ধারণার বাইরে বস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান, আর তা হলো পরমাণুপুঞ্জর সমষ্টি তো ভুল করা হবে। কেননা পরমাণুসমষ্টি কথাটাই অযৌক্তিক ও অবাস্তব। এই যুক্তির সমর্থনে দিগ্‌নাগ নানান তর্কের উপস্থিত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তা আলোচনা করা যাবে।

ধর্মকীর্তি বসুবন্ধু-দিগ্‌নাগের অসমাপ্ত কাজকেই কাঁধে তুলে নেন। তিনি বস্তুবাদ বিধ্বংস করার কাজে পরমণুবাদ খণ্ডনকে চরম উৎকর্ষ হিসেবে গ্রহণ করলেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা সংযোজিত করলেন। ধর্মকীর্তির এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদান হল 'সহোপলম্ভ নিয়ম' আবিষ্কার। দিগ্‌নাগের অস্পষ্ট দিককেই তিনি এখানে প্রস্ফুট করে তুললেন। সহোপলম্ভ নিয়মের অর্থ হল ধারণা ও ধারণার বস্তু যে অভিন্ন তা প্রমাণ করা। স্পষ্ট করে বলতে গেলে যখন কোন একজন কোন একটি বস্তুকে উপলব্ধি করতে চায় তখন সে তার ধারণার মধ্যেই থাকে। কেউই কোন সময় বা কখনো তার নিজের ধারণার বাইরে যেতে পারে না। প্রত্যক্ষ-ভাবেই শেষ পর্যন্ত বস্তুর ধারণার কাছেই পৌঁছোয়। ঠিক অনুরূপ যুক্তিই বার্কলে ব্যক্তিগত ভাববাদের সমর্থনে ইউরোপীয় দর্শনে দেখিয়েছেন। ধর্মকীর্তি ও বার্কলের তুলনামূলক আলোচনা পরবর্তী আলোচনার সময় স্বভাবতই আসবে।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো ধর্মকীর্তি ব্যক্তিগত ভাববাদের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও আত্মকেন্দ্রিকতাবাদকে স্বীকার করেন নি। তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। আর তার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখেছেন। তার নাম হল 'সন্তানান্তর-সিদ্ধি'। এ গ্রন্থটি ছন্দে লিখিত। এখানে তিনি ভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই বৈপরীত্য বিশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত। ধর্মকীর্তির মূল লক্ষ্য চরম ভাববাদকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করা। অথচ তিনি অন্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। চরম ভাববাদের ক্ষেত্রে আত্মসর্বস্ববাদ অস্বীকার তো ভাববাদকেই দুর্বল করা। যদি ধারণাই একমাত্র চরম সত্য হয়ে থাকে তো অন্য মনের অস্তিত্ব আছে কি না তার ভাববার কি দরকার? ধর্মকীর্তির এই বিপরীত রীতি বেশ ভাবিয়ে তোলে। তবে এই ব্যতিক্রম কেবল তর্কবিদ্যার জন্যই। যা তিনি তাঁর

আচার্য দিগ্‌নাগের কাছ থেকেই পেয়েছেন। তর্কবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রে পরার্থানুমান রয়েছে। পরার্থানুমানের অর্থই তো হলো পরের জন্য অনুমান। স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজের জন্য অনুমানের ক্ষেত্রে তো কোন সমস্যাই নেই। সমস্যা যা তা কেবল পরের জন্য অনুমানের ক্ষেত্রে। তর্ক, প্রমাণ, নির্দিষ্টকরণ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই অকেজো হয়ে পড়ে যদি পরার্থানুমান স্বীকার করা না যায়। আর পরার্থানুমান স্বীকার করতে হলে অন্যমনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। অর্থাৎ তার্কিক ছাড়া ও অন্য একজনের মন ও তার উপস্থিতিকে মূল্য দিতেই হয়। ঠিক এই কারণেই ধর্মকীর্তিকে 'সন্তানান্তর-সিদ্ধির' মত পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করতে হয়।

এইভাবে দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব পণ করলেও তাঁরা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে নতুন ধরনের তর্কবিদ্যার প্রয়োজনে সচেষ্ট হন। দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'প্রমাণ সমুচ্চয়' ও 'প্রমাণ বার্তিকে' অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন প্রমাণ বিষয়ে। প্রমাণের বৈধতা নিরূপণের জন্য উভয়েই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমান আলোচনায় দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি বিশেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক যে অর্থে প্রত্যক্ষ ও অনুমান বোঝাতে চান তার থেকে দূরে সরে এসেছেন। উভয়েই প্রত্যক্ষ ও অনুমান পর্যালোচনায় ভিন্ন উপলব্ধি তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই উপলব্ধি আবার শূন্যবাদীদের থেকে ভিন্ন। এমনকি আমরা এও দেখব যে এই প্রমাণ উপলব্ধি অদ্বৈত বেদান্তে শঙ্কর ও তাঁর অনুগামী শ্রীহর্ষের থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এককথায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যেখানে সকল ভাববাদী পণ্ডিতই প্রমাণকে দোষ দুষ্ট বলে অগ্রাহ্য করেছেন দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি সেখানে প্রমাণের সপক্ষে সাহসী যুক্তি তুলে ধরেছেন। তাই স্বতঃই ধাঁধার যা তা হলো কি করে দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি একই সঙ্গে ভাববাদ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ হয়েও প্রমাণের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁরা কি এমন কোনভাবে, স্বতন্ত্র আঙ্গিকে বিজ্ঞানবাদ ব্যাখ্যা করেছেন যাতে যুক্তিবিদ্যা ও ভাববাদের মূল দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়ে যায়? আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাবো যে তা মিটে যায় নি। বরং দেখা যাবে প্রমাণের সপক্ষে যুক্তি দেখানোর সময় ক্ষণিকের জন্য হলেও

তাঁরা বিজ্ঞানবাদ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এ কথা তাঁদেরই টীকাকারগণ যথারীতি স্বীকার করেছেন। যদিও এই সব টীকাকারগণ সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ-দর্শন অনুগামী এবং ব্যক্তিগত ভাববাদের ঘোরতর বিরোধী। টিপ্পনি গ্রন্থ প্রণেতা ধর্মোত্তর ও বিনীতদেব উভয়েই এই অসংগতিকে তুলে ধরেন। তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এইভাবে যে দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি ব্যক্তিগত ভাববাদী হয়েও ভাববাদ বিরোধী জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে কি করে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। কারণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে বহুল স্বীকৃত। তাই এই টীকাকারগণ এ কথা কবুল করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁরা প্রমাণশাস্ত্র পর্যালোচনার সময় ব্যক্তিগত ভাববাদকে সরিয়ে রেখে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় প্রচারিত দার্শনিক বস্তুবাদের প্রভাব এড়াতে পারেন নি অথচ সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদ বিরোধী। আধুনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[৬১] কিন্তু এই অসংগতিকে যুক্তি দিয়ে কি কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্ভব হয়েছে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানবাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও কি দিগ্‌নাগ কি ধর্মকীর্তি উভয়ের পক্ষেই প্রমাণশাস্ত্র পর্যালোচনা করা সম্ভব। কেননা ভারতীয় দর্শনে নাগার্জুন-পরবর্তী ভাববাদের বিকাশের স্তরে ব্যবহারিক সত্য (সংবৃতি সত্য) ও পারমার্থিক সত্যের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ব্যবহারিক সত্য বস্তুজগতের ব্যবহারিক দিককে স্বীকার করে। আর পারমার্থিক সত্য হলো চরম সত্য। দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি যুগধারায় ব্যবহারিক সত্যের উপর নির্ভর করে প্রমাণশাস্ত্র লিখেছেন আর পারমার্থিক সত্যের দিক থেকে বিজ্ঞানবাদকেই পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করেছেন।

শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সমন্বয়
শান্তরক্ষিত ও তাঁর 'তত্ত্বসংগ্রহ, কমলশীল ও তাঁর 'পঞ্জিকা'।

শুরুতে শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ একই ভাববাদের বিকাশে আপাত-বিরোধী মতবাদ প্রচার করলেও শেষ পর্যন্ত এই দুটি সম্প্রদায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। অবশ্য এর জন্য সামাজিক প্রেক্ষাপটও অনেকখানি দায়ী। উভয় সম্প্রদায়ই সময়োপযোগী সুবিধায় প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করলেও

কালের নিয়মে মন্থর হয়ে পড়ে। অথচ সমাজ-পরিবেশ উজ্জীবিত ভাবাদর্শ গ্রহণ করতে সমধিক আগ্রহী। এমনই এক পরিস্থিতিতে মূল ভাববাদের অবক্ষয় আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের অনুগামী পণ্ডিতগণ সমন্বয় সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হন। কিন্তু এত করে ভাববাদী আদর্শ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও স্বতন্ত্র বিজ্ঞানবাদ টিকিয়ে রাখা যায় নি। ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে শান্তরক্ষিত ও কমলশীলকে শেষ পর্যন্ত তিব্বতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এইভাবে শান্তরক্ষিতের পর কমলশীলই মহাযান ভাববাদের সর্বশেষ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। এরপর অনেকেই অনেকভাবে পুঁথি-পত্রের মাধ্যমে চেষ্টা করেন নি যে তা নয় কিন্তু তা কালজয়ী হতে পারে নি।

প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দিকে শান্তরক্ষিত ও তাঁর টীকাকার কমলশীল উভয়েই এই সমন্বয়ী সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভাবে প্রয়াসী হন। বলতে গেলে এই সমন্বয়ী সম্পর্কের মূল রূপকার তাঁরাই। শান্তরক্ষিত এক-যোগে মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শন অনুশীলন করে এই উপলব্ধিতে পেঁাছোন যে এমন কোন সত্যিকারের দার্শনিক তাৎপর্য নেই যাতে করে মহাযান বৌদ্ধগণ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবে। কারণ কি শূন্যবাদ, কি বিজ্ঞানবাদ উভয়েই উপনিষদীয় ভাববাদের আদর্শকে পুষ্ট করার জন্যই বিশেষ প্রচেষ্টা করেছেন। উভয়েরই মূল লক্ষ্য শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মতত্ত্ব আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।[৬২] আপাতদৃষ্টিতে শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিতান্তই মামুলী। একই চিরন্তন সত্তা চৈতন্য কখনো জ্ঞাতা কখনো জ্ঞেয় হিসেবে প্রতিভাত হন। জগৎ বৈচিত্র্য চিরন্তন আত্মারই ভ্রমাত্মক প্রকাশ। চিরন্তন আত্মাকে ঘিরেই সকলই বিবর্তিত। এই তত্ত্বের সঙ্গে খুব একটা যে বিরোধ আছে তা নয়। একটু সামান্য ত্রুটি বর্তমান। সেই ত্রুটি হলো চেতনাকে চিরন্তন সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা।[৬৪] কিন্তু এই অপরাধ অত্যন্ত স্বল্পই। কমলশীল শান্তরক্ষিতের এই যুক্তিকেই গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই মামুলী ভুল খুব একটা ধর্তব্যের নয়। কেননা যে সত্যের উপর তাঁরা বিশেষ জোর দিয়েছেন তা তাৎপর্যব্যঞ্জক। তাঁদের মূল বক্তব্যই বিশেষ প্রনিধানযোগ্য : শুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র সত্য।

এইভাবে মহাযান ভাববাদ প্রতিষ্ঠায় তাই উভয়ে মিলে বস্তুজগতকে

অলীক ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন সাধারণের বস্তুজগতের অস্তিত্বের চিন্তা হলো ব্যক্তি মনের আপন মাধুরি মিশিয়ে ভ্রমাত্মক উপলব্ধি করা। এইভাবে তাঁরা ব্যবহারিক জীবন ও পারমার্থিক জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উভয় সম্প্রদায়ই নির্বাণ প্রসঙ্গে দু প্রকার সত্যের উপর নির্ভর করেছেন। সত্য দু প্রকার। ব্যবহারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবৃতি সত্য। অতীন্দ্রিয় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে পারমার্থিক সত্য। সংবৃতি সত্যের সত্যতা ততক্ষণ যতক্ষণ না পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি হচ্ছে। পারমার্থিক সত্যই একমাত্র সত্য। সংবৃতি সত্য পারমার্থিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আসলে মিথ্যা। এইভাবে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল পূর্ববর্তী আচার্যদের প্রতিষ্ঠিত সত্য শুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র সত্য, চরম সত্তা বিশেষ করে বসুবন্ধু তাঁর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা-সিদ্ধি' ও দিগ্‌নাগ তাঁর 'আলম্বন পরীক্ষায়' যা প্রমাণ করেছেন তাকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[৬৪] এই শুদ্ধ চৈতন্য হলো অদ্বয়। জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব এখানে বিলুপ্ত। এই শুদ্ধ চৈতন্য স্বপ্রকাশ।[৬৫] এই শুদ্ধ চৈতন্যই শুদ্ধ আত্মা। এই বিশুদ্ধাত্মদর্শনই হলো সঠিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হয় তখনই যখন শুদ্ধ চৈতন্যই শুদ্ধ আত্মা এই উপলব্ধি ঘটে।[৬৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের সময় সমন্বয়ী সম্পর্ক স্থাপনের পর দুই মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন রকম বিতর্ক ছিল না। কিন্তু এই বিতর্ক নিতান্ত নিয়মরক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কতকটা সাজানো বিতর্কের মত। সত্য যা তা হলো এককালে দুটি সম্প্রদায়ই পরস্পর বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আপাতবিতর্কগুলিকেও দূরে সরিয়ে রেখে একমন, একপ্রাণ হয়ে ভাববাদ বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন।

শান্তরক্ষিত খুব সম্ভব বাংলোদেশের কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভাববাদের আদর্শ গ্রহণ করার পরই তিনি তিব্বতে চলে যান। সেখানে কমলশীলকে সঙ্গে পান। উভয়ের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রসার লাভ করে। এমনকি তাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

অদ্বৈত বেদান্ত : গৌড়পাদ ও তাঁর মাণ্ডুক্যকারিকা।
শঙ্কর ও তাঁর শারীরক ভাষ্য।
পরবর্তী অদ্বৈতবেদান্তিগণ।

উপনিষদীয় ভাববাদ বিরুদ্ধবাদী স্রোতের ঝড়জল বাঁচিয়ে শূন্যবাদ-বিজ্ঞানবাদের মধ্য দিয়ে বেদান্ত দর্শনে এসে তার চরম উৎকর্ষ লাভ করে। শূন্যবাদ এবং ভাববাদের ক্রম অবক্ষয় থেকে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ অষ্টম-শতাব্দীর দিকে এক নতুন চিন্তার জন্ম নেয় গৌড়পাদের রচনার মাধ্যমে। গৌড়পাদ শংকরাচার্যের গুরুদেব বলে খ্যাত। তাছাড়াও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়েই কোন কারণ খুঁজে পাননি কেনই বা উপনিষদীয় ভাববাদ অনুসারী মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে বিবাদ বা বিতর্ক করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে গৌড়পাদও প্রথম দিকে বৌদ্ধ দর্শন অনুসারী সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদ ব্যাখ্যা করলেও কখনোই বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের কাছে ঋণ স্বীকার করতে ভোলেন নি। আধুনিক পণ্ডিত চেরবাটস্কি[৬৭] স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমরা দেখি পরবর্তী সময়ে প্রাচীন বেদান্ত নতুন আঙ্গিকে তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে সুসজ্জিত হয়। বিশেষ করে যখন বৌদ্ধ দর্শনে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ সম্প্রদায় নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত[৬৪] ও দৃঢ়তার সঙ্গেই অনুরূপ মন্তব্য করেন। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দাশগুপ্ত বলেছেন যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রথম প্রবক্তা হলেন গৌড়পাদ। তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর টীকা লিখতে গিয়ে অদ্বৈত তত্ত্বকেই ব্যাখ্যা করেন। দাশগুপ্ত বলেন এই তত্ত্বগুলি মাধ্যমিক তত্ত্ব থেকে নেওয়া, যা নাগার্জুনের কারিকায় দেখা যায় এবং বিজ্ঞানবাদের তত্ত্ব যা লংকাবতার সূত্রে দেখা যায়। এটা এতই সহজবোধ্য যে আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। গৌড়পাদ সমস্ত বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের শিক্ষা ও চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করে বলেন যে এই তত্ত্বগুলি হলো চরম সত্যেরই প্রকাশ যা ইতিপূর্বেই উপনিষদ তুলে ধরেছিল।

বৌদ্ধ চিন্তাবিদগণ বিশেষ করে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু-পরবর্তী গৌড়পাদই ভাববাদ দর্শনের বিকাশে উল্লেখযোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর

রেখেছেন একথা অনস্বীকার্য। মাণ্ডূক্য কারিকাই হলো গৌড়পাদের শ্রেষ্ঠ অবদান অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এই কারিকা মূল চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ হলো আগম যেখানে গৌড়পাদ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন উপনিষদোক্ত বাস্তব তত্ত্বের ভূমিকা। মাণ্ডূক্য উপনিষদের মতোই গৌড়পাদ তাঁর মাণ্ডূক্যকারিকার প্রথমেই আত্মার যে তিনটি বিভিন্ন প্রকাশ তা ব্যক্ত করেছেন। আত্মার তিন প্রকার অবস্থা বর্তমান—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আর এই তিন প্রকার অবস্থাই শেষতম প্রকাশ তুরীয়র অন্তর্গত।

জাগ্রত অবস্থায় আত্মাই হলো জাগতিক বস্তুরাজির জ্ঞাতা। এখানে আত্মা সম্পূর্ণরূপে দেহ-নির্ভরশীল। এই আত্মা বিশ্ব বা বৈশ্বানর নামে পরিচিত। দ্বিতীয় হলো আত্মার স্বপ্নাবস্থা। এখানে আত্মা স্বপ্নে দেখা বস্তুরাজির সঙ্গে জাগতিক বস্তুরাজির আপাত মিল উপলব্ধি করে। এটা জাগ্রত অবস্থার থেকে একটি ভিন্ন জগতের উপলব্ধি। এখানে আত্মা দেহের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিচরণ করতে পারে। একে তৈজস আত্মা বলে। সুষুপ্তি হলো আত্মার তৃতীয়াবস্থা। যেখানে না আছে স্বপ্ন না কোন জলন্ত ইচ্ছা যা আমরা সাধারণত দেখে থাকি। এই অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট জ্ঞান থাকে না। অর্থাৎ এখানে না থাকে দেহের কর্তৃত্ব না থাকে স্বপ্নাবস্থার কর্তৃত্ব। এ হলো শুদ্ধচৈতন্য বা প্রজ্ঞা, দিব্যানন্দ লাভের স্তর। আর শেষতম স্তর হলো, তুরীয় অতীন্দ্রিয় আত্মা। যার সঙ্গে পূর্বোক্ত তিনটি অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ প্রথম দুটি অর্থাৎ বিশ্ব অথবা তৈজস হলো কার্যকরণ সম্পর্কের অধীন। এমনকি তৃতীয় অবিদ্যার অধিকারী। কিন্তু চতুর্থ, অতীন্দ্রিয় সত্তার অধিকারী। এই আত্মা সকল কিছুরই ঊর্ধ্বে। এই আত্মা সর্বজ্ঞ, অদৃশ্য, অনির্বচনীয়, উপলব্ধির অগম্য, অচিন্তনীয় একমাত্র আত্মা (অদ্বৈত)। এই আত্মন্ই ব্রহ্মণ্, একমাত্র চরম সত্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায় হলো বৈতথ্য। এখানে গৌড়পাদ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন পূর্ণ অনস্তিত্বময় এই বস্তুজগৎ। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল কিছুই অসত্য, আভাসিক সত্তা। আর আভাসিক সত্তা কখনোই সত্য হতে পারে না। কারণ আভাসিক সত্তা মাত্রেরই শুরু ও শেষ আছে। আর

যার শুরু ও শেষ বর্তমান তা মিথ্যা। যেমন স্বপ্নাবস্থার দৃষ্ট বস্তুসকল কল্পনার সৃষ্টি তেমনই আভাসিক বস্তুজগৎও কল্পনার থেকে উৎপন্ন। ফলে স্বপ্নাবস্থার বস্তু ও বহির্জগতের বস্তু সকলই আত্মাসৃষ্ট। এইভাবে আভাসিক জগৎ সম্পূর্ণত দ্বৈত সত্তার দ্বারা দূষিত। দ্বৈত মাত্রই বহুর প্রকাশ। তাই মিথ্যা। কেবলমাত্র আলোকিত আত্মাই এই বহুর প্রকাশকে উপলব্ধি করতে পারে। এই একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই ব্রহ্মণ্।

তৃতীয় অধ্যায়ে গৌড়পাদ অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে আভাসিক সত্তার বহুধা প্রকাশ যে মিথ্যা প্রসূত তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে বৈচিত্র্যময় আভাসিক সত্তা ভ্রমাত্মক, কেননা মায়ার অধ্যাস-বশতঃই তা মনে হয়। জন্ম-মৃত্যু, পরিবর্তন এবং দুঃখ, কারণ-কার্য অবিদ্যা প্রসূত ভ্রমাত্মক উপলব্ধি। চরম সত্য এগুলি থেকে অনেক দূরে। এই চরম সত্যকে কোন কিছু প্রভাবিত করতে পারে না। এই চরম সত্য হলো পরমাত্মা। পরমাত্মা বা ব্রহ্মণ্ হলো স্বয়ম্ভূ, সর্বত্রচারী, সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ অধ্যায়ে গৌড়পাদ আত্মন্ই যে একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা তা প্রমাণ করার জন্য সর্বস্ব নিয়োগ করেছেন। সৃষ্টি কথাটাই আপাত সত্য, আত্মনের পরিপ্রেক্ষিত অসত্য, কেবল ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে তাৎপর্য মণ্ডিত মনে হয়। আত্মনের দিক থেকে কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না। যা আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় তা নিতান্তই মায়ার প্রভাবে। গৌড়পাদ তাকে প্রমাণ করেছেন জলন্ত লৌহদণ্ডের দৃষ্টান্তে। যখন লৌহদণ্ডটি দুই প্রান্তে জলতে থাকে তখন যদি ঘোরান যায় তাহলে মনে হবে যে জলন্ত চক্র ঘুরছে (অলাতচক্র)। অলাতচক্রের মতোই জাগতিক বস্তুরাজির অস্তিত্ব চেতনার উপর আরোপিত হয়। মায়ার অধ্যারোপ বশতঃই তা হয়। সাধারণ মানুষ এ সকল কিছুকে কল্পিত সম্বৃতি থেকেই সত্য ভাবে। কিন্তু পরমার্থ এ সকল কিছু থেকে দূরে থাকে। যদিও বৈচিত্র্যময় আভাসিক বস্তুজগৎ তারই মধ্যে থাকে। এক কথায় এই আভাসিক জগৎ পরমাত্মার থেকে যেমন পৃথক নয় তেমনি একও নয়। এই চতুর্থ পর্যায়কে বলা হয় অলাত শান্তি। এইভাবে গৌড়পাদ এই অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শঙ্কর ও তাঁর শারীরক ভাষ্য

গৌড়পাদ হ্রস্বতম উপনিষদকে বেছে নিলেন টীকা লেখার জন্য এই কারণেই মনে হয় যে তাঁর উপলব্ধ সত্য যাতে বেশী বেশী করে শ্রুতি ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল উপলব্ধ সত্যকে কি করে পূর্ণতা দেওয়া যায়। তিনি বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন বৌদ্ধ সত্য অনির্বচনীয় বিজ্ঞান ও শূন্যতার উপর যা উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বকেই সূচিত করে। আর এইভাবে তিনি বৌদ্ধ সত্যের মধ্য দিয়ে উপনিষদীয় ভাববাদেরই পুনরভ্যুত্থান ঘটান। যার জন্য তিনি মহাযান বৌদ্ধদর্শন থেকে উদ্ধৃতি দিতে কণামাত্র দ্বিধা করেন নি, কেবলমাত্র উপনিষদীয় ভাববাদকে পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু এই সত্য কতখানি যুক্তিযুক্ত ও উপনিষদীয়-ভাববাদ কতখানি সুরক্ষিত, তার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর প্রশিষ্য শঙ্করের উপর।

যদিও গৌড়পাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যায় নি, বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায় থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করতে এবং উপনিষদীয় আত্মনের সঙ্গে একীকরণ করতে ; কিন্তু শঙ্করের ক্ষেত্রে দেখা যায় বৌদ্ধদর্শন থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। তাঁর উদ্দেশ্য হলো প্রাচীন উপনিষদগুলির উপর ভিত্তি করেই অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যার ফলে আমরা দেখি তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেন বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রসূত ভূমিকা থেকে। কিন্তু এই বিদ্বেষ যে আত্মগত নয় তা বিভিন্ন পণ্ডিতগণের চোখে ধরা পড়েছে। চেরবাস্কির ভাষায়[৩৭] বলতে গেলে শঙ্করের অবস্থা বেশ চিত্তাকর্ষক। কারণ হৃদয়গত দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণতঃ মাধ্যমিক চিন্তার সঙ্গে একাত্ম। অন্তত মূল ভাবধারায়। যেমন চরম সত্য এক এবং অদ্বিতীয় এবং মরীচিকার মত বহুধা। অথচ শঙ্কর কখনো তা স্বীকার পান নি। তিনি মাধ্যমিকদের এমন ভাবে গ্রহণ করেছেন যেন তীব্র অবজ্ঞায়, কিন্তু চরম শূন্যতা ও ধারণাকে কখনোই অবজ্ঞা বা অস্বীকার করেন নি।

যে অর্থে তিনি অবজ্ঞা করেছেন তা হলো মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রমাণ অস্বীকার। মাধ্যমিক সম্প্রদায় জ্ঞানের উৎস হিসেবে যুক্তি পদ্ধতিকে তো স্বীকারই করে না। অথচ পরম আশ্চর্যের যে তাঁর সূত্রের প্রথমেই শঙ্কর দার্শনিক প্রজ্ঞা, পরমার্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই প্রমাণ ও যুক্তি

পদ্ধতির অসারতার কথা বলেই শুরু করেছেন। মাধ্যমিক দর্শন সম্প্রদায়ের মতোই শঙ্কর যুক্তিপ্রসূত সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অসারতা দেখিয়েছেন। যুক্তির অতীত প্রজ্ঞারই সাহায্যে পরমার্থসত্তার উপলব্ধি যে সম্ভব তা প্রমাণ করেছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে এই কথা স্বীকারও করেছেন। শঙ্কর তর্কবিদ্যার কর্তৃত্ব কোনভাবেই স্বীকার করতেন না বিশেষ করে চরম সত্যের উপলব্ধির ক্ষেত্রে, কেননা এই তর্কবিদ্যার জালেই শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে হয়। ফলে শঙ্কর যাই বলুন না কেন তিনি যে তাঁর বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহাযান বৌদ্ধদের উপর বহুলাংশে নির্ভর করেছেন একথা আজ বহুল স্বীকৃত। এমনকি ভারতীয় ভাবধারায় একথাও প্রচলিত আছে যে শঙ্কর হলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। যদিও একথা থেকে শঙ্করকে ভুল বোঝা উচিত হবে না। সংগত কারণেই শঙ্কর নির্ভর করেছেন মহাযান বৌদ্ধদের উপর কেননা মহাযান সম্প্রদায় তাঁদের মৌল পাঠক্রম মূল উপনিষদ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।. যেহেতু উপনিষদই মূল, শঙ্কর তাঁর সমস্ত মনোযোগ সংহত করেন প্রাচীন উপনিষদ গুলির উপর।

শঙ্করই প্রাচীন উপনিষদ তন্ন তন্ন পর্যালোচনা করে মূল তেরটি উপনিষদ শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করেন। আর এই মূল তেরটি উপনিষদকে সূত্রে গেঁথে পার্থক্যগুলিকে মিলিয়ে জুলিয়ে বেদান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। রাধাকৃষ্ণণ[৭০] বেশ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে শঙ্করের দর্শনকে চলমান স্রোত বা পুনর্ব্যাখ্যা বা প্রাচীন শিক্ষার সঙ্গে সংযোজন ইত্যাদি এমন কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসা বেশ কষ্টকর। কেননা আমরা প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের কোন পার্থক্য সূচিত করতে পারিনা, কারণ নবীনের মধ্যেই প্রাচীনের সমাবেশ এবং প্রাচীনের মধ্যেই নবীনের উঁকি ঝুঁকি।

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে কেরালার অন্তর্গত মালাবর অঞ্চলে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দের নিকট বেদান্ত তত্ত্ব আয়ত্ত করে অত্যন্ত অল্প বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নানা স্থানে বহু মনীষীগণের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের মতের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি হিন্দুধর্মের পূজার্চনার গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে পৌরাণিক ধর্মের সংস্কার মুক্তি ঘটিয়ে ভাববাদী ধারায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর অকাল

প্রয়াণ ঘটে। তিনি সঠিক কতখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন এ বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক প্রচলিত।[71] তবে তিনি যে ব্রহ্মসূত্র, ভাগবতগীতা ও উপনিষদের উপর টীকা লিখেছেন তা সর্বজন-স্বীকৃত। ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁর লিখিত যে টীকা তাকেই শারীরক ভাষ্য বলা হয়। এখানে কুৎসীৎ শরীর বাসী হলেন আত্মা ; যার তত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে বলে এর নাম শারীরক ভাষ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি উপনিষদ সমূহে কালে কালে নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটায় একই বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। নানাজন নানাভাবে এই উপনিষদগুলিকে ভিত্তি করে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে একটি যুক্তিসংবদ্ধ দর্শনে গড়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র এক্ষেত্রে অন্যতম। উপনিষদের মূল বক্তব্যকেই বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বাদরায়ণের বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য সূত্রটিকে ধরার প্রয়াস যে সকল সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তা এত সংক্ষিপ্ত যে সব সময় তার নিহিত অর্থ বুঝে ওঠা কঠিন। এই গ্রন্থে মোট পাঁচশ পঞ্চান্নটি সূত্র বর্তমান। প্রতিটি সূত্র আবার দুটি কি তিনটি শব্দে রচিত। ফলে সূত্রগুলি দুর্বোধ্য, কখনো কখনো দ্ব্যর্থবোধক।

বাদরায়ণের বেদান্ত সূত্রের চারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন উপনিষদের বিরুদ্ধ শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত উপনিষদীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী মতবাদের আলোচনা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিরাকরণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের উপায় মুক্তি সাধন রয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে বহ্ম বিদ্যায় সাধনলব্ধ ফল আলোচিত হয়েছে।

শঙ্কর বিভিন্ন ভাষ্যকারের মতোই বাদরায়ণের এই বেদান্তসূত্রের সীমা-বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ের মতো বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে বেদান্ত সূত্রকে কেন্দ্র করেই। ভাববাদের যথাযথ প্রতিষ্ঠায় একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ই আমাদের আলোচনার বিষয়।

শঙ্করের নামের সঙ্গে অদ্বৈতবাদ জড়িত হলে কি হবে এই মতবাদের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হলো গৌড়পাদ কারিকা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই কারিকার মূল কাজ মাণ্ডূক্য উপনিষদের মূল বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ। অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যই কারিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শঙ্কর গৌড়পাদের শিক্ষার আলোতেই তাঁর শারীরক ভাষ্য রচনা করেন।

মূলতঃ বেদ, উপনিষদ, বেদান্তসূত্র, গৌড়পাদ কারিকার কাছে শঙ্কর দায়বদ্ধ হলেও তাঁর অদ্বৈতবেদান্ত পূর্বসূরীদের বক্তব্যের চর্বিত চর্বণ বা পুনরাবৃত্তি নয়। শঙ্করের অসামান্য প্রতিভায় বিচ্ছিন্ন ভাববাদী চিন্তা এক অনবদ্য সুসংহত দর্শনে পরিণত হয়। আর এই কাজে শঙ্কর কোনভাবেই ছুঁৎমার্গী ছিলেন না। পূর্বাপর ও সমকালীন স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকল চিন্তার থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য গ্রহণ করেছেন। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসামান্য প্রতিভা। তাই শারীরক ভাষ্য রচনা হিসেবে পরম উৎকর্ষে মণ্ডিত ও অব্যর্থ যুক্তিসমূহে পরিপূর্ণ। তাই শঙ্করভাষ্য সমধিক জনচিত্ত জয়ী হয়েছে।

এই শারীরক ভাষ্যও চারটি অধ্যায় বা পাদে বিভক্ত। এখানে তিনি অদ্বৈতবাদের মূলসূত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। আর স্পষ্টই নির্দেশ করেছেন যে সমগ্র উপনিষদের পরমব্রহ্মের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব। প্রথমেই শঙ্কর দেখিয়েছেন সাধারণ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, বিশেষ করে চরম সত্য অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যবহারিক দিক থেকে জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করলেও শঙ্কর কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে সেই জ্ঞানকেই আবার স্বীকার করেছেন।

আর তা করতে গিয়ে শঙ্কর জাগতিক বন্ধনমুক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য বা মুক্ত আত্মাই একমাত্র সত্য ও চরম সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। প্রারম্ভের দিক থেকে এই চরম সত্তাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। কেননা কেবলমাত্র মুক্ত বুদ্ধ আত্মাই সকল দিক থেকে নিশ্চয়তা দিতে পারে। এই আত্মন্ ই হলো একমাত্র উৎস যেখান থেকে সকল কিছুই এসেছে। কেউই এই আত্মন্ কে অস্বীকার করতে পারে না, কেননা আত্মন্ কে অস্বীকার করার অর্থ নিজেকেই অস্বীকার করা। একমাত্র চৈতন্য বা আত্মাই সন্দেহাতীত নিত্য স্থিতিশীল পদার্থ। এর অভাব কখনোই প্রমাণ করা যায় না, যাবে না। আত্মন্ ই পারমার্থিক সত্য। এই যে বৈচিত্র্যময় বস্তুরাজি, আত্মন্ ব্যতিরেকে তাদের আলাদা কোন অস্তিত্বই নেই। এক এবং অদ্বিতীয় অনন্ত এবং

শাশ্বত চৈতন্যই ব্যবহারিক চৈতন্যকে তৃতীয় মার্গে পরিবর্তিত করে। কেননা ব্যবহারিক চৈতন্য ভোক্তা, কর্তা হিসেবে অবিদ্যা বা অধ্যাসের শর্তাধীন। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর তিন প্রকার সত্যের কথা বলেছেন প্রাতিভাসিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য।

বৈধজ্ঞানের প্রসঙ্গে শঙ্কর মনে করেন যে শ্রুতিই বৈধ জ্ঞানের একমাত্র উৎস। আর এই শ্রুতি ব্যতিরেকে পূর্ণ জ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়। শ্রুতি সম্পর্কিত সাক্ষাৎ জ্ঞানই সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা অনুভবে পেঁছে দেয়। এই উপলব্ধিতে বিষয় ও বিষয়ীর কোন পার্থক্য থাকে না। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ এইভাবে তার সর্বোচ্চ আকার পায়।

শঙ্কর তাঁর ভাষ্য 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' দিয়ে শুরু করেছেন। ব্রহ্ম সম্পর্কিত প্রশ্নই সমস্ত কিছুর মূল। এই চরমসত্তা হলো মুক্ত বুদ্ধ আত্মা। এই আত্মাই কেবলমাত্র শাশ্বত জ্ঞান দান করার নিশ্চয়তা দিতে পারে। শঙ্কর এরপর ভারতীয় দর্শনে পরস্পর বিরোধী আত্মা সম্পর্কিত ধারণাগুলির যেমন আত্মা কখনো গুণী, কখনো কর্তা, কখনো প্রবাহ ইত্যাদি নিরাকরণ করেছেন। সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাও ঠিক নয়। কারণ জীবাত্মা দেহসর্বস্ব হয়ে গুণ এবং দোষ ইত্যাদি শর্তের আবর্তে অধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু একবার মুক্ত হলে তা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। মুক্ত বুদ্ধ আত্মাই সত্য ও অসত্যের পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তখনই পূর্ণ জ্ঞান হয়। কিন্তু জীবাত্মা অবিদ্যা ও মায়া প্রভাবে জগতের বহুধা রূপ সত্যরূপে দেখে। ব্যবহারিক সত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু এই জীবাত্মার মধ্যে যখন এইসব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আত্যন্তিক প্রয়াস দেখা যায় এবং যখন জীবাত্মা ধ্যান-নিদিধ্যাসন-ধারণা ইত্যাদির মাধ্যমে জাগতিক ইচ্ছা থেকে বেরিয়ে আসে তখনই মুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর চার প্রকার অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ-শমদমাদি-সাধন-সম্পৎ এবং মুমুক্ষুত্ব। এই চার প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়েই একজন ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তরে পেঁছোয়।

এই উপলব্ধিই হলো সাক্ষাৎ জ্ঞান। জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর এবার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ তিনপ্রকার পদ্ধতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভাষ্যের

কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। অবশ্য প্রত্যক্ষকে প্রমাণ জ্যেষ্ঠ ও তার থেকেই অনুমান আসে এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করেছেন যে উভয়েই সর্বতোভাবে অবিদ্যার দিকে পরিচালিত করে। ফলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করা যায় না। কেননা উভয়েই ভ্রম জ্ঞান দেয়। এরপর শঙ্কর উদাহরণ সহ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কিভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমান বঞ্চনা করে (শুক্তি-রজতভ্রম,, রজ্জু-সর্পভ্রম ইত্যাদি)। এবার জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে পরস্পর বিরোধী মতবাদ বিশেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদ খণ্ডন করেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমানকে কার্যত উপেক্ষা করলেও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকে কখনোই বাতিল করেন নি শঙ্কর। এই স্ববিরোধিতা প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বান ডঃ রাধাকৃষ্ণণ[৭২] বলেছেন যে অদ্বৈত বেদান্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত মতবাদ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অপরিণত, যদিও অধিবিদ্যক অন্তপ্রত্যক্ষের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। এইরূপে শঙ্কর বিশ্বাসকেই সৎজ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে শ্রুতি শাস্ত্রের বিশ্বাস। কারণ শাস্ত্র হিসেবে বেদ-উপনিষদই হলো চিরন্তন উৎস। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ব্যতিরেকে পূর্ণ জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব। শঙ্কর একেই **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ** বলে অভিহিত করেছেন। তাই সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা অনুভবই হলো একমাত্র জ্ঞানের উৎস। সেখানে বিষয় ও বিষয়ীর কোন পার্থক্য নেই। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পরমাত্মার উপলব্ধি সম্ভব হয়।

শঙ্কর পরে বেদান্তসূত্রের ২য় অধ্যায় ২য় পাদ এ জগৎ বৈচিত্র্য মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে পরমাণুবাদ খণ্ডন করেছেন। বৈশেষিক সম্প্রদায় পদার্থের বিভিন্ন বিভাগ স্বীকার করেছেন। আর সেগুলি হলো বস্তুগত অথচ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল নয়। শঙ্কর এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন কখনো কি পদার্থগুলির একই সময়ে পৃথক অবস্থান ও একাত্মতা সম্ভব? যুক্তিপদ্ধতিগত দিক থেকে তা সম্পূর্ণতই অসম্ভব।

শঙ্কর প্রশ্ন তুলেছেন বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের সমর্থনে বলেন যে বস্তুপুঞ্জ যেমন মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু পরস্পরের সংমিশ্রণে এই বস্তুগত পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। শঙ্কর এর প্রশ্ন সংমিশ্রণের জন্য প্রয়োজন কর্ম। কর্মের জন্য কর্মকর্তার। আর সেই কর্মকর্তা যদি অদৃষ্টই হয় তাহলে তার

অবস্থান কোথায়? আত্মায় না পরমাণুতে? যদি উভয়তই হয়, বা পৃথক ভাবে কোনটাতে? দুটোই অসম্ভব। আবার যদি বলা যায় পরমাণু বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে পদার্থ সৃষ্টি করে তাহলে শেষ পর্যন্ত অনবস্থাদোষে দুষ্ট হবে যা যুক্তিবিদ্যার দিক থেকে অযৌক্তিক। আবার যদি বলা যায় পরমাণুগুলি গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদি গুণের সমন্বয় তাহলে তার আকার বর্তমান। আর যেহেতু আকার সর্বস্ব তার হ্রাসবৃদ্ধি আছে যা কোনভাবেই স্বীকার করা যায় না। এইভাবে শঙ্কর দেখিয়েছেন যে—**উভয়তঃ চ দোষাৎ**। ফলে বৈশেষিকদের সিদ্ধান্ত যে পরমাণু বস্তুতাত্ত্বিক তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তেমনই শঙ্কর আবার সাংখ্য তত্ত্ব প্রধানই যে পৃথিবীর আদি কারণ তার সমালোচনা করেছেন। সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পুরুষের প্রভাবে এই বস্তু-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এর তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, অচেতন প্রকৃতি কি করে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে—**রচনানুপত্তেশ্চ নানুমানম্**। জ্ঞানশক্তিরহিত হয়ে প্রকৃতির পক্ষে কখনোই বস্তুজগতের কারণ হওয়া সম্ভব নয়। আবার সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী আপাত নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হলে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। এইভাবে শঙ্কর দেখিয়েছেন বস্তুজগতের সৃষ্টকর্তা না প্রকৃতি, না পুরুষ, না পরমাণু। কারণ সব গুলিই স্ববিরোধী, কেবলমাত্র বিরোধমুক্ত ব্রহ্মণই হলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

শঙ্কর জৈন দর্শনের স্যাদ্‌বাদ বা সপ্ত পদার্থ, যথা জীব, অজীব, অস্রব, সম্বর, নির্জর, বন্ধ এবং মোক্ষ, খণ্ডন করেছেন। সবগুলিই আবার জীব ও অজীবের ছত্রছায়ায় ঘটে থাকে। জৈন দর্শন অনুযায়ী পাঁচটি অস্তিকায় বর্তমান যেমন আত্মা পুদ্‌গল, গুণ, দোষ, আকাশ। অস্তিকায় প্রসঙ্গে জৈন দর্শন সপ্তভঙ্গী ন্যায় ব্যাখ্যা করেছেন। একের মধ্যে বহু গুণের সমাবেশ। তা হলো স্যাৎ-অস্তি, স্যাৎ নাস্তি, স্যাৎ অবক্তব্য, স্যাৎ অস্তি-নাস্তি, স্যাৎ অস্তি অবক্তব্য, স্যাৎ অস্তি-নাস্তি অবক্তব্য ইত্যাদি। শঙ্কর জৈন মতবাদের সমালোচনা করে বলেছেন স্ববিরোধী দুই গুণের একত্র সমন্বয় কি করে সম্ভব। তাছাড়া জীব ও অজীব অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার একই প্রকার কি করেই বা সম্ভব। অনন্ত আত্মা কখনো সীমিত শরীরে থাকতে পারে না। কারণ শরীরের আকার বিভিন্ন প্রকার হয় যেমন পিঁপড়ে থেকে শুরু

করে অতিকায় হাতি পর্যন্ত। শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মার পরিবর্তনের কথা জৈন দর্শন স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন যে আত্মা স্থির। শঙ্করের মতে এই যুক্তি স্ববিরোধিতাপূর্ণ। অতএব জৈন দর্শন গ্রহণ যোগ্য হতেই পারে না।

শঙ্কর একই সঙ্গে সর্বাস্তিবাদিগণের মতবাদও বাতিল করেছেন। কারণ সর্বাস্তিবাদী দর্শন প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই জগৎ চারটি ভূত পদার্থ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুর সমন্বয়ের ফল। এমনকি সর্বাস্তিবাদিগণ-এর মতে কর্তা-জ্ঞাতা, ভোক্তা-হিসেবে আত্মার মতো কোন স্থায়ী সত্তা নেই। শঙ্কর পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে যেমন যুক্তি দেখিয়েছিলেন তেমনই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন একজন কর্মকর্তা ভিন্ন অচেতন জড়ের মিলন অসম্ভব। প্রতীত্যসমুৎপাদ শঙ্করের মতে অসম্পূর্ণ তত্ত্ব কার্যকারণ তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। প্রতীত্যসমুৎপাদ ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যার বদলে উপুর্যপুরি কেবল অজ্ঞানই উপহার দেবে। আর ক্ষণিকবাদ তো কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। স্থায়ী আত্মা ভিন্ন এসবের ব্যাখ্যা কি ভাবে সম্ভব?

শঙ্কর বিজ্ঞানবাদকেও খণ্ডন করেছেন। বিজ্ঞানবাদের মতে বিজ্ঞান বা চিত্ত বা চেতনাই একমাত্র সত্তা। বস্তুজগতের এই বিজ্ঞান, চেতনা ভিন্ন কোথাও তার অবস্থান নেই। এমনকি স্বপ্নে যেখানে কোন বস্তুর অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই সেখানেও জ্ঞান বিদ্যমান। এভাবে বিজ্ঞানবাদী কোন না কোন ভাবে বস্তুজগতের বাহ্যিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। জ্ঞান বা চেতনা যখন স্বীকৃত তখন বস্তুজগতকে অস্বীকার করার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে শঙ্কর উপলব্ধি করতে পারেন না। তাছাড়া স্বপ্নাবস্থার প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত অবস্থার প্রত্যেক্ষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। স্বপ্নাবস্থার প্রত্যক্ষ জাগ্রত অবস্থার স্মৃতি ভিন্ন কিছুই নয়। অতএব বিজ্ঞানবাদও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অনুরূপ শূন্যবাদও পরিত্যাজ্য। কেননা শূন্যবাদ অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করে না। জগতের অনস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে হলে কোথায় জগৎ নেই তা নিশ্চয় করে বলা দরকার। শূন্যবাদীগণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। ব্রহ্মে জগৎ যেমন নিষিদ্ধ তেমন ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা হলেও স্বপ্নের মত অলীক নয়।

এইভাবে শঙ্কর সকল সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি খণ্ডন করে তাঁর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম জিজ্ঞাসা আত্মন্ দিয়েই শুরু করেন। কারণ আত্মন্ই হলো একমাত্র স্বপ্রমাণ। সকল প্রকার প্রমাণের উর্দ্ধে, স্বপ্রকাশ, বিভু, অনির্বচনীয়, অনন্ত এই আত্মন্ই ব্রহ্মণ্ একমাত্র অতীন্দ্রিয় সত্তা।

এই আত্মন্ই জীবের মধ্যে বর্তমান, কিন্তু জীবের সঙ্গে এক নয়, কারণ জীব ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সীমিত ও অবিদ্যা প্রভাবিত। জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা হিসেবে কর্মের অধীন। এই আত্মনের তুলনায় জীব অসত্তা। আত্মন্ও জীবের একাত্মানুভূতিই হলো ব্রহ্মণের প্রকাশ। জীবের মুক্তি ব্রহ্মণের সঙ্গে একাত্মতা। ব্রহ্মণ্ই একমাত্র পারমার্থিক সত্য। সকল কিছুই ব্রহ্মণ্-নির্ভর, সেখান থেকে আসে আবার সেখানেই ফিরে যায়। এক এবং অদ্বিতীয় এই ব্রহ্মণ্‌কে ব্যাখ্যা করা যায় না, সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অনির্বচনীয় সর্ববাদীশুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্মণ্।

শঙ্কর এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর নস্যাৎ করেছেন। যদি ঈশ্বর থাকতেন তাহলে অন্যান্য বস্তুর মত তাঁরও অবস্থান থাকতো। শঙ্কর উপনিষদ উক্ত ঈশ্বর ব্যাখ্যাকে কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশেষ করে জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের কেবলমাত্র ব্যবহারিক অস্তিত্ব শঙ্কর স্বীকার করেছেন। শঙ্করের মতে ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎ সত্য। ফলে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ অনুসন্ধান নিতান্তই স্বাভাবিক। শুদ্ধ ব্রহ্ম এই জগতের কারণ হতে পারে না। এই জগতের কারণরূপে যে মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম কল্পিত হয় তাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর ব্যবহারিক ভাবেই সত্য। এই ব্যবহারিক ঈশ্বর মিথ্যা, কিন্তু অলীক নয়। শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য এই ঈশ্বর স্বীকার একান্ত অপরিহার্য। মায়ার সাহায্যে ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা। ব্রহ্মণই মায়ার বন্ধনে ঈশ্বরের রূপে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম মায়াবী নন স্রষ্টাও নন। জীব মায়াবশে প্রথমে জগতকে সত্য বলে মনে করে এবং জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করে ঈশ্বর আরাধনা করে। অবশ্য এভাবে জীব নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তরে পৌঁছায়। ঈশ্বরের উপাসনা করলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধ চিত্ত সাধককে ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত করে। পরম ব্রহ্মের সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে জীব মুক্ত হয়, যখন উপলব্ধি করে আমিই সেই ব্রহ্ম।

এইভাবে শঙ্কর চরম ভাববাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ব্রহ্মন্ বা আত্মণ্ই একমাত্র সত্য। এই চরম সত্যের উপলব্ধি হলো ব্যক্তির একমাত্র সার্বিক লক্ষ্য। শঙ্কর চার প্রকার অবস্থার কথা বলেছেন যাতে জীবাত্মা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রহ্মলাভ করে। এই কথাই মহাঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদে বলেছেন। এইভাবে যে ভাববাদের শুরু হয়েছিল উপনিষদে অদ্বৈত বেদান্তে এসে চরম ভাববাদের চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

পরবর্তী অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনও পরবর্তীকালে বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যার সম্মুখীন হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে উপনিষদের মূল বক্তব্য প্রকাশই বাদরায়ণের বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র রচনার উদ্দেশ্য হলেও তা এমনই সংক্ষিপ্ত যে তার নিহিত অর্থ বোঝা বেশ মুশকিল। তার ফলে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয়[৭৪]। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক ইত্যাদি অনেকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। এদের ভাষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত ভাষ্যর উপর ভাষ্য ও টীকা টিপ্পনিরও পরিমাণও অনন্ত। যার ফলে বিপুল আকার বেদান্ত সাহিত্যের পরিচয় আমরা পাই।

যদিও অদ্বৈত বেদান্তের পরবর্তী সম্প্রদায়কে মূল দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত। বিশেষ করে জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নিয়েই আসল মতভেদ। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক অংশ ও অংশীর সম্পর্ক, একে বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। রামানুজ এর প্রতিষ্ঠাতা। অদ্বৈত বেদান্তের আচার্য শঙ্কর বলেন জীব ও ব্রহ্ম একান্ত অভিন্ন। এর নাম অদ্বৈতবাদ, পূর্বেই বিশদ আলোচিত হয়েছে। এইসব বিভিন্নমুখী ধারার সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে উপনিষদ বেদান্তদর্শনের ভিত্তি হলেও একমাত্র ভিত্তি নয়। উপনিষদ, ভগবৎগীতা ও ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। এরা শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান এবং ন্যায় প্রস্থান নামে পরিচিত। এই প্রস্থানত্রয়ই বেদান্তদর্শনের মূল ভিত্তি।

এই বেদান্ত দর্শনে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ নিয়ে বিভিন্ন উপলব্ধিই বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কারণ। এখানে তাদের যথাযথ

পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু যে কজন শিষ্য তাঁদের ব্যক্তিগত অবদান অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারা গড়ে তুলেছেন তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করলাম। আবার কোন সময় ভাববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনার সময় বা ভাববাদ খণ্ডনের প্রাক্‌কালে যদি কোনভাবে প্রয়োজন হয় তো তা তুলে ধরতে পারি। কেননা এইসব খ্যাতিমান শিষ্যগণ যেমন ভাস্কর, যাদব প্রকাশ, রামানুজ, মাধব. শ্রীকণ্ঠ, নিম্বার্ক, শ্রীপতি, বল্লভ, শুক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বলদেব প্রমুখ কিন্তু সেশ্বর বেদান্তের দলে। অপরপক্ষে শঙ্কর হলেন চরম বৈদান্তিক। এই চরম অদ্বৈততত্ত্বই চরম ভাববাদ। চরম ভাববাদের পরিপ্রেক্ষিতে সেশ্বর বৈদান্তিকগণ অনেকখানি পশ্চাৎপদ। তাই এইসব বিভাগ নিয়ে অধিক সময় ব্যয় বর্তমান পর্যায়ে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

প্রয়োজন হলো শঙ্করপরবর্তী অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা। শঙ্করপরবর্তী অদ্বৈত দর্শনেও শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়ে ব্যাখ্যা ও প্রতি ব্যাখ্যায় জটিল রূপ ধারণ করে। শঙ্করপরবর্তী বিতর্ক উপস্থিত হয় শঙ্কর প্রণীত গ্রন্থ নিয়েই। সঠিকভাবে কটি গ্রন্থ শঙ্কর লিখেছেন তা জানা যায় না। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[৭৪] অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাছাড়া ব্যক্তি শঙ্করকে নিয়েই বিতর্ক বর্তমান। অনেকের মতে শঙ্কর ও শঙ্করাচার্য ভিন্ন ব্যক্তি। যাইহোক শঙ্কর ও অদ্বৈত বেদান্তকে ঘিরে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। যাঁরা নিজস্ব বোধ দিয়ে বিপক্ষীয় যুক্তি খণ্ডনে পটুতা দেখিয়েছেন। কিন্তু তার ফলে এই সকল পণ্ডিত কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। এখান থেকে এটুকু মনে করার কোন কারণ নেই যে এই সকল শিষ্য স্বম্প্রদায় ভাববাদ বিরোধীদের কোনভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁরা এমন কোন জায়গা রাখেন নি যাতে বিপক্ষীয়রা ভাববাদ বিধ্বংস করতে সুযোগ পায়। এই সকল শিষ্য সম্প্রদায় যথাক্রমে মণ্ডণ, সুরেশ্বর, বিশ্বরূপ, পদ্মপাদ, বাচস্পতি মিশ্র, সর্বজ্ঞতামুনি, আনন্দবোধ যতি, শ্রীহর্ষ, চিৎসুখ ইত্যাদি। কালের চক্রে সমসাময়িক যুক্তিখণ্ডন করতে গিয়ে শঙ্করের মূল পথ থেকে শিষ্যপ্রশিষ্য সম্প্রদায় অনেকখানি দূরে সরে এসেছেন। শঙ্কর সকল সময়ই তর্কবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ তাঁর খণ্ডন-

খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থে দ্বান্দ্বিকপদ্ধতির অবলম্বন করে বিপক্ষীয় মতবাদ নস্যাৎ করেছেন। চিৎসুখ শ্রীহর্ষকে অবলম্বন করেও শ্রীহর্ষকে ছাড়িয়ে যান বিশেষ করে ন্যায় বৈশেষিক পদার্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। তাঁর তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী গ্রন্থে শুধু যে শঙ্কর বেদান্তকে যুক্তিনিষ্ঠ আকারে পরিবেশন করেছেন তাই নয় অদ্বৈত সুরক্ষাও করেছেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় ভারতীয় দার্শনিক জগতের ইতিহাসে বিরাট শূন্যতা। তাই উভয় শিবিরেই নেমে আসে ঘোর নিস্তব্দতা। যদিও ভাববাদী চিন্তার ক্ষেত্রে ঢল নামলেও প্রতিপক্ষ শিবিরের স্থবিরতা সেই স্রোতকে গতানুগতিক প্রবাহে পর্যবসিত করে। এই পরবর্তী কয়েকশ বছরের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস নিতান্তই গতানুগতিক। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই সেই উপলব্ধি বর্তমান।

বৈদান্তিক ভাববাদ ও বৌদ্ধ ভাববাদের সমন্বয়ী সম্পর্ক

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদের অগ্রগতি সহজ সাবলীল পথে এগোতে পারে নি। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাববাদকেও কোন কোন সময় এগোতে হয়েছে নানান আঁক বাঁকের মধ্য দিয়ে। সুকৌশল পথ প্রস্তুতিতে ভারতীয় ভাববাদ বর্তমান চরম পর্যায়ে এসে পেঁাচেছে। পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ভাববাদকে প্রয়োজন অনুযায়ী নানান প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয়েছে। উপনিষদে যে ভাববাদ ভ্রূণাকারে ছিল চর্চা পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ দর্শন অবলম্বন করে তা বেদান্ত দর্শনে চরম পরিণতি লাভ করেছে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন অনিবার্যভাবে যা আলোচনার পরিসরে এসে পড়ে তা হলো বৌদ্ধ দর্শনের ভাববাদের সঙ্গে বৈদান্তিক ভাববাদের সমন্বয়ী সম্পর্ক। আধুনিক বিদ্বানগণ নানাভাবে এ বিষয়ের উপর গভীর আলোকপাত করেছেন। আমরা এখানে তঁাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলিকে পুনরায় তুলে ধরে পর্যালোচনা করব।

বৌদ্ধ পরবর্তী মহাযান দর্শন যে উপনিষদীয় ভাববাদেরই পুনরাবির্ভাব একথা উল্লেখ করে চেরবাস্কি লিখেছেন [৭৮] যে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি যে প্রাচীন বেদান্তই পুনর্বিন্যাস ও সাজ সজ্জায় বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ অবলম্বনে নতুন যুক্তিতে পুনরাবির্ভাব করে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও

অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন।[76] তাঁর মতে গৌড়পাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ অধ্যয়নে এই উপলব্ধিতে পৌঁছোন যে উভয় মতবাদই উপনিষদোক্ত চরম মতবাদেরই নামান্তর। তিনি স্পষ্ট ভাবেই লিখেছেন শঙ্কর ও তাঁর অনুগামীগণ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সমালোচনা বহুল পরিমাণে বৌদ্ধদর্শন থেকেই গ্রহণ করেছেন। অদ্বৈত দর্শনের ব্রহ্মণ্ নাগার্জুনের শূন্যের প্রায় অনুরূপ। এমনকি বিজ্ঞানবাদের কাছে শঙ্করের ঋণ কদাচিৎ অস্বীকার করা যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে শঙ্করের বিরুদ্ধে সমালোচনা যে তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তা বহুলাংশে সত্য। চিন্তাবিদ রাধাকৃষ্ণণও অনুরূপভাবে বলেছেন শঙ্করদর্শন বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের সমন্বয় যা আবার উপনিষদ্ নিঃসৃত চিরন্তন আত্মবাদের সংস্করণ মাত্র।

এই সকল প্রথিতযশা চিন্তাবিদগণ যদিও মহাযান বৌদ্ধ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের মধ্যে সমন্বয়ী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন তা সত্ত্বেও তাঁরা সতর্ক করেছেন এই বলে যে এখান থেকে একথা ধরে নেওয়া ভুল হবে মহাযান ভাববাদ ও বেদান্ত ভাববাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। শঙ্কর তাঁর সূত্রভাষ্য রচনায় পরিষ্কার স্বীকার করেছেন যে কারো কাছে তাঁর কোন প্রকার আনুগত্য থাকলে তা আছে বেদ-উপনিষদের কাছেই। শঙ্কর অন্য কারো অবদান যে শুধু অস্বীকার করেছেন তাই নয় স্পষ্ট ভাষায় শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কোন জায়গায় কোনভাবে কোন প্রকার নরম মনোভাব প্রকাশ করেন নি। এখান থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে তাদের মধ্যে সমন্বয়ী সম্পর্ক থাকে কি করে ? পূর্ব সিদ্ধান্তগুলির সার্থকতা কোথায় ?

উভয়ের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় এর উত্তর পাওয়া যাবে। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করেছেন তা নিতান্তই বাহ্যিক। যেমন বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মূল আক্রমণ এই কারণে যে বিজ্ঞানবাদ বাহ্যিক জগতকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। বিজ্ঞানবাদে এমন যুক্তিও বর্তমান যে বাহ্যিক জগতের সকল কিছুই চিন্তা বা ধারণা ভিন্ন কিছুই নয়। পারম্পর্য ও একাত্মতা প্রমাণ করে যে বস্তু ও তার জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। শঙ্কর কৌতুক মেশানো যুক্তিতে বলেছেন যদি বাহ্যিক জগতের বস্তুরাজির অস্তিত্বই না থাকে তবে চেতনায় তার অবভাস ঘটে কি করে।

বাহ্যিক জগতে যে বস্তুরাজি দেখি তার বাহ্যিক অস্তিত্ব বর্তমান। এই বিজ্ঞানবাদ কি করে অদ্বৈতবাদকে প্রভাবিত করবে? তাছাড়া শঙ্কর দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখিয়েছেন তা হলো বিজ্ঞানবাদের ঝোঁক ব্যক্তিগত ভাববাদের দিকেই। অবশ্য শঙ্কর একথা স্বীকার করেন যে বিজ্ঞানবাদিগণ আত্মার অস্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন একথা সত্য। কিন্তু আত্মার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে আত্মা হলো পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়া। যদি এই মতবাদ গ্রহণ করা যায় তাহলে স্মৃতি ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব? তাছাড়া বিজ্ঞানবাদিগণ সামান্য চেতনা ও ব্যক্তিচেতনার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। শঙ্কর এইভাবে বিজ্ঞানবাদকে পুরোপুরি নস্যাৎ করেন। শূন্যবাদকেও অনুরূপভাবে শঙ্কর নস্যাৎ করেছেন। শূন্যবাদ শূন্যকে একমাত্র চরম সত্তা রূপে চিহ্নিত করায় আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। আত্মন্ই প্রথম এবং শেষ চূড়ান্ত সত্তা রূপে চিহ্নিত। এই শূন্য-বাদের দ্বারা শঙ্কর কি করে প্রভাবিত হবেন। এইভাবে শঙ্কর আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন তাঁর মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যুক্তি সম্পূর্ণতঃ ভ্রান্তিপ্রসূত।

কিন্তু শঙ্করের এই যুক্তি আধুনিক বিদ্বানগণ সর্বাংশে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা স্পষ্টই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শঙ্করের পক্ষ থেকে এইসব যুক্তি দেখান সত্ত্বেও মহাযান ভাববাদ ও বেদান্ত ভাববাদের যে সমন্বয়ী সম্পর্ক বর্তমান তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁদের মতে গৌড়পাদ স্পষ্টতঃই স্বীকার করেছেন যে শূন্যবাদও বিজ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন করে তিনি বেদান্ত তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত লিখেছেন[77] এখানে কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন গৌড়পাদ নিজেই একজন বৌদ্ধ ছিলেন এবং মাধ্যমিক কারিকার উপর টীকা লিখেছেন কারণ তিনি মনে করতেন যে বৌদ্ধ মতবাদ উপনিষদোক্ত মতবাদের ভিন্নরূপ। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের[78] মতে গৌড়পাদ কেন, এমন কি শঙ্করও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন বৌদ্ধ দর্শন চিন্তার জগতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যেখান থেকে কোন চিন্তাই এড়িয়ে থাকতে পারতো না। ফলে এই বৌদ্ধদর্শন নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় শঙ্করের মনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। আমরা আধুনিক বিদ্বানদের কথা যদি

উপেক্ষাও করি কিন্তু শঙ্কর অনুগামীদের নিশ্চয়ই উপেক্ষা করব না। বেদান্ত অনুগামী পরবর্তী পণ্ডিতগণের অধিকাংশই একটি কথাই প্রতিপাদ্য করে তুলেছেন যে শঙ্কর হলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। মায়াবাদ, সত্যতা, এমনকি মঠের ধারণা শঙ্কর বৌদ্ধদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শঙ্কর পারমার্থিক সত্য ও সম্বৃতি সত্যের ধারণার কাছে সম্পূর্ণতই ঋণী। অবশ্য শূন্যবাদের কাছ থেকে নেওয়া এই দুই সত্যের ধারণার উপর শঙ্কর নতুন কিছু করেছেন। তিনি সম্বৃতি সত্যকে দুভাবে ভাগ করে ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক নাম দিয়েছেন। এমন কি শঙ্করের মোক্ষতত্ত্ব বৌদ্ধ নির্বাণ তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় এক। শঙ্কর বৌদ্ধদের মত বৈদিক ক্রিয়াকর্মকে সমানভাবে নিন্দাবাদ করেছেন। আর পূর্বেই উল্লেখ করেছি চরম সত্তার তত্ত্ব তো মহাযান দর্শন থেকেই নেওয়া। আর তা করতে গিয়ে শঙ্কর নাগার্জুনের সূক্ষ্ম যুক্তি গ্রহণ করেছেন একথা অনস্বীকার্য। অতএব বৌদ্ধ মহাযানবাদ ও অদ্বৈতবেদান্ত-বাদ যে একাত্ম বলা বাহুল্য মাত্র। বরং একথা বলা যায় যে মহাযান ভাববাদ ব্যতিরেকে অদ্বৈতবেদান্ত ভাববাদ হলো মাংসহীন চর্ম এবং অদ্বৈত-বেদান্ত ভাববাদ ব্যতিরেকে মহাযান ভাববাদ চর্মহীন মাংস। একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ ও অসম্ভব। আমরা রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্য দিয়েই বর্তমান পরিচ্ছেদ শেষ করব।

একথা বলা হয় যে,[৭০] অস্বীকার করার উপায় নেই ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ-দর্শনের অপমৃত্যু ঘটায় ভ্রাতৃত্বমূলক সৌহার্দ্য দিয়ে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি কেমন করে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনেক বৌদ্ধ রীতিনীতি হজম করেছে, যেমন পশুবলিকে নিন্দা করে, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে গ্রহণ করে এবং এইভাবে বৌদ্ধ বিশ্বাসের যেগুলো ভালো সব কিছুকে অঙ্গীভূত করেছে।

ভাববাদের মূল বক্তব্য বিষয়ের সংহতকরণ

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আলোচনা করার পর এখন প্রয়োজন মূল বক্তব্য বিষয় সংহত করা ও তার সূত্ররেখা চিহ্নিত করা। কিন্তু তা করতে গেলে দুটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত ভাববাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আলোচনা করার সময় দেখেছি যুক্তি দেখাতে গিয়ে একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। এখন সেই বিভিন্নতাকে সংশ্লিষ্ট করে মানদণ্ড বা নিরিখ নির্বাচন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত এই সব যুক্তি পদ্ধতি আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সাম্প্রদায়িক কেন্দ্রিকতা। নিজ নিজ পরিভাষা সর্বস্ব এই সব স্বাতন্ত্র্যকে নৈর্ব্যক্তিক বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে যদি শ্রেণী-বদ্ধকরণ না করা যায় তো বিক্ষেপ ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাবে। আর তাতে যে মূল তাৎপর্য নিয়ে আমাদের অন্বেষা তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আলোচনার সময় দেখা গেছে যে সেই বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই একটি বিষয়ের উপর সমস্ত ভাববাদী সম্প্রদায় বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করেছে, তা হলো আত্মন্। সকলেই আত্মন্‌কে একমাত্র চেতন ও চরম সত্য বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের পারিভাষিক শব্দাবলী বিভিন্ন হতে পারে যেমন আত্মন্, শুদ্ধ চৈতন্য, অনির্বচনীয় পরম সত্য, সংহত শুদ্ধ চৈতন্য ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই চেতন কারণকেই বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁদের একমাত্র বক্তব্য বিষয়, সকল কিছুর ঊর্ধ্বে মানসলোক। সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন নঙর্থক দিক থেকে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো বস্তুরাজির স্ববিরোধিতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে। যা কিছু স্ববিরোধী তাই অসৎ। তাহলে স্ববিরোধিতাপূর্ণ বস্তুরাজি যদি অসৎ হয় তবে সকল কিছুর উৎস হিসেবে বস্তুকে কখনোই স্বীকার করা যায় না। তখন বস্তুর ধারণাকেও অযৌক্তিক হিসেবে নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে। আর বস্তু ধারণাই যদি স্ববিরোধী বলে পরিত্যজ্য ঘোষিত হয় তবে তারই অনিবার্য ফল হিসেবে সমগ্র বস্তুজগৎ—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৎ বলে উপলব্ধি

করার কোন দার্শনিক তাৎপর্য থাকে না। তাহলে চেতন-পদার্থই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উৎস একথা সহজেই প্রমাণিত হয়ে যায়। তার জন্য অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

ভাববাদী দার্শনিকগণের এই কাজ দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত প্রমাণকাণ্ড বা জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বিতীয়ত প্রমেয়কাণ্ড বা তত্ত্ববিদ্যা, পরাতত্ত্ব। ইংরাজী প্রতিশব্দ যথাক্রমে Epistemology ও Ontology। প্রমাণকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ভ্রম, প্রমাণ পরীক্ষা, প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ, সহোপলম্ভনিয়ম ইত্যাদি। আর প্রমেয়কাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যথাক্রমে কার্যকারণ তত্ত্বখণ্ডন, পদার্থবর্জন। এই পদার্থবর্জন অংশে খণ্ডন করা হয়েছে যথাক্রমে ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ। আর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পারমার্থিক সত্য। আমরা এবার এই মূল বিষয়গুলিকে তুলে ধরব।

প্রমাণকাণ্ড বা জ্ঞানতত্ত্ব

প্রমাণকাণ্ড বা জ্ঞানতত্ত্বে বিশেষভাবে আলোচিত হয় আমাদের জ্ঞান কিভাবে আসে। কি কি উপায়ের সাহায্যে আমরা সাধারণত জ্ঞানলাভ করে থাকি। প্রমাণ কথাটির মধ্যেই এর অর্থ নিহিত। প্রমাণ হলো প্রকৃষ্ট মান। মান কথাটির অর্থ এখানে জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞানকে বলা হয় প্রমা। প্রমার জনকই প্রমাণ। প্রমার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকগণের মতভেদ ঘটায় প্রমাণের স্বরূপ নিয়েও অনিবার্যভাবে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক একটি বিষয়ে একমত তা হলো প্রমা কথার অর্থ যথার্থ জ্ঞান। এই যথার্থ জ্ঞানের নির্ণয় প্রসঙ্গে দার্শনিকগণ মূলত দুভাগে বিভক্ত। একদল বস্তুবাদী আর একদল ভাববাদী। বর্তমান আমাদের লক্ষ্য ভাববাদ। তাই ভাববাদী দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই আমরা এখানে তুলে ধরব।

ভাববাদী দার্শনিকদের মতে অবাধিত ও অনধিগত বিষয়ের জ্ঞানই প্রমা। এই প্রমাজ্ঞানই একমাত্র সৎ বস্তু। অন্য সবই মিথ্যা। ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় বিরুদ্ধবাদী দার্শনিক প্রতিষ্ঠিত মতবাদ নিরাশ করেছেন। তারপর স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রথমেই যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব স্থাপন করেছেন তা হলো প্রণালী পরীক্ষণ। প্রণালী পরীক্ষণ কথাটির তাৎপর্য বুঝতে হলে পুনরায় প্রমাণ কথাটির অর্থ পরিষ্কার করা দরকার। প্রমাণ হলো যে প্রণালীতে বা উপায়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব প্রণালী পরীক্ষণ বলতে বোঝায় যে উপায়ে জ্ঞান লাভ করা যায় সেই উপায় বিশ্লেষণ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভাববাদী দার্শনিকগণ তাঁদের শুরু করেছেন নঙর্থক দিক থেকে। সেই কাজে তাঁরা প্রথমে ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার লক্ষণ বিশেষ পর্যালোচনা করেছেন। আমরা সেইভাবেই অগ্রসর হবো।

ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার লক্ষণ

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকগণের মূল প্রবণতা হলো একমাত্র আত্মন্ বা শুদ্ধ চৈতন্যর অস্তিত্ব প্রমাণ করা। ভাববাদী দার্শনিকগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়গত পরিভাষা অনুযায়ী আত্মন্‌কে কখনো শুদ্ধ চৈতন্য, কখনো শূন্যতা, কখনো বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। এ সবের মূল উদ্দেশ্য সাধারণের উপলব্ধিতে গৃহীত বাহ্য জগৎ নস্যাৎ করা। কারণ এই বিপরীত দৃষ্টান্ত উভয়ে একসঙ্গে কখনোই সত্য হতে পারে না। সাধারণের উপলব্ধির জগৎ প্রতিভাস ভিন্ন কিছু নয়। আর যা প্রতিভাস তা চরম সত্তার দাবী করতে পারে না। যেমন ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার ক্ষেত্রে হয়। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ভাববাদী দার্শনিকগণ ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার লক্ষণ পরীক্ষা করেন।

অবাধিত ও অনধিগত বিষয়ের জ্ঞানই প্রমা, অর্থাৎ সত্য জ্ঞান। ভাববাদী দার্শনিকগণের মতে আমরা সত্য মিথ্যা নির্ণয় করি চিন্তার দুটি মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন করে। তা হলো তাদাত্ম্য নিয়মও বিরোধবাধক নিয়ম। তাদাত্ম্য নিয়ম অনুযায়ী সৎ বস্তুর স্বরূপের কোন অন্যথা হয় না অর্থাৎ সৎ বস্তুর স্বরূপ কখনো কোন কিছুর দ্বারা বাধিত হয় না। আর বিরোধবাধক নিয়ম অনুযায়ী সৎ বস্তু কখনো সত্তা ও অসত্তার মত দুটি বিরুদ্ধ ভাবের আশ্রয় হতে পারে না। এই দুই নিয়মকে একত্রিত করলে দাঁড়ায়, যা একইভাবে অনুবর্তমান তাই সৎ বা সত্য। শঙ্করের মতে

সকল অবস্থায় যা অবাধিত তাই পারমার্থিক সত্য। সেই অনুযায়ী আত্মন্ বা ব্রহ্মন্ একমাত্র সত্য।

আত্মন্ বা ব্রহ্মন্ই যেহেতু একমাত্র সত্য তাহলে তার বিপরীতে সব কিছুই অসত্য ও অনস্তিত্বের পর্যায়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন তাহলে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগৎ, চারপাশের বস্তুরাজিকে যে সত্য বলে উপলব্ধি করি, তা আসলে কি? এ সম্পর্কে ভাববাদী দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অভিজ্ঞতালব্ধ সকল বস্তুরাজিই ভ্রমপূর্ণ, মিথ্যা। যেমন রজ্জু-সর্প-ভ্রম ও শুক্তি-রজত-ভ্রম ইত্যাদি। আমরা যখন দড়িতে সাপ দেখি তখন দড়িকে সত্যই সাপ বলে মনে করি। কিংবা ঝিনুককে রূপো বলে মনে করি তখন ঝিনুককে সেই সময় সত্যিই মনে করি রূপো। কিন্তু আসলে দড়ি বা ঝিনুক কোনটাই সাপ বা রূপো নয়। অথচ সেই সময় আমরা তাই বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু পরমুহূর্তে আমাদের সেই বিশ্বাস তিরোহিত হয়। আমাদের যে কোন অভিজ্ঞতাই ভ্রমের মত বঞ্চনাপূর্ণ। যেমন স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা। স্বপ্নে যখন আমরা হাতি বা অনুরূপ কোন কিছু বস্তু দেখি তখন তা সত্য বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু স্বপ্নাবস্থা থেকে জেগে উঠলে আমাদের পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়। ফলে কি জাগ্রত অবস্থায়, ভ্রমে, কি স্বপ্নাবস্থায় যে অভিজ্ঞতা পাই তা যে মিথ্যা সাধারণের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। অতএব বিস্তৃত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রশ্ন তাহলে অভিজ্ঞতায় যা ধরা দেয় সেগুলো কি? ভাববাদী দার্শনিকগণ একবাক্যে তার উত্তর দিয়েছেন অভিজ্ঞতায় যা কিছুই ধরা দেয় তা সম্পূর্ণতই মনের সৃষ্টি, মনসিজ। মনই যদি সকল কিছুর আশ্রয় হয় বস্তুজগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকে কোথায়? কেবলমাত্র আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে কি করে তাহলে কেউ দাবী করতে পারে যে বস্তুজগৎ অস্তিত্বশীল বা একান্ত সৎ।

এখন প্রশ্ন যে, তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা বস্তুজগৎ দেখি কেন? শুধু যে দেখি তা নয় ব্যবহারিক তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশ্বাস করি কেন? ভাববাদী সম্প্রদায় এর উত্তর বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা এখানে মৈত্রী উপনিষদের প্রসঙ্গ তুলে ধরতে পারি। মৈত্রী উপনিষদে এই বস্তুজগতকে

তুলনা করা হয়েছে[১] **ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্।** সকল প্রকার অভিজ্ঞতাই মিথ্যা দৃষ্ট। কেমন মিথ্যা, যেমন আমরা যাদুকরের খেলায় বা স্বপ্নে মিথ্যাবস্তু দেখি। এই মূল যুক্তিকে পরবর্তী সকল ভাববাদী সম্প্রদায়ই ভিত্তি করেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা মহাযান সম্প্রদায়ের একটি শ্লোক তুলে ধরতে পারি। মাধ্যমিক কারিকায় নাগার্জুন বলেছেন—[২]**যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্বনগরং যথা তথোৎপাদস্তথাস্থানং তথা ভঙ্গ উদাহৃতঃ।** এককথায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় বস্তুজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের যাদুকরের খেলা, স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু ও আকাশে গন্ধর্বনগর দর্শনের অভিজ্ঞতার তুলনা করতে হবে। ঠিক অনুরূপ বক্তব্য পাই আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্রে', বিজ্ঞানবাদের প্রাচীন শাস্ত্রে। সেখানে বলা হয়েছে[৪]— **যে বা পুনরন্যে মহামতে শ্রমণা ব্রাহ্মণ বা নিঃস্বভাবঘণালাতচক্র গন্ধর্বনগরানুৎপাদমায়ামরীচ্যুদকম্॥** এক কথায় বস্তুজগৎ সম্পূর্ণতই অনস্তিত্বশীল যেমন অলাতচক্র, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকা ইত্যাদি। অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় বিশেষ করে শঙ্কর স্পষ্টই চিহ্নিত করেছেন কেন আমরা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় বস্তুরাজিকে অস্তিত্বশীল রূপে দেখি এবং বিশ্বাস করি। এর মূল কারণ শঙ্করের মতে মায়া। তাই অদ্বৈত বেদান্তের অন্য নাম মায়াবাদ। এই মায়াবাদ অতি প্রাচীন। উপনিষদেই যে এর শুরু তা শ্লোক তুলে বৌদ্ধ মহাযান পরম্পরায় দেখিয়েছে। কিন্তু শঙ্করই মায়াবাদের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই মায়া বা অবিদ্যাই সকল প্রকার ভ্রান্তির কারণ। মায়া বা অবিদ্যার দুটি কাজ আবরণ ও বিক্ষেপ। মায়া একদিকে যেমন বস্তুর স্বরূপ আবৃত করে তেমনই অন্যদিকে অন্য একটি বস্তুকে প্রথম বস্তুতে বিক্ষেপ করে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। মায়ার জন্য দড়িতে দড়ির স্বরূপ আমাদের কাছে আবৃত থাকে। আর তখন দড়িতে সাপের বিক্ষেপ হয়। আমরা সাপ প্রত্যক্ষ করি। দড়িতে সাপের ভুল দেখার ক্ষেত্রে দড়ি আছে, সাপ নেই, দড়ি সাপের আকারে প্রতিভাত হয়। দড়িতে সাপের মিথ্যা বিশ্বাস জন্মে। শঙ্করের মতে এই জগত তেমনি রজ্জু-সর্পবৎ ভ্রম মাত্র। এই ভ্রমের কারণ মায়া। বিষয়ীর দিক থেকে যা অবিদ্যা, বিষয়ের দিক থেকে তা মায়া। অর্থাৎ যখন দড়িতে সাপ দেখি তখন তা অবিদ্যার জন্যই, আবার দড়ির দিক থেকে তা মায়ার জন্য। এই মায়া

কোন অভাব পদার্থ নয়, একান্তই ভাবরূপ। ব্রহ্মের দিক থেকে মায়া হলো ভান সৃষ্টি করার শক্তি। জগৎ মায়ার সৃষ্টি। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। যাদুকর যেমন ইন্দ্রজালের সাহায্যে একটা টাকা দশ টাকা করে দেখায় ঈশ্বরও তেমনি মায়াশক্তির দ্বারা এক ব্রহ্মের স্থলে বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করেন। যাদুকরের সৃষ্টি যেমন মিথ্যা, ব্রহ্মের অনেক আকার সৃষ্টিও ভেল্কিমাত্র, তার কোন সত্য অস্তিত্ব নেই। অতএব ব্রহ্মস্থানে জগৎ প্রত্যক্ষ হয় অবিদ্যা বা মায়ার জন্যই। যাদুকরের কাছে যেমন যাদুর ব্যাপারটি স্বচ্ছ তেমনি প্রাজ্ঞের নিকট মায়ার ভান পরিষ্কার। প্রাজ্ঞের কাছে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন সবই মিথ্যা। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার বস্তু অবিদ্যা বা মায়ামাত্র।

উপরের আলোচনা থেকে যা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তা হলো কোন কিছুর অভিজ্ঞতা বাস্তব জগতের অস্তিত্বকে সূচিত করে না। ভ্রমের, স্বপ্নেরও মায়া ইত্যাদির লক্ষণ ব্যাখ্যায় তা সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। অতএব অভিজ্ঞতায় যা ধরা দেয় তা কখনোই বাস্তব নয়।

শুধু শঙ্কর কেন শঙ্করঅনুগামী পণ্ডিতগণ পরবর্তী পর্যায়ে সমকালের বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ভাববাদ প্রতিষ্ঠায় ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার লক্ষণ বর্ণনায় কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। যেমন মহাযান ভাববাদ অনুগামী দিগ্‌নাগ, ধর্মকীর্ত্তি, ধর্মোত্তর, স্থিরমতি, তেমন অদ্বৈত ভাববাদ অনুগামী বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীহর্ষ এবং চিৎসুখাচার্যকে পাই। তাঁরা মূল সূত্র অনুসরণ করে নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে অভিনব মূল্যায়নে ভাববাদ টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করেছেন।

যেমন প্রাচ্যে উল্লিখিত দার্শনিকদের তেমনি পাশ্চাত্যদর্শনেও দার্শনিক বার্কলেকে পাই। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভাববাদ প্রতিষ্ঠায় অনুরূপ যুক্তি-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। বার্কলে বলেছেন যে স্বপ্নে, উন্মাদ বা অনুরূপ কোন অবস্থায় যা ঘটে তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে যে আমরা আমাদের ধারণার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হই। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের কোন ধারণারই জন্ম দেয় না। বার্কলে বস্তুর সত্তা অস্বীকার করেন না। তবে সত্তা বলতে শুধু প্রত্যক্ষ যোগ্যত্বই বোঝান বার্কলে। প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। এই প্রত্যক্ষ আসলে কি? যেমন যখন

আমরা টেবিল দেখি, আমরা কি টেবিল দেখি, না তার গুণাবলী রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বিস্তৃতি, আকার, গতি ইত্যাদি দেখি। এই গুণগুলো সবই মনের ধারণা। ফলে তথাকথিত বস্তুর অস্তিত্বের ব্যাপার যা দাঁড়ায় তা মনের ধারণার সমন্বয় বা সমষ্টি মাত্র। অতএব মন নিরপেক্ষ কোন বস্তুর অস্তিত্বই নেই। বার্কলের এই মত আমাদের প্রাচ্য দর্শনে বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অতএব কি প্রাচ্যে ও কি পাশ্চাত্যে প্রমাণ বিশ্লেষণে দার্শনিকরা মোটামুটি একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রমাণ পরীক্ষা

কেবলমাত্র ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার লক্ষণ বর্ণনায় বাস্তব জগতের অনস্তিত্ব নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত হয় না একথা ভাববাদী দার্শনিকগণ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতেন। তাই অনিবার্যভাবে বাস্তব জগতের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করার জন্য প্রমাণ পরীক্ষায় সর্বস্ব ক্ষমতা নিয়োগ করেন। ভ্রম, স্বপ্ন ও মায়ার লক্ষণে একথা প্রমাণিত যে বাহ্য জগতের যে জ্ঞান হয় বলে দাবী করা হয় তা মিথ্যা প্রসূত। এই সব জ্ঞানে বাহ্য বস্তু বলে কোন বিষয় নেই। যেমন ভ্রম ও স্বপ্নে যে জ্ঞান তা নির্বস্তুই। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান এবং স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান কি একই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য ? স্বপ্নাবস্থায় হাতি দেখার ঘটনা নিশ্চয়ই মানসিক, নির্বস্তু বস্তু বিষয় নয় একথা স্বীকার্য। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় হাতি দেখার ঘটনাকে কি স্বপ্নাবস্থার অর্থে বস্তু বিষয়ক নয় বলে বলা যাবে ? স্বপ্ন প্রত্যক্ষ বাধিত হয়, জাগ্রত প্রত্যক্ষের দ্বারা অর্থাৎ জাগ্রত প্রত্যয়ের দ্বারা বাধিত হয় বলেই জানা যায় যে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ মিথ্যা। কিন্তু জাগ্রত প্রত্যক্ষ তো সেই অর্থে মিথ্যা বলা যাবে না। জাগ্রত প্রত্যক্ষে দড়িতে সাপ দেখা কিংবা ঝিনুকে রূপো দেখা ভ্রমপূর্ণ নিশ্চয়ই, কিন্তু দড়িতে যখন দড়িই দেখি সেই জাগ্রত প্রত্যক্ষও কি ভ্রম প্রত্যক্ষের অনুরূপ ? অথবা দৈনন্দিন জীবনে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা প্রমাণগুলিকে শুধু কেবল বঞ্চনাকারী এটুকু বললেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তার জন্য প্রমাণ পরীক্ষা প্রয়োজন।

ভাববাদী দার্শনিকদের মতেও বৈধ জ্ঞান বলতে প্রমা। প্রমার জনকই প্রমাণ। প্রমার স্বরূপ নিয়ে মতভেদ ঘটায় প্রমাণের স্বরূপ নিয়েও বিতর্ক

বর্তমান। সাধারণ অর্থে যাকে বিষয়গত বৈধ জ্ঞান বলা হয় ভাববাদী দার্শনিকের ক্ষেত্রে তা বৈধ জ্ঞান নয়। আসলে এই অর্থে কোন বৈধ জ্ঞানই নেই। অবাধিত অনধিগত জ্ঞানই প্রমা। এইভাবে ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রমা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতের নস্যাৎ করেছেন। প্রমাণের চূড়ান্ত পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রমাণের কোন লক্ষণই নির্দোষ নয়। মূলত প্রমা জ্ঞান ত্রিবিধ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ। চূড়ান্ত পরীক্ষণে দেখা যাবে বৈধ জ্ঞানের এই সকল উৎসের কোনরূপ সত্যতা বা বৈধতা নেই। চূড়ান্ত পরীক্ষণের সময় ভাববাদী দার্শনিকগণ অধি-বাস্তব ও রহস্যোপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রমাণ বিধ্বংস করেছেন। তাঁদের মতে অবাধিত ও অনধিগত বিষয়ের উপলব্ধি কেবল জ্ঞাতার অনুভূতিতেই হয়। জ্ঞাতার অনুভবই তার জ্ঞানের একবিষয়কতা ও একত্বের জ্ঞাপক। এই উপলব্ধি কেবলমাত্র বিমুক্ত আত্মার ক্ষেত্রেই সম্ভব। বিমুক্ত আত্মার উপলব্ধিতে বাহ্য জগৎ স্বপ্ন-দৃষ্ট কোন বস্তুর মতই অলীক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার সমন্বয় সাধন করতেই ভাববাদের এই প্রমাণ বিধ্বংস। কারণ প্রমাণ নস্যাৎ না করতে পারলে চরম ভাববাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে না। অবশ্য এই প্রমাণ বিধ্বংস নিয়ে ভাববাদ অনুসারীদের মধ্যেও সংশয় বিতর্ক বর্তমান। পরবর্তী বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির ভাববাদের কাছে সম্পূর্ণ আনুগত্য থাকলেও তারা প্রমাণ নস্যাৎ না করে ভাববাদের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ প্রমাণকে কিছু পরিমাণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এই বিরল ব্যতিক্রম ভিন্ন সকল ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকই উপনিষদ থেকে শুরু করে ভাববাদের চরম বিকাশ পর্যন্ত প্রমাণ বিধ্বংসের ব্যাপারে কৃতসংকল্প থেকেছেন।

প্রমা জ্ঞানের উৎস বিবিধ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষই আবার জ্যেষ্ঠ প্রমাণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষই মূল উৎস যার উপর নির্ভর করে অনুমান দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান অসম্ভব। ভাববাদ বিরোধী সকল দর্শন সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করেছেন প্রত্যক্ষই বৈধজ্ঞানের উৎস। ন্যায়দর্শন স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যেষ্ঠ। প্রমাজ্ঞানে প্রত্যক্ষই প্রধান। অনুমান প্রত্যক্ষাশ্রয়ী। তাই ভাববাদী দার্শনিক বিশেষ জোর দিয়েছেন প্রত্যক্ষ খণ্ডনে। কারণ প্রত্যক্ষকে নস্যাৎ করা গেলে অনুমান

খণ্ডিত হয়ে থাকে।

উপনিষদীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর প্রমাণ বিতর্কের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছেন ঃ [4]**পরোক্ষপ্রিয়া হি এব দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ**। দেবতাগণ পরোক্ষ প্রিয়, প্রত্যক্ষের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপারে এইরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করে শুধু যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে পরিধির বাহিরে বের করেছেন তাই নয় অন্যান্য সকল প্রকার অভিজ্ঞতা যেমন তর্ক ও অনুমানের মাধ্যমে যা লাভ করা যায় তার বর্জনেও সমান নিন্দাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। প্রাচীন যুগে এই সকল অভিজ্ঞতাকে এককথায় তর্ক কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হত। কঠ উপনিষদে তাই এমনই এক বক্তব্য পাওয়া যায় : [5]**ন এষা তর্কেণ মতিঃ আপনেয়া**। তর্কের মাধ্যমে কখনো মতি বা মহাজ্ঞান লাভ হয় না। বাংলা ভাষায় প্রবাদের মত যে কথাটি প্রচলিত তা হলো : বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

এই উপনিষদীয় নির্দেশ সূক্ষ্ম যুক্তির আকারে গৃহীত হয়েছে নাগার্জুন দর্শনে। নাগার্জুন তাঁর পাণ্ডিত্যের সাহায্যে নিজস্ব বোধ বুদ্ধির জোরে নিজের ভাষায় প্রমাণ নস্যাৎ করেছেন ; যা ভাববাদী দর্শনের ইতিহাসে সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে খ্যাতিলাভ করেছে। তিনি শুধু সূক্ষ্ম যুক্তি পদ্ধতিতে বৈধ জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রতিপক্ষের প্রমাণ ধ্বংস করেছেন তাই নয় তার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থও রচনা করেছেন। আর শূন্যবাদের সপক্ষে বারংবার উক্ত যুক্তির উল্লেখ করে বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। এখানে আমরা প্রমাণের বৈধতা খণ্ডন বিষয়ে যে মূল যুক্তি তার কিছু কিছু উল্লেখ করতে পারি।

নাগার্জুন বাস্তববাদী মাত্রকে প্রশ্ন করেন[6], যদি তুমি বস্তুবাদী হও এবং সত্যি সত্যিই বিশ্বাস কর যে প্রমাণের সাহায্যে যে সকল বস্তুরাজির অভিজ্ঞতা পাও তা কার্যত সত্যি ও বাস্তব তবে প্রশ্ন জাগে যে সেই প্রমাণগুলি যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি যার উপর ভিত্তি করে বল যে অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তুগুলি সত্য ও বাস্তব তাদের সত্যতা ও বৈধতার জ্ঞাপক কি? অর্থাৎ কোন মাপকাঠিতে বিচার কর যে ঐ সকল প্রমাণ বা অভিজ্ঞতার উৎসগুলি বৈধ? যদি তোমার বিশ্বাসের সমর্থনে তাদের বৈধতার কোন প্রকার

নিশ্চিত মাপকাঠি দেখাতে না পারো তবে তোমার বিবেকের বিচার কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? আর যদি বিবেক যন্ত্রণায় দগ্ধ না হয়ে ঘোষণা কর প্রমাণের আবার প্রমাণ দরকার কি? তাহলে তোমাকে পুনরায় স্বীকার করতেই হয় জাগতিক সকল কিছুরই প্রমাণ হলো তার বৈধ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। আর তা না হলে বলতে হবে প্রমাণের উৎসগুলির বৈধতা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে। তাহলে তো চক্রক দোষ শেষ পর্যন্ত অনবস্থা দোষই উপহার দেবে।

একটু ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি বোধগম্য হবে। অভিজ্ঞতা লব্ধ সকল বস্তুর প্রত্যয়ের মাপকাঠি যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল হয় আর সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যদি সন্দেহের বিষয় হয় তাহলে যে কার্য সাধনের জন্য তারা উদ্দিষ্ট তার সাধনে অক্ষম। তখন অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রয়োজন, তবে এই ভাবে একসময় দেখা যাবে যে তা সীমার অতীত।

আর এভাবে দোষযুক্ত সব কটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ই যদি বৈধতার প্রশ্নে অযৌক্তিক অসম্বন্ধ প্রমাণিত হয়, তবে কোন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করা যাবে? শুরুতে, মধ্যে বা শেষে কোন এক একটিকেও যদি নির্বাচন করা না যায় তাহলে প্রমাণকাণ্ড সম্পর্কেই সন্দেহ ও নানান প্রশ্ন দেখা দেবে। আর যদি যেন তেন প্রকারে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উৎস হিসেবে স্বীকার করা হয় তো যে ভিত্তি থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই পুনরায় ফিরে যেতে হয়। অর্থাৎ কোন প্রমাণই বৈধতার মাপকাঠিতে টেকে না, শেষ পর্যন্ত প্রত্যয় বা বিশ্বাসকেই পাথেয় করে বুদ্ধির কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অতএব বুদ্ধি বা বিচার শক্তিই হলো একমাত্র উৎস।

শঙ্করের মতে[7] অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্মনের পরিপ্রেক্ষিতেই তথাকথিত প্রমাণ-গুলিকে বাতিল করা যায়। প্রমাণের মাধ্যম হিসেবে বর্ণিত প্রত্যক্ষ অনুমান ইত্যাদি কি করে বৈধ বলে ব্যক্ত হবে, কেননা সম্পূর্ণতই এগুলি অবিদ্যা-নির্ভর। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় অসম্ভব। আর জ্ঞাতা দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অবিদ্যার মাধ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। দেহ ভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন দেহ কল্পনাই করা যায় না। আবার দেহ আত্মার অধ্যারোপ ভিন্ন অচল। আর আত্মা এই সব ব্যতিরেকে মুক্ত, একমাত্র জ্ঞাতা হিসেবে পরিগণিত। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রমাণ সকল শেষ পর্যন্ত অবিদ্যানির্ভর।

শঙ্কর নির্দেশিত এই প্রমাণ খণ্ডন তাঁর অনুগামী শ্রীহর্ষ অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণে উপস্থিত করেছেন তাঁর খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থে। চূড়ান্ত ভাববাদের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রাখার জন্যই প্রতিপক্ষ যুক্তিকে নস্যাৎ করার স্বার্থে শ্রীহর্ষের এই প্রয়াস। চিৎসুখাচার্য যাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু ভিন্ন চিন্তারও উন্মেষ ঘটেছে এই সময়ে। বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক অসঙ্গ মৈত্রেয়নাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রমাণ সম্পর্কে গতানুগতিক নঙর্থক ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তী দার্শনিক দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্ত্তি যুগের সঙ্গে তাল রেখে প্রমাণ সম্পর্কে এক বিশেষ প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁদের এসবের মূল তাৎপর্য হলো ভাববাদের সঙ্গে প্রমাণের একটা সমন্বয়ী সম্পর্ক কোনভাবে দাঁড় করানো। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় পরবর্তী ভাববাদী সম্প্রদায় কিছুটা ধাঁধায় পড়ে যান। অবশ্য তাঁরা একবাক্যে সকলে স্বীকার করেন যে দিগ্‌নাগ বা ধর্মকীর্তি কখনোই ভাববাদ থেকে দূরে সরে যান নি। যদিও বা সৌত্রান্তিক প্রভাবিত হয়ে প্রমাণ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এ সম্পর্কে আমরা একজন পরবর্তী দার্শনিকের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। দিগ্‌নাগ টীকাকার জিনেন্দ্রবুদ্ধির মতে দিগ্‌নাগ প্রমাণের আপাত বৈধতা স্বীকার করলেও তা সম্পূর্ণতই সম্বৃতি সত্যের দিক থেকে। কখনোই তা পারমার্থিক সত্যের দিক থেকে নয়। আর সম্বৃতি সত্য চূড়ান্ত বিচারে মিথ্যাই। সম্বৃতি সত্য এমন কোন অধিক সত্যতা বোঝায় না যা অলীকের থেকে বেশী কিছু। যদিও অলীক সম্বৃতি সত্যের থেকেও অধিক মিথ্যা। সত্যতা ও মিথ্যাত্বর ডিগ্রীর তফাৎ দেখিয়ে এই ভিন্ন উন্মেষিত চিন্তাকে পরবর্তীকালে কোনভাবে চাপা রাখেন নি পরবর্তী ভাববাদীগণ। কিন্তু তা যে প্রতিপক্ষীয় পরম অস্ত্র হয়ে গেছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে।

টীকাকার জিনেন্দ্রবুদ্ধির নব ব্যাখ্যায় দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির অবস্থান শঙ্করের অবস্থানের সঙ্গে কোনরূপ পার্থক্য সূচিত করে না। কারণ শঙ্করও অনুরূপভাবে কেবলমাত্র অবিদ্যার স্তরেই আপাত সত্য স্বীকার করেছেন। ফলে দিগ্‌নাগ, ধর্মকীর্তির প্রমাণ স্বীকার শেষ পর্যন্ত প্রমাণ খণ্ডনকেই এবং ভাববাদ প্রতিস্থাপনেই সাহায্য করে। তাঁদের যে মেলানোর চেষ্টা তা কোন পর্যায়েই ভাববাদ নস্যাৎ কল্পে নয়। বরং প্রতিপক্ষীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এড়িয়ে ভাববাদকে কি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাঁরা সর্বোতোভাবে সেই প্রচেষ্টাই করেছেন।

প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ (সহোপলম্ভনিয়ম)

পরোক্ষপ্রিয়া হিএব দেবা ঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে নিরিখ তুলে ধরেছিলেন পরবর্তীকালে সকল ভাববাদী দার্শনিকই তাকে কেন্দ্র করেই চূড়ান্ত ভাববাদের পর্যায়ে এসে পেঁাচেছেন। এই প্রসঙ্গে সকল ভাববাদী দার্শনিকই একটি কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেন যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নেই। কারণ প্রত্যক্ষ ইত্যাদি প্রমাণ কোনকালেই কোন পদার্থ প্রতিপাদন করে না। ভাববাদী দার্শনিকদের এই সামান্য সিদ্ধান্ত থেকেই অনুমেয় যে তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত ধারণা সাধারণের থেকে আলাদা অর্থাৎ অভিনব। ফলে ভাববাদীদের প্রমাণকাণ্ড বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ভাববাদী দর্শনের প্রমাণ কাণ্ড প্রমেয় কাণ্ড নির্ভর। তাই ভাববাদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্বরূপ ও উৎপত্তির প্রণালী সম্পূর্ণত ভিন্ন। চূড়ান্ত ভাববাদ অনুযায়ী সাক্ষাৎ প্রতীতিই প্রত্যক্ষ। আর এই সাক্ষাৎ প্রতীতিরূপ প্রত্যক্ষই প্রমা। এখানে প্রত্যক্ষের লক্ষণে কোন বিষয় নেই, কেবল জ্ঞানই বর্তমান। জ্ঞান কখনোই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এই চূড়ান্ত জ্ঞান সত্য ও নিত্য। উৎপত্তি-বিনাশরহিত এই জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের কোন যোগ থাকতেই পারে না। এই জ্ঞানই পারমার্থিক একমাত্র সৎবস্তু আর সবই মিথ্যা। অলীক। কিন্তু এর বিপরীতে যে জ্ঞান তা ব্যবহারিক। আর ব্যবহারিক জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশ-সম্পন্ন, সবিষয়ক। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান অপরোক্ষ, সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ স্বরূপ।

ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তা হলো জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ; যথাক্রমে প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ রূপে চিহ্নিত। এই ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তঃকরণ, বৃত্তি ও বিষয়ের প্রয়োজন। এ সকলই মিথ্যা, অবিদ্যা প্রসূত। আর যা অবিদ্যাপ্রসূত তা ত্রিকাল-অসৎ অর্থাৎ কোন কালেই সৎ নয়। অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণবৃত্তি ও বিষয় অনিত্য ও বহু।

এই ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের উৎপত্তির প্রণালী সম্পর্কে ভাববাদী মত হলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তঃকরণ বিষয়দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। এই বিষয়ের আকার সমন্বিত অন্তঃকরণই হলো অন্তঃকরণের বৃত্তি। এখানে এই ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও বৃত্তি প্রভৃতির স্বরূপ জানা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় এখানে ভূত স্বরূপ জড় দ্রব্য। প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রমাতা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ প্রত্যক্ষ করে, রূপ ভূত স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণের সংযোগ থাকে। ফলে অন্তঃকরণের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হয়। অন্তঃকরণই নানা আকার গ্রহণ করে। এই আকার গ্রহণ অন্তঃ-করণের পরিণাম। আর অন্তঃকরণের পরিণামই তার বৃত্তি। এই বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যই প্রত্যক্ষ প্রমা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যবহারিক জ্ঞানের দুটি অংশ। জ্ঞান ও বিষয়। জ্ঞানরূপে যে কোন জ্ঞানই স্বপ্রকাশ। কিন্তু সেই জ্ঞান বিষয়াংশের জন্য অবিদ্যা প্রসূত হয়ে বহুরূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞান সকল সময়ই এক ও অপরিণামী কিন্তু বিষয়াংশে বহু ও পরিণামী হয়। অতএব ব্যবহারিক জ্ঞানের দুটি অংশ—জ্ঞানাংশ ও বিষয়াংশ। জ্ঞানাংশকে সাক্ষী বলে। সাক্ষী মানে নির্লিপ্ত দ্রষ্টা। নির্লিপ্ত সাক্ষী ও সক্রিয় অন্তঃ-করণের ঐক্যই ব্যবহারিক দিক থেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে চিহ্নিত। সাক্ষী আবার দ্বিবিধ—জীবসাক্ষী ও ঈশ্বর সাক্ষী। কিন্তু মোক্ষের সময় এই ভেদ থাকে না। তখন সাক্ষী ও অন্তঃকরণের ঐক্য ভেঙ্গে যায়। সাক্ষী ব্রহ্মস্বরূপ হয়।

এই প্রত্যক্ষ আলোচনা থেকে প্রমাণিত যে চূড়ান্ত ভাববাদ দু প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার করে। সাক্ষাৎ প্রতীতি বা পারমার্থিক প্রত্যক্ষ ও বিষয়গত প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যক্ষ লক্ষণ বর্ণনায় ভাববাদী দার্শনিকগণ সকলেই একমত যে প্রত্যক্ষ নির্বিষয়ক। কিন্তু ব্যবহারিক পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সবিষয়ক। পারমার্থিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কোন প্রশ্নই নেই। কেননা যা সাক্ষাৎ প্রতীতি তার আবার প্রামাণ্য নিশ্চয়ের কি প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রমাণ্য নিশ্চয়ের বিশেষ তাৎপর্য বর্তমান। কেননা ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ অবিদ্যাপ্রসূত ও মিথ্যা। ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের অধীন। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

জিহ্বা ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধীন। ইন্দ্রিয় শরীরাশ্রয়ী। শরীর মাত্রই ভূত স্বরূপ। ফলে ইন্দ্রিয় ভূত স্বরূপই। আর যা ভূত স্বরূপ তাই মিথ্যা পূর্বেই প্রমাণিত। বস্তু মাত্রেই সত্তাহীন, তার প্রমাণ দিতে ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেন যে প্রত্যক্ষের বস্তু মাত্রই হয় নিরংশ বা অখণ্ড, নয় অংশের সমষ্টি। অংশ সমষ্টি বলতে পরমাণু সমষ্টি যা প্রত্যক্ষ করা যায় না, আর অংশ প্রত্যক্ষের বিষয় না হলে অংশসমষ্টির প্রত্যক্ষই বা কিভাবে সম্ভব। আর যদি অংশসমষ্টি হয় তো অখণ্ড বলা যায় না। আবার বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে তার কাল নির্ণয় প্রয়োজন যা স্ববিরোধিতাপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার এক বস্তু আর এক বস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত আনা অসম্ভব অর্থাৎ বস্তুমাত্রই আপেক্ষিক। আর যা আপেক্ষিক তার নিজস্ব কোন স্বভাব নেই। এইভাবে ভাববাদীগণ প্রমাণ কল্লে জগতের সকল বস্তুই স্ববিরোধী, নিঃস্বভাব ও সত্তাহীন বলেছেন। অতএব যা সত্তাহীন তার আবার প্রত্যক্ষ হয় কি করে।

ভাববাদী মাত্রেই এবার বলবেন এবার প্রত্যক্ষে যা ধরা পড়ে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেমন জাগ্রত প্রত্যক্ষ ও স্বপ্ন প্রত্যক্ষ। জাগ্রত প্রত্যক্ষ অনিবার্যভাবে সংশয় ও ভ্রম উপস্থিত করে। উদাহরণ হিসেবে ভাববাদী দার্শনিকগণ স্তম্ভাদি প্রত্যক্ষ ও শুক্তি-রজত, রজ্জু-সর্প-ভ্রম প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। দূর থেকে দেখা কোন কিছুকে কখনো খুঁটি, কখনো মানুষ ইত্যাদি সংশয় উৎপন্ন করে। যা সংশয় উৎপন্ন করে তা কি করে সৎ হতে পারে? ভ্রম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। স্বপ্নে দেখা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার যোগ থাকে না অতএব স্বপ্ন প্রত্যক্ষ ও ভ্রান্ত। এইভাবে ভাববাদী দার্শনিকগণ যেমন প্রত্যক্ষ প্রণালী মিথ্যা প্রমাণ করেছেন তেমনি প্রত্যক্ষের বিষয়কে অনুরূপ মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ মাত্রই মিথ্যা অবিদ্যাপ্রসূত।

পূর্বেই ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক জ্ঞানের দুটি অংশ—জ্ঞানাংশ ও বিষয়াংশ উল্লেখিত হয়েছে। বিষয়াংশ যে অবিদ্যাপ্রসূত মিথ্যা, অসৎ তা প্রমাণিত। এখন প্রশ্ন জ্ঞানাংশ নিয়ে। জ্ঞান সকল সময়ই নির্বিষয় নিত্য এক এবং স্বপ্রকাশ। জ্ঞানাংশে যা সৎ বিষয়াংশে তা মিথ্যা। কেননা বিষয়মাত্রই অবিদ্যাজাত। এখন প্রশ্ন তাহলে সবিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞানের

ব্যাখ্যা কিভাবে দেওয়া যাবে। কারণ জ্ঞান মাত্রই যদি সৎ ও বিভু হয় তবে ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদের ব্যাখ্যাই বা কি? ভাববাদী সম্প্রদায় সকলেই একটি ব্যাপারে একমত যে নির্বিষয় জ্ঞানই নানা উপাধি দ্বারা উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়। এই উপাধিগুলি অবিদ্যা-প্রসূত। ব্যবহারিক জ্ঞান অবিদ্যাপ্রসূত উপাধি বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বিষয়াংশে তাই মিথ্যা। যার ফলে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ প্রমা অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাবে প্রত্যক্ষ অনুমান ইত্যাদি যে সব জ্ঞানকে প্রমা বলে চিহ্নিত করা হয় তাদের প্রমাত্ব ও ব্যবহারিকই। অতএব ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানাংশ অর্থাৎ চেতন এবং বিষয়াংশ জড় উভয়ের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে। জড় ও চেতন দুটি বিরোধী পদার্থের সমন্বয়ই ব্যবহারিক জ্ঞানের জনক। এই সমন্বয় অবিদ্যাজন্য। এই প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ আরো সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকদের দ্বারা। এই দার্শনিকগণ হলেন যথাক্রমে দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্ত্তি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে তাঁদের বিখ্যাত প্রতিপাদ্য সহোপলম্ভনিয়ম আমরা এখানে তুলে ধরব।

সহোপলম্ভনিয়ম

সহোপলম্ভ নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধর্মকীর্ত্তি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে সাধারণ ধারণা পর্যন্ত একটি বিষয়ে সকলেই একমত কোন কিছুর অস্তিত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন তাকে সত্যি সত্যি জানা যায়। অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রমাণ তখনই হয় যখন তার সদর্থক সাক্ষ্য থাকে। এমন কোন প্রকার দাবী কখনোই স্বীকৃত হয় না যে কোন কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান অথচ সেই বস্তুর প্রামানিক তথ্য বা নজির নেই। ধর্মকীর্ত্তি এখানে বলেন যে যদি সাধারণের অভিজ্ঞতা থেকেই বিষয়টির বিশ্লেষণ শুরু করা যায় তো ঠিক হয়।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত সত্য হলো বাহ্যবস্তু বর্তমান, যেমন গাছপালা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেই ধরা যাক, যেমন কোন বস্তু টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। সাধারণভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় এরা যে অস্তিত্বশীল তা কিসের ভিত্তিতে প্রমাণিত। সাধারণভাবে উত্তর হলো আমরা দেখি, তার স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি অনুভব করি। ধর্মকীর্ত্তি

এখানেই এসে থেমে যান। আর বলেন সত্যিই তো, কোন বস্তুর অস্তিত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন তার সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলতে বোঝায় আমরা যখন সংবেদনের সাহায্যে একের সম্পর্কে সচেতন হই। এককথায় স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি আমাদের সংবেদন হয়।

এখন তাহলে সংবেদনটাই বা কি তা আগে জানা দরকার। সংবেদন হলো একটি মানসিক পর্যায়। এখন প্রশ্ন তাহলে বিষয়-বস্তুর যে সংবেদন হয় তা আমাদের কি দেয়? উত্তরে বলা যায় যা দেয় তা হলো আনন্দানুভূতি, হৃদয়ানুভূতি, রোমাঞ্চ ইত্যাদি। অতএব সাধারণের ধারণা এই পর্যন্ত সঠিক যে সংবেদনের সঙ্গে বিষয় অনুভূতির সাযুজ্য বা ঐক্য বর্তমান। কিন্তু কখনো কি হলফ করে বলা যাবে এই সাধারণ ধারণা যুক্তিযুক্ত? কেননা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে অনিবার্যভাবে যা প্রমাণিত তা হলো আমরা সরাসরি বাহ্যবস্তু বিষয় জানতে পারি না, যা পারি তা হলো বিষয়ের সংবেদন, অনুভূতি বা ধারণা। সুতরাং বাহ্য বস্তু বিষয় জানি এই কথা হলফ করে বলা মানে একজনকে তারই নিজের সংবেদন বা ধারণার চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে থাকা। ফলে যখন আমরা বলি বিষয়টি জানি তার অর্থই হলো যা কিছুই জানি, জানি কেবল ধারণার সঙ্গে একাত্মতা বা সহ উপলব্ধি। ধর্মকীর্ত্তি এই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বেরই নাম দিয়েছেন সহোপলম্ভনিয়ম।

সহোপলম্ভ নিয়ম হলো এককথায় জ্ঞানের নিজেকে নিজেই জানা। অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞানেই জ্ঞান নিজেই জ্ঞানের বিষয়। প্রত্যক্ষবুদ্ধির সময় কিসের উপলব্ধি হয়? সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলো নীল, হলুদ, ছোট, বড় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার আকারই উপলব্ধি হয়। যেমন বিষয় নীলের জ্ঞান, এখানে জ্ঞান ও বিষয় একাত্ম কেননা তারা অভিন্ন। যখন আমরা বলি নীল দেখি আসলে যা দেখি তা নীলের আকার ভিন্ন কিছুই নয়। নীলাকার জ্ঞান বিশেষই নীল। এই নীলাকার জ্ঞান বিশেষ ছাড়া নীলের অন্য কোন স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না। এখানে কেউ যদি বলে নীলের সংবেদনের থেকে নীল বিষয়ের ভিন্ন অস্তিত্ব বর্তমান, তা বলতে পারে কেবল যখন প্রত্যক্ষের সঙ্গে অসম্পর্কিত নীলের কথা বোঝায়। কিন্তু এমন কথা বলার পেছনে

কোন যুক্তিই নেই। 'কেবল নীল' ব্যাপারটাই অলীক। কেননা প্রত্যক্ষের অবিষয় নীলের জ্ঞান কোন প্রকার অর্থকেই সূচিত করে না। অতএব কেউই তার সংবেদন বা ধারণার চৌহদ্দির বাইরে যেতে পারে না। আর এমন কথা বলতেও পারে না যে বস্তু তার নিজের অস্তিত্বে থাকে।

এই যুক্তি অনিবার্যভাবে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের জন্ম দেয়। এই গ্রন্থে ধর্মকীর্ত্তি ভাববাদের সঙ্গে তর্কের সমন্বয় স্থাপন কি করে করা যায় তার প্রচেষ্টা করেছেন। তর্কের মৌল উপাদান হলো অনুমান। আর অনুমান একই সঙ্গে দুটি ব্যাপার সূচিত করে—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যাই নেই। কারণ এই অনুমান একান্তই নিজের জন্য। সমস্যা যেটুকু তা কেবল পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে। কারণ পরার্থানুমানের ধারণা অনিবার্যভাবে অন্য মনের অস্তিত্বকে সূচিত করে। 'পর' শব্দের দ্বারাই তা বোঝান হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানবাদের মূল প্রবণতাই আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ। আর যেহেতু ধারণাই একমাত্র স্বীকৃত তখন একের ভিন্ন অন্য ধারণার কথাও এসে পড়ে। এই প্রশ্নের সমাধান কালেই ধর্মকীর্ত্তি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন 'সন্তানান্তরসিদ্ধি'। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হলো অন্য মনের অস্তিত্বের প্রমাণ। চেতন প্রবাহের অস্তিত্ব স্বীকার করলে আত্মকেন্দ্রিক মতবাদের শিকার হয়ে পড়ার কোন হেতু নেই। কেননা এক্ষেত্রে অন্যমনের অস্তিত্বের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা নেই। এখানে ধর্মকীর্ত্তি লৌকিক মতবাদের সঙ্গে ভাববাদের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। আর তাছাড়া তর্কবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্যমনের অস্তিত্বের কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভিন্ন। আর তা যদি হয় বাহ্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। জ্ঞেয় বিষয়ের আকার ও জ্ঞানের আকার এক। উদাহরণ স্বরূপ এখানে তিনি স্মৃতিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তুলেছেন। স্মৃতিজ্ঞানে বিষয় থাকে না অতীতের অভিজ্ঞতাই স্মৃতির বিষয়। অতএব আকারই কেবল মাত্র প্রতীত হয়। ধর্মকীর্ত্তির সঙ্গে অন্যান্য ভাববাদীদের তুলনা করলে দেখা যায়, তাঁদের কোন প্রকার চিন্তাই ছিল না বিশেষ করে অন্য মনের স্বীকৃতির ব্যাপারে। তাঁরা উপনিষদ ঋষি প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে অভিজ্ঞতায় ভ্রমাত্মক উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে সরাসরি তা নস্যাৎ

করেছেন। সকল প্রকার অভিজ্ঞতাই ভ্রম, স্বপ্ন, মায়া ইত্যাদির মত ভ্রমাত্মক। আমরা সকলেই স্বতন্ত্র দেখি। স্বপ্নে অনুভূত বিষয় সম্পর্কে বাহ্যসৎ ও জ্ঞানভিন্ন বলে ধরে নিয়ে নানা প্রকার আচরণ করি। অথচ স্বপ্ন শেষে জাগ্রত অবস্থায় বুঝতে পারি স্বপ্নে দেখা বিষয় সমূহের কোনটিই জ্ঞান-ভিন্ন বাহ্য সৎ নয়। সকল কিছুই জ্ঞানসৃষ্ট আকার বা প্রত্যয় মাত্র। জ্ঞানাকার হওয়া সত্ত্বেও বিষয়ের যে জ্ঞানভিন্ন বাহ্য সৎ প্রতীতি হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এই মিথ্যা প্রতীতির প্রয়োজক। অতএব একথা প্রমাণিত জাগরণ ও স্বপ্ন সকল অবস্থাতেই অনুভূত যে কোন বিষয়ই, জ্ঞানের আকার-মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হলেই বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈতভাব, নানা ও বিভিন্ন সম্বন্ধ সাপেক্ষ তর্ক রহিত হয়। কারণ শুদ্ধ বিজ্ঞান বা চৈতন্য সকল দ্বৈতভাব শূন্য। এইভাবে ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, স্মৃতি কিংবা অন্য কোন প্রমাণ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য সৎ বস্তুর সাধন করতে পারে না। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করেছি শুধু স্বপ্ন নয় জাগ্রত অবস্থায়ও তিমির রোগী দ্বিচন্দ্র প্রত্যক্ষ করে, আমরা রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ করি। এতে প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানের আকার, তা জ্ঞানের বিষয়রূপে এবং জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যসৎ বিষয়রূপেও প্রতীত হতে পারে। স্মৃতি, অনুমান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ। আর যা প্রত্যক্ষ প্রমাণে সম্ভব নয়, তা স্মৃতি প্রভৃতির অগম্য। এ পর্যন্ত সকল ভাববাদী সম্প্রদায়ই সে কি উপনিষদের ঋষি, শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী, অদ্বৈত-বাদী সকলেই ভ্রমকেই পাথেয় করেছেন বস্তুজগতের অসত্তা প্রমাণে।

ভারতীয় দর্শনে যেমন ধর্মকীর্ত্তি তেমনি পাশ্চাত্য দর্শনে বার্কলে অনুরূপভাবে ভাববাদ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জ্ঞেয় এবং জ্ঞান যে অভিন্ন একথা প্রমাণ করতে বার্কলে একইরকম যুক্তির অবতারণা করেছেন।

প্রমেয়কাণ্ড বা তত্ত্ববিদ্যা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভাববাদী দর্শনে প্রমাণ কাণ্ড প্রমেয় কাণ্ডের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন প্রমেয় কাণ্ড কি? প্রমেয় অর্থাৎ প্রকৃষ্ট মেয় বা সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। অতএব প্রমেয় হলো জ্ঞানের বিষয়,

যা জানা হয়। এক কথায় প্রমাণসিদ্ধ পদার্থই প্রমেয়। যা প্রমাণসিদ্ধ তাই পদার্থ। অতএব প্রমেয় শব্দটি পদার্থ বোধক। এখান থেকে এটুকু উপলব্ধি করা গেছে যে প্রমেয় কাণ্ডে ভাববাদী দার্শনিকগণ পদার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ সাধারণ ধারণাপ্রসূত পদার্থের কোন সত্যিকারের অস্তিত্ব বর্তমান কি না! কারণ পদার্থের অস্তিত্বের উপরই তো প্রমাণ নির্ভর করছে। প্রমাণের বিষয়ই যদি না থাকে তো প্রমাণের কোন প্রয়োজনই নেই। তাই প্রমেয় কাণ্ডের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো পদার্থ পরীক্ষণ।

এ বিষয়ে ভাববাদী দার্শনিকগণ উপনিষদীয় নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বকে পরবর্তী দার্শনিকগণ নানা যুক্তি তর্ক, লৌকিক প্রমাণ ও ব্যবহারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লৌকিক যুক্তি তর্কের ব্যবহার উপনিষদীয় সিদ্ধান্ত বিরোধী কিন্তু দার্শনিক লক্ষ্য মাথায় রেখে পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকগণ যুক্তি তর্কের অতীত আত্মতত্ত্বকেই দার্শনিক রূপ দিয়েছেন।

এই দার্শনিক লক্ষ্যে ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রমেয় কাণ্ডে বা তত্ত্ববিদ্যায় জগৎ তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তা হলো (১) কার্যকারণ তত্ত্বখণ্ডন (২) পদার্থ বিশ্লেষণ অংশে ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুতত্ত্বখণ্ডন এবং (৩) পারমার্থিক সত্য প্রতিষ্ঠা। আমরা এখন একের পর এক এগুলির পর্যালোচনা করব।

কার্যকারণ তত্ত্ব খণ্ডন

উপনিষদীয় যুগের পর আমরা যে দুটি বড় ভাববাদী ধারা দেখি তারা যথাক্রমে শূন্যবাদ এবং মায়াবাদ। উপনিষদীয় তত্ত্ববিদ্যার যথার্থ রূপকার এই দুই সম্প্রদায় দার্শনিক লক্ষ্য প্রতিপালনের জন্য যে বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো অজ্ঞেয় চরম সত্তা বা ব্রহ্মন্। এই চরম সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে সকল কিছুই অসৎ। পরিবর্তমান জগতের ঊর্ধ্বে এই চরমসত্তা বিরাজ করে। কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। তাই ভাববাদী দার্শনিকগণ জগৎ তত্ত্ব ব্যাখ্যায় সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী যে কার্যকারণ তত্ত্ব তা খণ্ডন করেছেন। সাধারণের বিশ্বাসের জগতকে ভাববাদী দার্শনিকগণ যে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন তা নয়। তাঁদের মতে জগতের

ব্যবহারিক দিক অস্বীকার করার মতো মূঢ়তা আর নেই। কিন্তু এই সব জাগতিক বস্তুকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ করা যায় তো দেখা যাবে চরম পর্যায়ে কিছুই নেই। সবই শূন্য। এই জগৎ, কারণও নয় কার্যও নয়। পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকগণ বিশেষ করে অদ্বৈত ভাববাদ পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছেন যে শুধু মাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে কখনোই ভাবা ঠিক নয় যে, ব্রহ্মন্ই জগৎ কারণ। কিন্তু বস্তুজগৎ ব্রহ্মন্ সৃষ্ট একথা সর্বাংশে অসত্য। তাই চরম ভাববাদী অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী বিশেষ করে গৌড়-পাদ যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তা হলো অজাতবাদ। যার মূল তাৎপর্য হলো যে জগৎ কখনোই সৃষ্ট নয়। কারণ চরম বিশ্লেষণে জগৎ বলে তো কোন কিছু নেই। সবই অলীক ও মিথ্যা। গৌড়পাদকে অনুসরণ করে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকগণ এই তত্ত্বকেই ভাষা ও ব্যাখ্যার তার-তম্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখন যে প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে তা হলো জগৎ আসলে কি? কিভাবেই বা তার উদ্ভব? নাকি কারণ ছাড়া কার্য হিসেবে এই জগৎ বর্তমান। ভাববাদী দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন এই জগৎ কারণও নয় কার্যও নয়। কারণ এই জগতের কোন অস্তিত্বই নেই। যে আপাত অস্তিত্ব চোখে পড়ে তা নিতান্তই অবিদ্যাপ্রসূত। ভ্রান্ত উপলব্ধিবশতই মনে হয় এই জগত বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু এই জগতের অস্তিত্বকে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এর কোন অস্তিত্বই নেই, নিতান্ত অসৎ। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাববাদী দার্শনিকগণ একটি সাদৃশ্যানু-মানের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। যেমন রজ্জু-সর্প-ভ্রম, শুক্তি-রজত-ভ্রম ইত্যাদি দড়িতে সাপ দেখে চমকে ওঠা রজ্জু-সর্প-ভ্রম ভিন্ন কিছুই নয়। আসলে দড়ি দড়িই থাকে সাপের মিথ্যা প্রতীতি হয় অর্থাৎ দড়ি সাপ রূপে প্রতিভাত হয়। এখানে যা ঘটে তা হলো বুদ্ধিবিভ্রমবশত সর্পারোপের ঘটনা। ভ্রমের প্রভাবে কাল্পনিক সাপের ধারণার সৃষ্টি হয়। অদ্বৈত ভাববাদী দার্শনিক-গণের মতে এই কাল্পনিক কার্যকারণবাদ বিবর্তবাদ নামে পরিচিত। শঙ্কর বিবর্তবাদের সাহায্যে সাঙ্খ্য পরিণাম বাদ খণ্ডন করেছেন। এখানে বিবর্ত শব্দের অর্থ কারণে মিথ্যা কার্যের প্রতীতি। আসলে কারণ থেকে কোন কার্যই সৃষ্টি হয় না ভ্রমবশতই আমরা সেখানে কার্যসৃষ্টি দেখি যেমন দড়িতে

সাপের মিথ্যা বিশ্বাস জন্মে। এই জগৎ সংসারও তেমনি সর্প-রজ্জু-ভ্রমের মতই মিথ্যা। কার্যত কোন অস্তিত্বই নেই।

কার্য-কারণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের যুক্তিজাল কিন্তু এখানেই থেমে নেই। তা আরও বিস্তৃত, আরও বুদ্ধিদীপ্ত। ভাববাদীদের মতে এটা একান্তই অযৌক্তিক যে কার্যকে কোন না কোনভাবে নতুন উৎপত্তি বা আরম্ভ বলা। বা বলা যে কার্য হলো এমন কিছু যা কারণ থেকে ভিন্ন। ঠিক অনুরূপভাবে যা অযৌক্তিক তা হলো কার্য কারণের অন্তর্নিহিত বলা। এ কথার অর্থ কারণে যা ছিল তারই প্রত্যাবর্ত্তন হলো কার্য। ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেন ভারতীয় পরিভাষায় অসৎ কার্যবাদ যেমনই দোষদুষ্ট ঠিক তেমনই দোষদুষ্ট হলো সৎকার্যবাদ। আবার এই দুই তত্ত্ব ব্যতিরেকে তৃতীয় কোন প্রকার কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান একথাও বলা যাবে না। ব্যবহারিক দিক থেকে যতই তাৎপর্য বহন করুক না কেন এক কথায় কার্য-কারণ ব্যাপারটাই হলো সম্পূর্ণত কল্পনাপ্রসূত।

ভাববাদের ইতিহাসে শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনকে অনুসরণ করেই পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকগণ বিশেষ করে গৌড়পাদ ও শঙ্কর উদ্ভবের ধারণার ভ্রম প্রতিপাদন করেছেন সকল কিছুর অনস্তিত্ব প্রমাণ করে। নাগার্জুন উদ্ভবতত্ত্বের চারটি সম্ভাব্য বিকল্প উপস্থিত করেছেন। আর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে যুক্তিগত বিচারে কোনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি। এই চারটি সম্ভাব্য যুক্তি হলো যথাক্রমে :

১। কোন কিছুর সৃষ্টি হয় তার নিজের থেকেই।
২। কোন কিছুর সৃষ্টি হয় অন্য কিছু থেকে।
৩। কোন কিছুর সৃষ্টি হয় উভয়তই, নিজের থেকে ও অন্য কিছুর থেকেও।
৪। কোন কিছুর সৃষ্টি না নিজের থেকে হয়, না অন্য কিছুর থেকে হয়, সম্পূর্ণতঃ আকস্মিকভাবে।

নাগার্জুনের মতে এর কোন একটি যুক্তির উপর নির্ভর করা যাবে না। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রত্যেকটি সম্ভাব্য যুক্তিই একাধারে অযৌক্তিক ও অসম্ভব। আর যেহেতু কোন পঞ্চম যুক্তির সম্ভবনা নেই তখন এই উদ্ভব তত্ত্বকেই অসার ও উদ্ভট বলে বাতিল করা যায়।

প্রথম সম্ভাব্য যুক্তি কোনমতেই স্বীকার করা যায় না যেহেতু অযৌক্তিক ও অর্থহীন। কোনভাবে কি কখনো স্বীকার করা যায় কোন কিছু তার নিজের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। একথার অর্থ বস্তুটি উদ্ভবমুহূর্তের পূর্ব থেকেই ছিলো। নাগার্জুন তীক্ষ্ণ তির্যক সমালোচনায় বলেছেন যদি সত্যি সত্যিই কোন কিছু পূর্ব থেকেই থেকে থাকে তবে তার পুনরায় উদ্ভবের কথা বলা উদ্ভট ও অর্থহীন। যেমন যদি ঘট মৃত্তিকায়ই থেকে থাকে তবে তার আবার উদ্ভব হলো একথার কি যে অর্থ থাকতে পারে তা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করতে পারে না। ভারতীয় পরিভাষায় ব্যক্ত করলে সংক্ষেপে যা দাঁড়ায় তা হলো কোন অস্তিত্বশীল বস্তুই দ্বিতীয়বার উদ্ভবের কথা ভাবে না, কারণ সে নিজেই অস্তিত্বশীল। ঘট, ঘট হিসেবেই বিদ্যমান তার আবার উদ্ভবের প্রয়োজনটা কিসের? এই যুক্তির সমর্থনে পরবর্তী বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধপালিত পুনরায় যে যুক্তি সংযোজন করেছেন তা হলো যদি একথা স্বীকার করা যায় কোন কিছু তার নিজের থেকেই এসেছে তাহলে যে উদ্ভট ব্যাপার দাঁড়ায় তা হলো এই উদ্ভবের কোন অন্ত বা বিরাম নেই। তাহলে সকল সময়ই বস্তুটির উদ্ভব হতে থাকবে। এখন প্রশ্ন যদি ঘটটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয় তাহলে কি করেই বা ধরে নেওয়া যাবে যে ঘটটি পুনরায় মৃত্তিকায় পরিণত হলো? এই ধ্বংসের কোন ব্যাখ্যাই সুপ্রযুক্ত নয়। এইভাবে প্রথম সম্ভাব্য যুক্তিটি খণ্ডিত হয়।

নাগার্জুন দেখিয়েছেন যে দ্বিতীয় সম্ভাব্য যুক্তিটিও অনুরূপ অর্থহীন। দ্বিতীয় যুক্তিটি বলে কোন কিছুর সৃষ্টি হয় অন্য কিছু থেকে। এর থেকে এটাই প্রমাণিত যে যে কোন কিছুই যে কোন কিছুর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। আর তা যদি নিশ্চিত হয় তবে নাগার্জুনের প্রশ্ন তাহলে ঘন অন্ধকার সৃষ্টি হয় আলোর থেকেই। এমনকি একথা স্বীকার করতেই হয় যে যে কোন বস্তুই যে কোন কিছুর থেকে সৃষ্টি করা যাবে। এককথায় অ-কারণ থেকেও কার্য সৃষ্টি সম্ভব। সাধারণ প্রচলিত ধারণা হলো তেলের সৃষ্টি হয় তৈলবীজ থেকে। আর যদি তৈলবীজ তৈলর থেকে সম্পূর্ণতই ভিন্ন হয় তাহলে তৈলবীজের অনুরূপই বলা যায় বালুকণা। আর বালুকণা তৈলবীজ থেকে ভিন্ন বস্তু। তবে কেন তৈল কেবল তৈল বীজ থেকেই হয়, বালুকণা থেকে হয় না কেন? আর এমন উদ্ভট কথার স্বীকৃতি কি করেই বা দেওয়া যায়।

এইভাবে নাগার্জুন দ্বিতীয় সম্ভাব্য যুক্তিটিও নস্যাৎ করেন।

এখন পর পর দুটি যুক্তিই যে অযৌক্তিক তা প্রমাণিত হলো। তৃতীয় ও চতুর্থ সম্ভাব্য যুক্তি হলো প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাব্য যুক্তির সমন্বয়ের ফল। তৃতীয় সম্ভাব্য যুক্তিটি হলো প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তির যোগফল যেমন কোন কিছুর উদ্ভব হয় নিজের থেকে এবং অন্য কিছুর থেকে। এই যুক্তিও অযৌক্তিক। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তি যে উভয়েই উদ্ভট তা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত। তাহলে তাদের সমন্বয়ই বা কি করে যুক্তি সিদ্ধ হবে। উদ্ভটের সমন্বয় তো আর এক উদ্ভট কোন কিছুকেই উপহার দেবে। নাগার্জুন এই ভাবে তৃতীয় যুক্তি নস্যাৎ করেন। এরপর চতুর্থ যুক্তি, কোন কিছুর উদ্ভব না নিজের থেকে না অন্য কিছুর থেকে। এই চতুর্থ যুক্তি যদি স্বীকার করতে হয় তো কার্য-কারণ তত্ত্বই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় কোন সৃষ্টিরই কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি নেই। আর যদি জগতের কোন কিছুরই সৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্ভব না হয়, তাহলে তো সৃষ্টি বা উদ্ভব তত্ত্বই তো খণ্ডিত হয়ে যায়। আর জগতে কোন কিছুই যেহেতু সৃষ্টি নয় সকল কিছুই অস্তিত্বহীন, বন্ধ্যাপুত্র, শশকশৃঙ্গ, আকাশ কুসুমের মতই অর্থহীন অলীক কল্পনাপ্রসূত।

শঙ্কর নাগার্জুনের এই যুক্তিপদ্ধতি অনুসরণ করেই ভারতীয় দর্শনের মূল দুটি কার্যকারণ তত্ত্ব যথাক্রমে সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ খণ্ডন করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সাংখ্য ও ন্যায়-বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়ই তাঁদের নিজেদের সৃষ্ট অস্ত্রই শঙ্করের হাতে তুলে দিয়েছেন। শঙ্কর তার সদ্ব্যবহার করতে এতটুকুই দ্বিধা করেন নি। শঙ্কর প্রথমত সাংখ্য সৎকার্যবাদ অর্থাৎ কার্যের উদ্ভবের পূর্বে কার্য কারণেই থাকে এই মতবাদ নস্যাৎ করেছেন। সাংখ্য দার্শনিকগণ সৎকার্যবাদ অনুযায়ী বোঝাতে চান যে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সকল কিছুই প্রধান কারণ প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় অন্তর্নিহিত ছিল। শঙ্কর এই সৎকার্যবাদ খণ্ডন করেছেন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অসৎকার্যবাদের উপর নির্ভর করেই। অসৎকার্যবাদের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে কখনোই নিহিত ছিল না। কার্য হলো নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। আর যা আরম্ভ বা সূচনা তার পূর্বে থাকা কি করে সম্ভব। শঙ্কর এরপর সাংখ্য সৎকার্যবাদের যুক্তি দিয়েই কিন্তু অসৎকার্যবাদ খণ্ডন করেছেন। কার্যাদি

যদি কোনভাবে কারণে নিহিত না থাকে তো সকল কিছু থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি হতো, যেমন বালুকণা থেকে তেল। নির্দিষ্ট কারণের কেবল নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা থাকে ইত্যাদি। এইভাবে শঙ্কর ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে কার্যকারণতত্ত্বের মূলোৎপাটন করেছেন।

শঙ্কর কার্যকারণতত্ত্ব নস্যাৎ করতে শুধু যে উভয় সম্প্রদায়কে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত থেকেছেন তা নয় দ্বিতীয় পর্যায়ে পদার্থ পরীক্ষণের মধ্য দিয়েও প্রমাণ করেছেন কার্য-কারণ তত্ত্ব অর্থহীন। জাগতিক বস্তুর কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই। বস্তুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা উপলব্ধি হবে।

পদার্থ বিশ্লেষণ : ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ খণ্ডন

ভাববাদী দার্শনিকগণের মূল লক্ষ্য হলো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে অলীক, কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা তা প্রমাণ করা। তার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু এই লক্ষ্য রূপায়িত হলো বিশেষ করে ভাববাদী সম্প্রদায় যখন যৌক্তিক বলয় অতিক্রম করে বস্তুর অনস্তিত্ব, পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করতে সফল হন। তাঁরা দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শেষ পর্যন্ত এটা বুঝেছিলেন যে একবার যদি পদার্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় যে এর পেছনে আসলে কিছুই নেই তাহলে কোন দার্শনিক যুক্তিই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে না। অবশ্য এই লক্ষ্য পরিপূরণে ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রথমে পদার্থের ধারণা সম্পর্কিত যে তত্ত্বগুলি আছে তার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ভাববাদ বিরোধী দর্শন পরিক্রমা করে তাঁরা পদার্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণ সম্পর্কিত তিনটি মূল তত্ত্ব যা অবলম্বন করে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে তার নির্ধারণ করেন। তারপর একে একে তার খণ্ডন করেন। এই তিনটি তত্ত্ব যথাক্রমে (১) ভূতবাদ, (২) প্রধানবাদ ও (৩) পরমাণুবাদ।

ভূতবাদ অনুযায়ী চারটি ভূতপদার্থ যথাক্রমে মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নির সমন্বয়েই এই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। জীব-জগৎ-জীবন সকল কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ভূতবাদের সাহায্যে, এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোজগৎ, আত্মাও। এই ভূতবাদ লোকায়ত মতবাদ নামে পরিচিত। চার্বাক

দর্শনই এই ভূতবাদের প্রবক্তা।

প্রধানবাদের নামের সঙ্গে সাংখ্য দর্শন জড়িত। সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী প্রধান বা প্রকৃতি সকল কিছুরই আদি কারণ। জগৎ কারো সৃষ্টি নয়। জগৎ অভিব্যক্ত হয়েছে এক অব্যক্ত উৎস থেকে। এই অব্যক্ত উৎসের নামই প্রকৃতি। প্রকৃতিই সব কিছুর মূলাধার হওয়ায় প্রধান রূপে চিহ্নিত। তাই সাংখ্য জড়বাদ প্রধানবাদ রূপে খ্যাত।

পরমাণুবাদ অনুযায়ী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ হলো পরমাণুপুঞ্জ। পরমাণুর সমন্বয়েই যাবতীয় বস্তুরাজির সৃষ্টি হয়েছে। পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় দর্শনে অধিকাংশ দার্শনিক সম্প্রদায়ই সচেষ্ট হয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ই বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই দুই সম্প্রদায়ের নামের সঙ্গে পরমাণুবাদ বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদী দার্শনিক সম্প্রদায় ভূতবাদ আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কারণ সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রশাসনিক পর্যায়ে পুঁথি পত্র নিষিদ্ধ করে বহ্ন্যুৎসবের মধ্য দিয়ে ও দৈহিক নির্যাতনের সহায়তায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার প্রয়াস হয়েছে। তাই যে স্বাভাবিক বিকাশ হওয়ার কথা তা হতেই পারে নি। তাই ভাববাদী সম্প্রদায় ভূতবাদকে অবজ্ঞার স্তরে রেখে নাম মাত্র উল্লেখ করে খণ্ডন করেছেন। তাছাড়া ভূত-বাদের পরবর্তী বিকাশ কখনোই সুসংবদ্ধ কোন সাংগঠনিক বা প্রতিষ্ঠানিক পর্যায় লাভ করতে পারে নি। যা ভাববাদী সম্প্রদায়ের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে ওঠে নি। লোকায়ত দর্শনের উপর প্রাথমিক পর্যায়েই এই চরম আঘাত ও বিলক্ষণ প্রশাসনিক কঠোরতায় ছিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে কখনোই আর ঐক্যবদ্ধ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। এই বাড়তি সুযোগ ভাববাদী সম্প্রদায়কে প্রভূত সাহায্য করে। তাঁরা তাই সঙ্গত কারণেই ভূতবাদ বিশ্লেষণ ও খণ্ডনে কোনপ্রকার বাড়তি উৎসাহ দেখান নি বরং অবজ্ঞায় অপাঙ্‌ক্তেয় করেছেন চিরকাল। ভাববাদী সম্প্রদায় নয় ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়কেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কৌশল হিসেবে লোকায়ত মতবাদ খণ্ডন করতে দেখা যায়। এই বাড়তি সুযোগও ভাববাদীদের সাহায্য করে।

ঠিক অনুরূপ নিরুৎসাহ দেখিয়েছেন প্রধানবাদ আলোচনায়। ভাববাদী

সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম হলেন শঙ্কর। শঙ্করের মতে ভাববাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হল প্রধানবাদ। কারণ প্রধানবাদ লোকায়তে প্রচারিত। প্রধানবাদ খণ্ডন করলে ভাববাদের জয়যাত্রা অব্যাহত হবে। তাই শঙ্করের মতে প্রধানবাদ খণ্ডন **হল—প্রধান মল্ল নির্বহণ ন্যায়।** শঙ্কর বিশেষ ভাবে প্রধানবাদ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এই জন্য যে শঙ্কর শিষ্যদের অনেকেই গোপনে প্রধানবাদের অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন। শঙ্করের মতে চেতন অর্থাৎ পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি কখনোই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত বৈচিত্র্যময় সুন্দর জগতের সৃষ্টি করতে পারে না। একমাত্র চৈতন্যকর্তাই পরিকল্পিত ও সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে। একই সঙ্গে যেমন পরস্পর বিরোধী যুক্তি ধোপে টেকে না তেমনই জড় প্রকৃতিরই বিবর্তন বা পরিণাম হলো এই জগৎ। আবার এই জগতের বিবর্তন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত। উভয়ই একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। যা অচেতন তা কি করে লক্ষ্যাভিমুখী হয়। শঙ্কর ভিন্ন অন্য ভাববাদী সম্প্রদায় প্রধানবাদ খণ্ডনে খুব কমই উৎসাহ দেখিয়েছেন। কেননা ভূতবাদের মতই প্রধানবাদকে প্রশাসনিক পর্যায়ে নস্যাৎ করা হয়েছে। কপিল দর্শন যেমন পাওয়া যায় না তেমনই মহর্ষি কপিলেরও কোন তথ্যগত উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকমুখে প্রচারিত কপিল দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি কপিলকেও নিঃশেষ করা হয়েছে। যা প্রায় বিলুপ্ত তাকে আলোচনা করার অর্থ অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। চরম ভাববাদী শঙ্কর তো নিতান্ত বাধ্য হয়ে প্রধানবাদ খণ্ডনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যখন শঙ্কর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানবাদ খণ্ডনে পরমাণুবাদ খণ্ডনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন মহাযান সম্প্রদায়। মহাযান সম্প্রদায়ের মতে ভাববাদ বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিভূ হলো পরমাণুবাদ। ভাববাদী দার্শনিকগণের মতে পরমাণুবাদ কেবল যে অগ্রগামী চিন্তা প্রসূত তাই নয় পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিকগণের ঐতিহাসিক ভূমিকাই প্রমাণ করে পরমাণুবাদ কতখানি শক্ত পোক্ত ভিতের উপর সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগার্জুনই প্রথম পরমাণু খণ্ডনের উপর গুরুত্ব দেন। পরবর্তীকালে বসুবন্ধু, দিগ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি ও শান্তরক্ষিত সকলেই বিশেষভাবে পরমাণুবাদ খণ্ডনে সময় নিয়োজিত করেছেন। তাঁদের মতে কি

ভূতবাদ, কি প্রধানবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে পরমাণুবাদে চরম পরিণতি লাভ করেছে, তাই এই পরমাণুবাদকে যদি কোনভাবে নস্যাৎ করা যায় তো ভাববাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

ভাববাদী দার্শনিকগণ তাঁদের পদার্থ বিশ্লেষণ করেছেন একেবারে জনসাধারণের সাধারণ ধারণা থেকে। সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস করে যে বাহিরের জগতে যে বস্তুরাজি দেখা যায় তা সত্য। কারণ সফল ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুগুলিকে সঠিকভাবে জানি। ভাববাদী দার্শনিকগণ সাধারণের ধারণার যে কোন একটি বাহ্য বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন পদার্থ আসলে কি? তাঁদের মতে যে কোন একটি বস্তুকে নেওয়া যাক। তাকে যদি বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে, ভারতীয় পরিভাষায় যা হলো **বুদ্ধ্যা বিবেচনাৎ**, বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে সব শেষে শূন্য ছাড়া কিছুরই উপলব্ধি সম্ভব নয়। যেমন যে কোন সাধারণ মানুষই বিশ্বাস করে যে কাপড়ের অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ কাপড় জ্ঞানের বিষয় হয়। কাপড় লজ্জা নিবারণরূপ ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনও করে থাকে। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রমাণ করেছেন যে আসলে কাপড় বলে কোন কিছু নেই। ছিল না, থাকবেও না। এখন পাঠকের মনে একপ্রকার ধাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্ন জাগতে পারে, কি করে পদার্থ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাপড়ের অনুপলব্ধি সম্ভব? এর উত্তর ভাববাদী দার্শনিকগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে যদি কাপড়টিকেই পদার্থ হিসেবে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব এক একটি সুতোর সমন্বয় হলো কাপড়। কিন্তু এক একটি নির্দিষ্ট সুতো নিশ্চয়ই কাপড় নয়। কারণ সুতোর দ্বারা লজ্জা নিবারণরূপ ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ফলে একের পর এক সুতোয় কোথাও কোনভাবেই কাপড়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। অতএব কাপড় হিসেবে কাপড়ের কোন অস্তিত্বই নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঠিক আছে কাপড় হিসেবে কাপড়ের অস্তিত্ব না হয় উপলব্ধির বিষয় নয়। কিন্তু সুতো হিসেবে সুতোর কোন প্রকার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না? ভাববাদী দার্শনিকগণ এর উত্তরে বললেন, আচ্ছা বেশ তাহলে বাহ্যবস্তু হিসেবে সুতোকেই বিশ্লেষণ করা যাক। এখানেও অনুরূপভাবে দেখা যাবে পরিণতিতে সুতো বলে কিছুই নেই। যেমন সুতোকে যদি খণ্ড বিখণ্ড করা যায়, তাহলে দেখা যাবে

সুতো খণ্ডিত হতে হতে অংশুতে পরিণত হয়েছে। অংশু নিশ্চয়ই সুতো নয়। কারণ সুতোর ব্যবহারিক উদ্দেশ্য অংশুর দ্বারা কখনোই সিদ্ধ হয় না। ফলে দেখা যাবে ঠিক কাপড়ের মতোই সুতো হিসেবে সুতোর কোনরূপ অস্তিত্বই নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে বেশ সুতো না হয় নেই কিন্তু অংশুর তো অস্তিত্ব বর্তমান। ভাববাদী দার্শনিকগণ এবার দেখিয়েছেন আসলে অংশুরও কোনরূপ অস্তিত্ব নেই। যেমন যদি অংশুকেও খণ্ড বিখণ্ড করা যায় সব শেষে দেখা যাবে যে অংশু বলে কোন পদার্থ তো নেইই বরং দেখা যাবে অংশু বিভাজিত হতে হতে শেষে কোথায় শূন্যে মিলিয়ে গেছে। কোনভাবে চোখেও দেখা যাবে না। উপলব্ধি তো দূরের কথা, ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেন যে শুধু কাপড় কেন যে কোন প্রকার বস্তুকেই যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে বিভাজনের শেষতম পর্যায়ে এসে কিছুই পাওয়া যাবে না, কোন কিছুই দেখা যাবে না, উপলব্ধি করা যাবে না। অর্থাৎ পদার্থ বিশ্লেষণে শেষতম পর্যায়ে যখন কিছুই উপলব্ধির বিষয় নেই তো পরমাণু কোথা থেকে আসবে? আসলে শেষতম পর্যায়ে কেবল শূন্য বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন পরমাণু কি তবে অবয়ব শূন্য? আর যা অবয়ব শূন্য তার ব্যাখ্যাই বা কি করে দেওয়া সম্ভব? আর অবয়বহীন পরমাণুর সংযোগই বা ঘটে কি করে? কারণ সংযোগ কেবলমাত্র অবয়বের সঙ্গে অবয়বেরই হয়ে থাকে।

ভাববাদী দার্শনিকগণ এইভাবে পরমাণু তত্ত্ব খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে জড় পরমাণু থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত বৈচিত্র্যময় এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়। এমনকি তার সাহায্যে জগতের ব্যাখ্যাও দেওয়া কোনমতে সম্ভব নয়। অবয়বশূন্য গতিহীন যে পরমাণু তাতে গতিরই বা সঞ্চার কিভাবে হতে পারে? আর গতি যদি পরমাণুর স্বভাব বলা যায় তো সৃষ্টি ব্যাপারটাই তো অন্তহীন হয়ে অনবস্থা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাহলে পরমাণুবাদীরা প্রলয়ের যে তত্ত্ব উপস্থিত করেন তা কখনোই মানা যাবে না। এইভাবে ভাববাদী দার্শনিকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হলো যে সাধারণের জ্ঞানের বিষয় যে বস্তু বা পদার্থ তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অর্থাৎ শেষতম পর্যায়ে তা শূন্যমাত্র। অথবা বলা যায় তা ব্যক্তিগত ধারণা বা ভাব মাত্র। যার বাস্তব অস্তিত্ব ব্যাপারটাই বঞ্চনা-প্রসূত। কারণ শেষ পর্যন্ত কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন

ভাববাদী দার্শনিক বিশ্লেষণের শেষতম পর্যায়ে এসে কখনো শূন্য, ব্যক্তিগত ধারণা বা অনির্বাচনীয় বলে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেও সকল ভাববাদী দার্শনিকই একটা ব্যাপারে একমত যে বাহ্য বস্তু কাপড় হিসেবে কাপড়ের কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই। অতএব সাধারণের ধারণার বিষয় মাত্রই অনস্তিত্বশীল।

ভাববাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে ভূতবাদ বা প্রধানবাদ চরম পর্যায়ে পরমাণুবাদের উপরই নির্ভরশীল। যদি পরমাণুবাদ ঠিকমত খণ্ডন করা যায় তো প্রাচীনতম মতবাদ ভূতবাদ ও প্রধানবাদ কার্যত খণ্ডিত হয়ে যায়। তাই শঙ্কর ভিন্ন সকল ভাববাদী দার্শনিকই পরমাণুবাদ খণ্ডনে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁরা এটাকেই মৌল কার্যক্রম হিসেবে বেছে নিয়ে সর্বস্ব পণ করেছেন। কেবলমাত্র শঙ্কর বাস্তব অসুবিধার মুখে পড়ে প্রধানবাদ খণ্ডনে বিশেষ মেহনত করেছেন শুধু অদ্বৈতবাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায়।

সত্যতা নির্ণয় ঃ ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য

পদার্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাববাদী দার্শনিকগণ সাধারণ ধারণাকে ভিত্তি ধরে নিয়ে তাঁদের সমীক্ষা শুরু করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁরা দু প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হন। এক প্রকার অবস্থা যেমন সাধারণ ধারণার জগৎ গাছ, পাখি, পাহাড়, নদী, খাদ্য ইত্যাদি, তেমনি আর এক প্রকার অবস্থা হলো চূড়ান্ত পরীক্ষণের অন্তিম পর্যায়ে সকল কিছুই শূন্য। সমস্যা দেখা দিল যে এই দু প্রকার অবস্থাকে কিভাবে বর্ণনা করবেন। এমনকি রজ্জু-সর্প-ভ্রমে সাপ হিসেবে উপলব্ধ সাপ মিথ্যা কিন্তু যখন দড়ি হিসেবে দড়িতে যে দড়ির জ্ঞান হয় তারই বা কি প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। তাছাড়া রজ্জু সর্প-ভ্রম নিশ্চয়ই আকাশকুসুম ও বন্ধ্যাপুত্রের মত অলীক নয়, কারণ যা অলীক তার কোন প্রকার অনুভূতিই হয় না। তাছাড়া ভ্রম-স্বপ্ন-মায়া ইত্যাদির বিশ্লেষণে বাহ্য বস্তুজগতকে না হয় অলীক প্রতিপন্ন করা গেল কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় বস্তুর যে জ্ঞান হয় এবং যা বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ তার বিশ্লেষণ বা কি করেই দেওয়া যায়। কারণ ভাববাদী দার্শনিকগণকেও

তো খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে হয়, যেমন প্রতিপক্ষীয় ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ বা সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকেন। এই সমস্যার সমাধানও ভাববাদী দার্শনিকগণ দিয়েছেন। তাঁরা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে এই আপাতবিরোধই তো ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। আপাত সত্য ও চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কিত ধারণার অস্পষ্টতা হেতুই এই ধরনের বিভ্রান্তির উপলব্ধি হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ এইভাবে দু প্রকার সত্যতার ব্যাখ্যা করেছেন একটি ব্যবহারিক সত্য, অপরটি পারমার্থিক সত্য।

সেই উপনিষদের যুগ থেকেই এই ধরনের প্রশ্ন আলোচনার বিষয় বস্তু। এমন একটা সমস্যা যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে ভাববাদী চিন্তাবিদ্‌গণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই এই ধরনের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তবে উপনিষদের যুগে যা অস্পষ্ট ইংগিত ধর্মী ছিল তাই নাগার্জুনের হাতে সুস্পষ্ট ও যুক্তিকে আশ্রয় করে দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তিনি স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করলেন যে দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কর্মজীবনের যে পার্থক্য তার অনুপলব্ধি থেকেই বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়। নাগার্জুনই সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর মতে এখানে দু প্রকার সত্যতা বর্তমান। সম্বৃতি সত্য ও পারমার্থিক সত্য। পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিক চূড়ান্ত ভাববাদ প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর এই লোক ব্যবহারমূলক দিক বিবেচনা করে সম্বৃতি সত্যের নামকরণ করেন ব্যবহারিক সত্য হিসেবে। পরবর্তী পর্যায়ে সম্বৃতি সত্য অবলুপ্ত হয়ে তার স্থান গ্রহণ করে ব্যবহারিক সত্য। শঙ্কর যদিও আর একপ্রকার সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু কার্যত দু প্রকার সত্যই লোক চিত্তে স্থায়ীরূপ নেয়।

অবশ্য মহাযান সম্প্রদায় ও অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় উভয়েই সত্য কথাটি অস্তিত্বের তুলনা বোঝাতে প্রয়োগ করলেও উভয়েই যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো কি সম্বৃতি সত্য কি ব্যবহারিক সত্য আসলে কোন প্রকার সত্যই নয়। সম্বৃতি সত্য কিংবা ব্যবহারিক সত্য মিথ্যাই। অবশ্য তা পারমার্থিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে। যদিও পারমার্থিক সত্য যতদিন না কেউ উপলব্ধি করছে ততদিন সম্বৃতি বা ব্যবহারিক সত্যের মধ্যেই আবৃত থাকে। ঠিক এই কারণেই সম্বৃতি সত্যের গুরুত্ব বর্তমান।

ও বৈদিক মানবদের মধ্যে পার্থক্য সব সময় সুস্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি পূর্ব মীমাংসার আলোচনায় দেখা যাবে বেদের উপনিষদপূর্ব অংশের উপর একান্ত নির্ভরশীল আচার্যগণ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভাবনা খণ্ডন করেছেন। এমনকি তাঁদের ব্যাখ্যায় বৈদিক দেবতাদের ঐকান্তিক গৌণতাই প্রতিপাদিত হয়। অতএব এই দেবতাদের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে ঋগ্বেদে কোন আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক তত্ত্ব অন্বেষণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ফলে বেদ-উপনিষদে যে ভাববাদ বিরোধী ধারা প্রচলিত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান। পরবর্তী দর্শন সম্প্রদায়ের নানান প্রসঙ্গ থেকে প্রমাণ দেওয়া যায়। যেমন সাংখ্যসূত্রকার 'শাসনবাদ' উপনিষদের উল্লেখ করেছেন যেখানে স্পষ্টই ভাববাদ বিরোধিতা প্রতীয়মান। আর দেহাত্মবাদই যে উপনিষদে সমান্তরাল প্রতিপক্ষরূপে বিরাজ করেছিল তার প্রমাণ তো রয়েছেই। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে বুদ্ধ-পূর্ব উপনিষদ সাহিত্যে-দেহাত্মাবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান। অবশ্যই এই দেহাত্মবাদ উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের বিশেষ বিরোধী ছিল, তাই উপনিষদ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যায় স্বয়ং বাদরায়ণ দেহাত্মবাদের উল্লেখ পূর্বক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে দুটি সূত্র রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন।"

'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এর প্রজাপতি ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই উপনিষদ-উল্লিখিত দেহাত্মবাদের একটি নজির দেখেছি। অবশ্য সেখানে মতবাদটিকে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া হয় নি। তার পরিবর্তে এই দেহাত্মবাদ অসুর মত বা "অসুরদের উপনিষদ" বলেই উল্লিখিত হয়েছে। "অসুর মত" নামটি অবশ্যই নিন্দাসূচক প্রাচীন উপাখ্যানেরই পরিচায়ক। তবুও প্রশ্ন ওঠে, ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্যে কোন মতবাদ এইভাবে নিন্দিত হয়েছিল? দাসগুপ্ত অনুমান করেছেন, "অসুর মত নামে উল্লিখিত এই দেহাত্মবাদই লোকায়ত মতের একটি অতি প্রাচীন নিদর্শন।" এইভাবে যে কোন ভাববাদ সর্বস্ব গ্রন্থকে আমরা আলোচনা করি না কেন সর্বত্রই ভাববাদ বিরোধিতার প্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবে উল্লিখিত হয়েছে দেখতে পাব। ফলে ভারতীয় দর্শনের আদিপর্ব অর্থাৎ বেদ-উপনিষেদর যুগ থেকেই ভাববাদ ও ভাববাদ বিরোধিতা যে সমান্তরাল গতিতে অগ্রসরমান ছিল তা অবশ্য স্বীকার্য সত্য।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বেদ-উপনিষদ এর পথ ধরেই যদি আমরা অগ্রসর হই তো দেখতে পাব, যা আমরা পূর্বেই আলোচনার মাধ্যমে দেখেছি, কেবলমাত্র দেড়টি দর্শন সম্প্রদায় ভিন্ন সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই কোন না কোন অর্থে ভাববাদ বিরোধী। কোন না কোন অর্থে এই জন্য বললাম যেহেতু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ বিরোধিতা নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছে। ফলে দেখা যায় প্রত্যেকেই নানান বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে দ্বীপের মত নিজস্ব পরিধি গড়ে তুলেছে। কিন্তু সকলেরই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ভাববাদ-বিরোধিতা। এবার আমরা ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকে একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কাল নির্ণয় অত্যন্ত সুকঠিন। কেননা কোন দর্শন সম্প্রদায়ই এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তবে এ পর্যন্ত গবেষণা লব্ধ যে সিদ্ধান্ত তা থেকে অনুমান করা যায় যে লোকায়ত দর্শনের পাশাপাশি সাংখ্য দর্শন প্রচলিত ছিল। কারণ উপনিষদে উভয় দর্শন সম্প্রদায়েরই প্রসঙ্গ বর্তমান তবে অনালোচিত লোকায়ত দর্শন যেহেতু অবজ্ঞার স্তরে ছিল তাই কপিল সাংখ্য আপাত গ্রাহ্য ঠাঁই পাওয়ায় তাঁকেই আদিবিদ্বান বলে চিহ্নিত করেছেন গবেষক, কবি, সাহিত্যিকগণ। পুরাণ পুঁথি-স্মৃতি সবেতেই সাংখ্য দর্শনের উদাহরণ বর্তমান। এমন কি সাংখ্য দার্শনিকদের নামে তর্পণ করার জন্য প্রচলিত শ্লোক বর্তমান।

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা
সর্বেতে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ।।

এই তর্পনে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা কপিলের পূর্বেও সনক, সনন্দ নামে আচার্যগণ বর্তমান ছিলেন। অতএব এ সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে সাংখ্য দর্শন অত্যন্ত প্রাচীন। এই সুপ্রাচীন দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কিন্তু অব্যক্ত বা মূল বস্তুই। এই বস্তুই সকল কিছুর উৎস। সাংখ্য দর্শনের পরিভাষায় এই অব্যক্ত বস্তুর নাম প্রকৃতি। একথা সুবিদিত যে কপিল দর্শনে সরাসরি ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান বর্তমান। মানুষের ত্রিতাপ দুঃখ বিমোচনই

এই দর্শনের উদ্দেশ্য। অতএব এখানে ভাববাদবিরোধিতা ভিন্ন আর কি থাকতে পারে। শঙ্কর নিজেই নানা সময় সাংখ্য দর্শন নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে কখনো সাদৃশ্য টেনে কখনো সমালোচনা করে সূত্র লিখতে হয়েছে। পরবর্তী দার্শনিক বিজ্ঞানভিক্ষুতো স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কথিত আছে বুদ্ধদেব নিজে কপিল অনুসারী আচার্যের কাছে তাঁর পাঠ নিয়েছিলেন, তবে বিস্ময়ের যা তা হলো এমন প্রভাব বিস্তারকারী সাংখ্যদর্শনের সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অবশ্য ভারত-বর্ষের সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই প্রকার বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। পরবর্তীকালে আলোচনায় আরো বিস্তৃত আকারে রাখবো। আর সংখ্যদর্শন যে ভাববাদ বিরোধী দর্শন তার প্রমাণ ও পাওয়া যাবে।

ভাববাদ বিরোধিতা যে আদি বৌদ্ধদর্শনের মূলকথা তো পাঠকমাত্রেই জানেন। বৌদ্ধদর্শনের আদি পর্বে শুধু তত্ত্বগত দিক দিয়েই নয় প্রয়োগ গত দিক থেকে ভাববাদ বিরোধিতা সুপ্রকট। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান যখন সমাজের বুকে শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ালো তখন আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হিসেবে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। আর ভাববাদ বিরোধিতায় আপামর জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেন। বস্তুই যে সকল কিছুর উৎস একথা বৌদ্ধদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আত্মা ও পরমাত্মার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান সুপরিচিত। কিন্তু বুদ্ধদেব পরবর্তী বৌদ্ধ দর্শন ভিন্ন পথে বাঁক নেয়। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখা বেদ বিরোধিতার ঐতিহ্য হারায়। এমনকি কালে কালে কোন কোন শাখা উপনিষদ নির্ভর হয়ে ওঠে। পরবর্তী চিন্তাবিদ ও আধুনিক গবেষকগণ তাও প্রমাণ করেছেন।

এমনকি সম্পূর্ণতঃ বেদ নির্ভর বলে প্রচারিত যে মীমাংসা দর্শন সেই পূর্ব মীমাংসাও ভাববাদ বিরোধী। যদিও বেদের কর্মকাণ্ডকে নির্ভর করে এই মীমাংসা সম্প্রদায়ের উদ্ভব কিন্তু কালে কালে মীমাংসা দর্শন সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠাতা জৈমিনির সূত্রগ্রন্থ নির্ভর করে পরবর্তী শিষ্য সম্প্রদায় বিশেষ করে কুমারিল ও প্রভাকরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ভাববাদ বিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে। কেন এই পরিবর্তন তার কিছুটা পরিস্থিতিগত

ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। এখানে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেই ক্ষান্ত হব। তিনি স্পষ্ট ভাবেই লিখেছেন,[7]

"মীমাংসা সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জাতীয় দার্শনিক আলোচনার ঝোঁক কেন দেখা দিল—এ প্রশ্নের উত্তর অনুমান করা কঠিন নয়। কেননা কুমারিল ও প্রভাকরের যুগে ভারতবর্ষে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির বিকাশ ও প্রভাব সুস্পষ্ট হয়েছে এবং নানাবিষয়ে এই সব সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা নানা রকম বক্তব্য যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।"

ভাববাদ বিরোধিতা যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গৌতম ও কণাদ হলেন উভয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। উভয়ের নামে এত বিদ্রূপ ও উপহাস বর্তমান যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের স্বতন্ত্র পরিচয় উল্লেখ করতে হয় না। আমরা এখানে সেই রকম একটি উপহাসোচ্ছল প্রবাদ তুলে ধরব। যেমন—

ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট-পদার্থোপবর্ণনম্।
হিমবদ্-গন্তুকামস্য সাগর-গমনোপমম্ ॥

ধর্ম ব্যাখ্যা করার কথা বলে কণাদের ছটি পদার্থ বর্ণনা কেবল বঞ্চনা-মাত্র। এ হলো এমন এক নিদর্শন যে, যে হিমালয়ে যেতে চায় তার সাগরের দিকে যাত্রা করার মত প্রসঙ্গ। বৈশেষিক দর্শনের মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে কটাক্ষ করে একটি শ্লোক ও বর্তমান তাহলো—

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং বৃণোম্যহম্।
ন চ বৈশেষিকং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।

বৈশেষিক দর্শন যে মোক্ষ বা মুক্তিলাভের কথা বলে তা নিছকই স্থূল, অপ্রয়োজনীয়। বৈশেষিক মোক্ষলাভের চেয়ে বরং বৃন্দাবনে শৃগাল হওয়া ভালো। কেননা কণাদ সূত্রের প্রথমে উল্লেখ করেছেন—**অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ**। অথচ বর্ণনা করেছেন ছটি পদার্থের। পরমাণুবাদী ন্যায়-বৈশেষিকের মতে বস্তু পুঞ্জই সকল কিছুর মূল উৎস। গৌতমের ন্যায়সূত্রের কোথাও কোন রকমে উল্লেখ করা ছাড়া ঈশ্বর প্রমাণের প্রসঙ্গ নেই। বৈশেষিক দর্শনে তার কথাই ওঠে না।

অনুরূপ ভাববাদ বিরোধিতা জৈন দর্শনেও বর্তমান। বেদ ও ঈশ্বর বিরোধী জৈনদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তুপুঞ্জই। জৈন পরিভাষায় জাগতিক সকল কিছুর মূল উৎস 'পুদগল'। পুদগল কথার অর্থ পরমাণু। জাগতিক সকল কিছুই যে দ্বান্দ্বিক বিকাশ তা যেমন অন্যান্য ভাববাদ বিরোধী দর্শনে পাই, জৈন দর্শনেও তা বর্তমান। চিন্তাবিদ গার্বের মতে[৪] কি বৌদ্ধ দর্শন কি জৈন দর্শন উভয়তঃই সাংখ্যতত্ত্ব প্রভাবিত। ফলে জৈন দর্শন যে ভাববাদ বিরোধী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ তার তত্ত্বালোচনা। পরবর্তী পর্যায়ে এর সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হবে।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একমাত্র চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনই সাহিত্যে, দর্শনে, লোকাচারে সমস্ত দিক দিয়ে তৎকালীন সমাজ মানুষের সামনে ভাববাদের কপটাচারের মুখোস খুলে ধরেছিল। অবশ্য তার খেসারৎ দিতে হয়েছিল। জীবন, সম্পত্তি ও পুঁথি কিছুই রেহাই পায় নি প্রতিষ্ঠানিক রোষ থেকে। অবাধ আক্রমণের মুখে লোকায়ত দর্শন সম্প্রদায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। দর্শনের পরিমণ্ডল থেকে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে চার্বাক দর্শন লোকহৃদয়ে লোকাচারের মাধ্যমে কোনরকমে অস্তিত্ব বজায় রাখে। যার প্রভাব আজও সমাজের বুকে বর্তমান। সায়ণ মাধবাচার্যই প্রথম চার্বাক দর্শনের লোকাচারে টিকে থাকা শ্লোকগুলিকে সূত্রায়িত করেন। সেই শ্লোকগুলি কতখানি অবিকৃত সে নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু চার্বাক দর্শনের ভাববাদ বিরোধিতা কখনোই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই সব ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় ঘিরে পরবর্তীকালে অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিত কখনো ভাববাদ বিরোধিতাকে মুখ্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে তার কালিক সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করে অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন, আবার কখনো বা কোন কোন পণ্ডিত শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার্থে ভাববাদ বিরোধিতাকে ছেঁটে ফেলে ভাববাদের দিকে যুক্তিগুলি নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেছেন। কখনো সফল হয়েছেন কখনো সফল হন নি। কিন্তু মূল সূত্র ও তার প্রয়োগগত দিক তীব্রতা হারাতে হারাতে ক্ষীণকায় হয়ে উঠছে। কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব পর হয় নি। এখন আমাদের ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকে একে একে আলোচনা করব।

উপনিষদ ঃ উদ্দালক, বিরোচন, ও অন্যান্য ঋষি

যে বেদ-উপনিষদ ভাববাদী দর্শনের উৎসগ্রন্থ হিসেবে কথিত সেই বেদ-উপনষিদই কিন্তু ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের আদিপর্ব বলে পরিগণিত হতে পারত। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে শঙ্করাচার্য যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন অনুরূপ কোন যশস্বীই সমান দক্ষতার অধিকারী হয়েও বাধার বিন্ধ্যাচল সরিয়ে অগ্রসর হওয়ার মত সুযোগ করে নিতে পারেন নি। তাই ভাববাদ যতখানি সংহত হতে পেরেছে বেদান্ত দর্শনের মধ্য দিয়ে ভাববাদ বিরোধিতা তেমন ভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারেনি কোন একটি সম্প্রদায়ের মাধ্যমে! যার ফলে ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী ধারা আজও সংহত কোন রূপ পেতে পারে নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে বস্তুবাদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই।

আজ পর্যন্ত পণ্ডিত মহলে একটি কথাই বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য বিবেচিত হয় যে বৈদিক যুগ এক অভিন্ন চিন্তাধারার যুগ—তা হলো অধ্যাত্মবাদের বা ভাববাদের নিরবছিন্ন প্রকাশ। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় দেখা যাবে যে এই ধারণা সঠিক নয়। বেদের প্রাচীনতম অংশে কেবল পার্থিব কামনা বাসনার উদগ্র প্রকাশ ঘটেছে। কারণ প্রাক্‌বিভক্ত আদিম মানব সমাজ বিশেষ করে যখন প্রথম সম্পদ চেতনার উন্মেষ ঘটেছে পশুপালনের মাধ্যমে এমনকি কৃষিকাজ ও আয়ত্তের বাইরে তখন অধ্যাত্ম চিন্তার অবকাশ কোথায়, যতটা চিন্তায় স্থান করে নিয়েছে সে তো রহস্যাবৃত প্রকৃতিই। বৈদিক সাহিত্যে তো তার প্রতিফলন ঘটবেই। আদিম মানুষের কাছে একটি চিন্তাই প্রবল ছিল তা হলো খাদ্যচিন্তা। তাই সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে যে সকল কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা সকলই পার্থিব, তাদের প্রধানতম হলো অন্ন কামনা। পরবর্তী পর্যায়ে পশুপালনের যুগ ছাড়িয়ে যখন বৈদিক মানুষ কৃষি কর্মের যুগে প্রবেশ করে তখন অন্নচিন্তা প্রবল হয়। তাই সমগ্র ঋগ্বেদে অন্নচিন্তাই প্রধানতম বিষয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের থেকে একটি উদ্ধৃতি দেব।[৭]

"সংখ্যা গণিতের একটি সহজ হিসেব থেকে এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। নিঘন্টুর মতে (২।৭) ঋগ্বেদে ২৮টি অন্নবাচক শব্দ আছে,

এগুলির উল্লেখ মোট ৩০০০ বারেরও বেশী। এবং সর্বত্রই তা অন্নকামনা বা অন্ন-গরিমার অঙ্গীভূত। গো-বাচক শব্দ ৯টি (নিঘন্টু ২।১১)। শুধু গো এবং তজ্জাত শব্দই সহস্রাধিকবার এবং সর্বত্রই গো-কামনা বা গো-গরিমার অঙ্গ হিসেবে—উল্লিখিত। উদক বা জল বাচক শব্দ ১০১টি (নিঘন্টু ১।১২), বলবাচক শব্দ ২৮টি (নিঘন্টু ২।৯), ধনবাচকশব্দ ২৮টি (নিঘন্টু ২।১০) অপত্যবাচক শব্দ ১৫টি (নিঘন্টু ২।২), ইত্যাদি। এবং ঋগ্বেদে এগুলির কামনা মোট কত সহস্রবার ব্যক্ত হয়েছে তার হিসেব করা অবশ্যই অসম্ভব শ্রমসাধ্য।"

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে বেদের প্রাচীনতম অংশে কোথাও কি দেবতা, ধর্ম, কর্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বরুণ ইত্যাদি বৈদিক দেবতাদের কথা নেই? এর উত্তরে বলা যায় এই সমস্ত শব্দের অসংখ্যবার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সকল শব্দের উল্লেখ থাকা মানেই অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের প্রকাশ ঘটেছে এ কথার তাৎপর্য নেই। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে অন্তহীন পুনরুক্তিযুক্ত সমস্ত শব্দই পার্থিব। নিঘন্টু, নিরুক্ত, পাণিনি সূত্র ইত্যাদি প্রাচীন শব্দকোষ পর্যালোচনা করলেই এই উক্তির তাৎপর্য যথার্থ উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু এখানে এই গ্রন্থের পরিসরে এসব আলোচনা করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। অন্যত্র সম্ভব হলে করা যাবে। তবে যেটুকু না হলে অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটবে সেটুকু করতেই হবে।

দেবতা শব্দটিকে নিয়ে আলোচনা করা যাক, বেদে বর্ণিত দেবতা শব্দ আজকের যুগে যে অর্থে ধরে থাকি সেই অর্থে কখনোই ছিল না। দেবতা শব্দটি এসেছে দিব্ ধাতু থেকে যার অর্থ দ্যুতি বা প্রকাশ। যাস্কের মতে—**যো দেবঃ সঃ দেবতা**। অর্থাৎ যা দীপ্তিমান তাই দেবতা। অতএব দিব্ ধাতুর দীপনে বা দ্যোতনে দেবতা এসেছে। আকাশ, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি দ্যুতিমান, তাই দেবতা। সমাজ প্রেক্ষাপটের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে তার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। যাস্ক নিজেই বলেছেন, পরবর্তী কালে দ্যুতিমান নয় এমন যে তাদের সম্বন্ধেও সুক্ত রচিত হওয়ায় তাঁরাও দেবতা পদবাচ্য হন।

বৈদিক দেবতাদিগকে মুখ্যত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) আকাশের

দেবতা (২) অন্তরীক্ষের দেবতা ও (৩) পৃথিবীর দেবতা। আকাশের দেবতা দ্যৌঃ, মিত্র, বরুণ, সূর্য, সবিতা, অশ্বিদ্বয় ও উষা। অন্তরীক্ষের দেবতা—ইন্দ্র বরুণ, বায়ু বা বাত, পর্জন্য, রুদ্র ইত্যাদি। পৃথিবীর দেবতা, অগ্নি, পৃথিবী, সরস্বতী ইত্যাদি। এই তিন দেবতাই কালে কালে গাণিতিক কৌশলে তেত্রিশ কোটিতে দাঁড়ায়।

ঠিক অনুরূপই ধর্ম শব্দ, পার্থিব অর্থেই ব্যবহৃত হতো যেমন ধর্মের ব্যুৎপত্তি হলো ধৃ ধাতু থেকে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। বস্তু যা ধারণ করে, যেমন আমরা বলে থাকি জলের ধর্ম, আগুনের ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সেই শব্দ বিকৃত হতে হতে আজকে কোন অর্থে অধিকাংশই গ্রহণ করে? ঠিক অনুরূপই কৃ ধাতু থেকে এসেছে কর্ম যার অর্থ কাজ করা। এমনকি ব্রহ্মশব্দ, যে শব্দ দিয়ে ভাববাদের বিস্তৃত পটভূমি রচিত হয়েছে তাও বস্তুত পার্থিব অর্থে ব্যবহৃত হতো। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ অন্নই। বৃহ ধাতু থেকে মনিন প্রত্যয় করেই ব্রহ্মা এসেছে। ব্রীহি কথার অর্থ ধান বা শস্য। নিঘন্টু মতেও ব্রহ্মণ্ মানে হয় অন্ন না হয় ধান। এখান থেকে প্রমাণিত যে শব্দকে মূলধন করে ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় আলোচনায় রত হয়েছেন তা প্রথমে মূলতঃ পার্থিব অর্থবোধক ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আদিম সাম্যবাদী সমাজের ধ্বংস বিশেষের উপর সম্পদ সৃষ্টির সূত্র ধরে সমাজে যখন শ্রেণী-বিভাগ এল শব্দগুলিকে ভিন্ন অর্থে বোঝানোর সূক্ষ্ম প্রচেষ্টাও শুরু হলো। এখানে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।[10]

"মানব চেতনা সমাজ নিরপেক্ষ নয়—বৈদিক কবিদের চেতনাও নয়। এই মূল সূত্র অনুসারে অগ্রসর হয়ে বৈদিক সমাজ ইতিহাসের মধ্যেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অন্যান্য আদিম মানুষদের মতই বৈদিক কবিরাও আদিতে যৌথ জীবন যাপন করতেন, তখন তাঁদের সমাজ সংগঠন প্রাক্-বিভক্ত বা আদিম সাম্য সমাজ। এই পর্যায়ের চেতনাই ঋতর পরিকল্পনায় প্রতিফলিত। কিন্তু কালক্রমে বিশেষত যুদ্ধ ও লুণ্ঠন মূলক কীর্ত্তির প্রাধান্য-ফলে-সেই আদিম সাম্য সংগঠন ধূলিসাৎ হয় এবং তারই ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভূত হয় ব্রাহ্মণ সমর্থিত ক্ষত্রিয় শাসিত সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। স্বভাবতই ঋত-র চেতনাও ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়।

"সংক্ষেপে সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য রচিত হওয়ার সুদীর্ঘ যুগ ধরে বৈদিক মানুষেরা ক্রমশই আদিম প্রাকৃবিভক্ত সমাজ পিছনে ফেলে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বৈদিক সমাজইতিহাসের এই মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যেই বৈদিক চিন্তাইতিহাসের মূল পরিবর্তনটি বুঝবার মূলসূত্র পাওয়া যায়। চিন্তাইতিহাসের মূল পরিবর্তন বলতে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনার ধ্বংসস্তূপের উপর অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চেতনার আবির্ভাব।

আদিম যৌথ জীবন যৌথ শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পর্যায়ে তাই চিন্তার দায়িত্ব ও শ্রমের দায়িত্ব—জ্ঞানের দায়িত্ব ও কর্মের দায়িত্ব-দুয়ের—মধ্যে পার্থক্য নেই, বিরোধ নেই। বিচ্ছিন্ন নয় জ্ঞান ও কর্ম। বৈদিক শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য থেকেই অনুমান হয়। বৈদিক সাহিত্য জানার কোন এক পর্যায়ে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে এ জাতীয়, অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বর্তমান ছিল। নিঘন্টু মতে 'ধী', শচী ও 'ক্রতু' শব্দ একাধারে কর্মবাচক ও প্রজ্ঞাবাচক। কিন্তু সমাজ সংগঠন যত সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভক্ত হয় ততই নিন্দিত হয় কায়িকশ্রম, গৌরবান্বিত হয় শ্রম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান; এবং তারই পরিণাম অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তা-চেতনা।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি তুলে ধরলাম এই জন্য যে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় গভীর অধ্যবসায়ে বৈদিক সাহিত্য অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। আমার পক্ষে উত্তরসূরী হিসেবে বিশেষ সুবিধে হয়েছে বৈদিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে এমন বলিষ্ঠ মন্তব্য করতে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে বৈদিক যুগে অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের কোনরকম অবকাশই ছিল না। পরবর্তীকালে শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থিত করে জনমানসকে প্রভাবিত করা হয়েছে। আসলে বৈদিক সাহিত্য যে প্রকৃতিবাদস্বর্বস্ব-এর উদাহরণ আমরা ছত্রে ছত্রে খুঁজে পাব। সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস যে প্রকৃতি এবং কোন অবস্তুর ক্রিয়া বর্তমান নেই একথা বারংবার ঘোষিত হয়েছে।

অতএব এই যে ঐকান্তিক প্রচার যে সমগ্র বেদ-উপনিষদই হলো অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ, তা আদপেই সত্য নয়। বৈদিক যুগ প্রাক্ অধ্যাত্মবাদের যুগ। পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে শ্রেণীর

উদ্ভবের সঙ্গে ভাবজগতেও শ্রেণী চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ফলে পাশাপাশি আদিম ভাববাদ ও আদিম বস্তুবাদ দ্বান্দ্বিক নিয়মেই অবস্থান করে। তার প্রকাশ উপনিষদের সর্বত্র ছড়ানো। কিন্তু মনীষার অভাবে আজও সেই দ্বন্দ্ব অনালোচিত থেকে গেছে। যে মূল তেরটি উপনিষদ ভাববাদী দর্শন প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর বেছে নিয়েছেন সেই তেরটি উপনিষদেই এই দ্বন্দ্ব বর্তমান।

উপনিষদেই এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে [11]**দেহমাত্রমেব আত্মা আসুরো বতেতি, আসুরাণাং হ্যেষা উপনিষৎ**। আত্মা যে দেহ ভিন্ন কিছু নয়, এ হলো অসুর প্রকৃতির লোকের অভিমত। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যে ধারণা বর্তমান তা হলো, সুর হলো দেবতা আর অসুর হলো অসভ্য বর্বর শ্রেণীর লোক। এই লোকায়ত ধারণা থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে সেই শ্রেণী বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাবজগতেরও বিন্যাস ঘটে। যার ফলে বৃহদারণ্যক উপনিষদ সুস্পষ্টই বলছে, অসুরদের উপনিষদে এবম্বিধ শিক্ষা। অতএব সেই উপনিষদের যুগেও যে আদিম বস্তুবাদ আদিম ভাববাদীদের কাছে শিরঃপীড়ার কারণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

[12]**তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বতেত্যসুরাণাং। তস্মাৎ অদ্যাপি ইহ অদদানং অশ্রদ্দধানং, অযজমানং আহুঃ বত আসুরঃ ইতি।** অর্থাৎ সেই থেকে আজো দেহাত্মবাদের প্রভাব বর্তমান। পারলৌকিক কর্মের নিন্দা করে যারা তাদেরই অসুর প্রকৃতির লোক বলা হয়ে থাকে। তাদের মতে [13]**সাধ্বলঙকৃতো সুবসনো পরিষ্কৃতাবিত্যো আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি**। বস্ত্রাভরণসর্বস্ব শরীরই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম।

এখন প্রশ্ন এই শরীর বা আত্মা কোথা থেকে এলো? এর উত্তরও দেহাত্মবাদ সর্বস্ব উপনিষদের ছত্রে ছত্রে ছড়ানো। বেদের শিক্ষা অনুসরণ করেই বলা হয় [14]**অন্নময় হি (সৌম্য) মন আপোময়ঃ প্রাণ স্তেজোময়ী বাগিতি**। এই অন্তঃকরণ অন্নময়। বাক বা কথা তেজোময়, প্রাণ জলময়। কারণ এগুলি অন্নাদিরই সূক্ষ্ম অংশ থেকেই গঠিত হয়েছে। ঠিক একই কথা বলা হয়েছে আর একটি অংশে [15]**তস্য ক্ক মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু।** নিত্য আহার্য্য অন্নই এই শরীরের মূল, অন্ন ব্যতীত কিছুই তো এসবের মূল

হতে পারে না। তারপর স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে [16]**অশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সৌম্য বিজানিহী নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি।** অন্নরসাদির পরিপাকেই শরীররূপে শুঙ্গউৎপন্ন হয়। শরীর কারণশুন্য নয়, অন্নই কারণ। এই পৃথিবীর সকল প্রাণীই অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নে বর্ধিত হয়, আবার পরিশেষে অন্নেই প্রতিগমন করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অনুরূপ উদ্ধৃতি আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও তা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে। অসীম অনন্ত মহাভূত থেকেই চেতন ও জড় সকল কিছুই উৎপন্ন হয় আবার এই মহাভূতেই প্রতিগমন করে, মৃত্যুর পর কোন চেতনাই থাকে না। [17]**ইদং মহদ্ভূমনন্তপারং বিজ্ঞানঘন এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।**

এইভাবে দেখা যাবে সমগ্র উপনিষদ জুড়েই আদিম ভাববাদ ও আদিম বস্তুবাদের যে মূল দ্বন্দ্ব তা উপস্থিত। আমরা সাংখ্যসূত্রকারের বর্ণনা থেকেও অনুরূপ পরিচয় পাই। সাংখ্যসূত্রকার সংক্ষিপ্ত আকারে শাসনবাদ উপনিষদের যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা হলো[18] এখানে অবতার রূপ পরিগ্রহণ যেমন নেই তেমনি ভগবান নেই, স্বর্গও নেই, সমস্ত গতানুগতিক ধর্মীয় সাহিত্যই নির্বুদ্ধিদের উদ্ভট কল্পনা প্রসূত, প্রকৃতি স্রষ্টা এবং কাল ধ্বংসকর্তা সমস্ত বস্তুর নিয়ামক, কিন্তু পাপ পুণ্যের বিচারে কোন প্রকার সুখ বা দুঃখ মানুষকে দেয় না, জনসাধারণ সুমিষ্ট বাগ্মিতায় প্রবঞ্চিত হয়ে ঈশ্বর, মন্দির ও পুরোহিতদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতে উপনিষদের যুগে ও প্রকৃতিবাদের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে আদিম বস্তুবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন জার্মান চিন্তাবিদ ওয়াল্টার রুবেন[19]। উপনিষদের যুগে বস্তুবাদের প্রবক্তা হিসেবে তিনি ঋষি উদ্দালকের নাম করেছেন। আর ভাববাদের প্রবক্তা হিসেবে নাম করেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের। ঋষি উদ্দালকের বস্তুবাদ ব্যাখ্যা চার্বাক বা লোকায়তদের থেকেও যে প্রাচীন তা উল্লেখ করেছেন ওয়াল্টার রুবেন। রুবেনের মতে বস্তুবাদের ইতিহাসে ঋষি উদ্দালকই হলেন আদি প্রবক্তা। এই সিদ্ধান্ত কতখানি প্রণিধানযোগ্য তা গবেষণার বিষয়। সঠিকভাবে কাল নির্ণয় করা না গেলেও ঋষি উদ্দালক

যে বস্তুবাদের প্রাচীনতম প্রবক্তা এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় নেই। এমন স্বীকৃতি পাব যদি আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিতর্কসভার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য অনুধাবন করি। আধুনিক গবেষকদের মতে উদ্দালকের কাল সম্ভবত খ্রীষ্ট পূর্ব ৬৪০-৬১০ অব্দ। যদি এই সময়সীমাকে স্বীকার করা যায় তাহলে উদ্দালক হলেন পাশ্চাত্য দার্শনিক থেলিস পূর্ববর্তী। অথচ পর্যালোচনার অভাবে উদ্দালক আজও অবহেলিত। উদ্দালক স্পষ্টভাষায় বলেছেন—কখনো কোন মানুষ যদি হাজারটি বেদকেও রপ্ত করে ফেলে তবুও দুঃখ কষ্ট থেকে তার রেহাই নেই, যতক্ষণ না সঠিক পথ তার জানা থাকে। উদ্দালকের মতে বেদপাঠ অকেজো, ব্যর্থ, যদি না কেউ আত্মসংযমের পথ গ্রহণ করে। আত্মনিয়ন্ত্রণই হলো একমাত্র সঠিক পথ, একমাত্র সত্য। যে কোন অস্তিত্বই যেন একটি স্বনিত শব্দ, কেননা স্বনন বা সুর সকল সময়ের জন্য বস্তুসৃষ্ট পাত্র থেকেই আসে যেমন মৃৎপাত্র আগত শব্দ। পাত্র ভিন্ন যেমন সুর হয়না তেমনই বস্তু ভিন্ন কোন অস্তিত্ব হয় না। শূন্য থেকে কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না যেমন ঈশ্বর থেকে। অস্তিত্বই সব। সেখান থেকেই আমাদের ধারনা বা চিন্তা আসে যেমন পাত্র থেকে সুর আসে। উদ্দালকের মতে সূক্ষ্ম বস্তুকণার সমন্বয়ই হল চিন্তা, যেমন অগ্নি, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি। উদ্দালক যদিও স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি যে এই জগত পরমাণু পুঞ্জ সৃষ্ট। ওয়ালটার রুবেন উদ্দালক থেকে এমন উদ্ধৃতিও তুলে ধরেছেন যাতে প্রমাণিত হয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের কথা প্রথম উদ্দালকই বলেছেন। উদ্দালক স্পষ্ট ভাষায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিরোধিতা করে বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্য দুঃখবাদের কুহক ছড়াচ্ছেন। তাঁর মতে মানুষ জাতি যদি প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা অনুযায়ী জীবন যাপন করে তাহলেই সুখ শান্তি পাবে। কিন্তু যদি কেউ ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী জীবন যাপন করে তো সে কেবল হতাশা ও অসহায়তায় ভোগে। এইভাবে উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যের দুঃখবাদের কুহকের বিরুদ্ধে আশাবাদের কথা তুলে ধরেছেন।

কেবল উদ্দালকই নয় উপনিষদের আর একজন ঋষি বিরোচনের মতে এই লোকায়ত জগতই সুখের আশ্রয়। উপনিষদের যুগে প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী ঋষি রূপে বিরোচনের নিন্দা ও খ্যাতি দুইই বর্তমান। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি উদ্ধৃত কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিরোচনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা

হয়েছে। ইন্দ্র ও বিরোচন একদা আত্মতত্ত্ব শিক্ষার্থে প্রজাপতির কাছে যান। প্রজাপতি দুজনকে বললেন চোখে যে সুপুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই আত্মা, তিনি ব্রহ্ম। তখন উভয়েই জলে দৃষ্ট পুরুষ এবং দর্পণে দৃষ্ট পুরুষের পার্থক্য বর্তমান কিনা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে প্রজাপতি বলেন, সমুদয়েই একই আত্মা পরিদৃষ্ট হন। এরপর উভয়ে জলপূর্ণ পাত্রে নিজের প্রতিবিম্ব অবলোকন করলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলে? উভয়েই উত্তরে বললেন, শরীরের প্রতিরূপই দর্শন করলাম। তখন প্রজাপতি তাঁদের সুন্দর বসন অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে নিজেদের দর্শন করতে বললেন। উভয়ে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন—কি দেখলে? উভয়েই উত্তর করলেন সুবসনে পরিষ্কৃত বিভূষিত শরীরই দেখলাম। প্রজাপতি বললেন তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। উভয়ে প্রস্থান করলে প্রজাপতি মনে মনে চিন্তা করলেন, আত্মতত্ত্ব না বুঝেই চলে গেল। সুর বা অসুর যেই হোক এই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। বিরোচন লোক সাধারণে এই আত্মতত্ত্বই প্রচার করলেন।[২০] **তেভ্য হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমং চামুং চেতি।** বিরোচন বললেন, এই শরীরই আত্মা, জগতে এই শরীরই একমাত্র মহনীয়, আমাদের এই আত্মারই সেবা করতে হবে, এই আত্মাকে সেবা করলে উভয় লোকই লাভ করে থাকে। অসুরদের এইই হলো উপনিষদ। **তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহু—রাসুরোবতেত্যসুরানাং।** সেই থেকে আজও দেহাত্মবাদের প্রভাব বর্তমান। পারলৌকিক কর্মের নিন্দা করে যারা তাদেরই অসুর প্রকৃতির লোক বলা হয়ে থাকে।

সমগ্র উপনিষদ সাহিত্য একটি গবেষণার বিষয়। এই স্বল্প পরিসরে সেই কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু একথা আজ অনিবার্যভাবে স্বীকৃত যে উপনিষদে প্রকৃতিবাদ, স্বভাববাদ, কালবাদ, যদৃচ্ছাবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আদিম বস্তুবাদ আদিম ভাববাদের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাৎ করেছিল। সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলে আরো বহু নিদর্শন হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু এ পর্যন্ত স্বীকৃত সত্য হিসেবে উদ্দালকই যে উপনিষদ সাহিত্যে প্রথম স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে আদিম বস্তুবাদ তুলে ধরে-

ছিলেন তা সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না। একজন আধুনিক বিদ্বানের মতে উপনিষদে এমনি অনেক উদাহরণ হয়ত প্রকৃতিবাদের স্বপক্ষে পাওয়া যাবে, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তা অত্যন্ত ক্ষীণধারায় ছিল। উদ্দালকেই প্রকৃতিবাদের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়। এমন বলিষ্ঠ মতবাদ যা ভারতীয় মনীষাকে পুষ্ট করে এসেছে সমগ্র মধ্যযুগ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত।

অতএব এতদিনের প্রচলিত ধারণা যে বেদ-উপনিষদ মাত্রেই অভিন্ন চিন্তার ক্রমবিকাশ তা আদৌ সত্য নয়। উপনিষদে তো তাও ভাববাদী চিন্তার ক্রমোন্মেষ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বেদে বিশেষ করে ঋগ্বেদে ভাববাদী ভাবধারার পরিচয় খুঁজে পাওয়া স্বতঃই সুকঠিন। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই ঋগ্বেদে নেই, সেখানে পরম চিন্তা হলো অন্নচিন্তা। পার্থিব কামনা বাসনার ছড়াছড়ি। পরবর্তী লোকোত্তর কামনা বা মোক্ষের কোন কথাই ঋগ্বেদে নেই। সুপরিচিত ভগবান শব্দটি পর্যন্ত পার্থিব। ভগ্ মানে সম্পদ বা তার অংশ। ভগ্ শব্দের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয় করে হয় ভগবান, অর্থাৎ সম্পদ বিশিষ্ট। এমনি ধারা অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা বর্তমান গ্রন্থের মূল বিষয় তা নয়। অতএব বৈদিক চেতনাকে আধ্যাত্মিক বা ভাববাদী আখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলেই বর্তমান আলোচনা শেষ করব। তাঁর মতে[21]

"অবশ্যই অন্যান্য আদিম ও অনুন্নত মানুষদের মতোই বৈদিক মানুষদের মনেও পৌরাণিক বিশ্বাস ছিল। ঋগ্বেদে তাই বহু দেবতার কথায় ভরপুর। কিন্তু দেবতাদের নজির থেকেও ঋগ্বেদে প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ প্রমাণিত হয় না। কেননা পার্থিব কামনাই এই দেবকল্পনার প্রধানতম উপাদান এবং বৈদিক দেবতা ও বৈদিক মানবদের মধ্যে পার্থক্য সব সময় সুস্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত পূর্ব মীমাংসার আলোচনায় দেখা যাবে, বেদের উপনিষদ-পূর্ব অংশের উপর একান্ত নির্ভরশীল আচার্যরাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভাবনা খণ্ডন করেছেন এবং তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারেও বৈদিক দেবতাদের ঐকান্তিক গৌণত্বই প্রতিপাদিত হয়।

অতএব এই দেবতাদের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে ঋগ্বেদে কোন আধ্যাত্মিক

তথা দার্শনিক তত্ত্ব অন্বেষণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।"

অতএব বেদ-উপনিষদ মাত্রই ভাববাদের একমাত্র পবিত্র উৎস হিসেবে যে ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা তা সহজেই অনুমেয়। বরং একথা বলা যায় স্বাভাবিক-ভাবে বেদেই প্রথম আদিম বস্তুবাদের উন্মেষ ঘটেছে। পরবর্তীকালে যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ এসেছে শ্রেণীশাসনের পথ ধরে এসেছে বিশুদ্ধ ভাববাদী দর্শন। কিন্তু বস্তুবাদ যে সকল সময়ই সমান প্রতিপক্ষ হিসেবে মননে মনীষায় গভীর রেখাপাত করতো তা আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। যতদিন যাবে বিদ্বানদের প্রচেষ্টায় সৃষ্টপ্রহেলিকা—বেদ-উপনিষদের অধ্যাত্ম-বাদ ও ভাববাদ সর্বস্বতা ক্ষয় পেতে থাকবে।

মীমাংসা দর্শন ঃ প্রভাকর এবং কুমারিল ও অন্যান্য

বেদ উপনিষদে যে আদিম বস্তুবাদ ও শ্রেণীশাসন সম্ভূত ভাববাদের দ্বন্দ্ব প্রচলিত ছিল তা পরবর্তী পর্যায়ে দুটি ধারায় টিকে থাকে বেদমূলক দুটি দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে। যথাক্রমে পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা, সংক্ষেপে মীমাংসা ও বেদান্তে। ভাববাদের বিকাশ আলোচনার সময় উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করেছি। এখন আলোচনার বিষয় পূর্ব মীমাংসা।

পূর্বমীমাংসা দর্শন বেদমূলক। কেননা বেদকে শুধু যে একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছে তাই নয় বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য সত্য বলে ঘোষণা করেছে। যার ফলে মীমাংসা ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেই বলেছি সমগ্র বৈদিক সাহিত্য হলো পার্থিব সম্পদ কামনায় প্রকৃতিবন্দনা। স্বাভাবিক নিয়মে আদিম মানব সমাজের মনে প্রকৃতিবাদ বা আদিম বস্তুবাদের যে উন্মেষ ঘটেছিল তা প্রতিফলিত হয়েছে বেদ-উপনিষদে। পার্থিব সম্পদ কামনায় তাই বৈদিক কবিগণ নানান সংগীত রচনা করেছিলেন। ছন্দোবদ্ধ সেই সংগীতই মন্ত্র নামে পরিচিত। কিন্তু মন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে একটা ভীতি বর্তমান। পুরোহিত সম্প্রদায়ের সুকৌশল প্রচারের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। নানান শাপ, অভিশাপের ধুয়ো তুলে মন্ত্র সম্পর্কে রহস্য জাগরিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাই বদ্ধমূল সংস্কারে আবদ্ধ, মন্ত্র না জানি, কি না কি? কিন্তু যে কোন মন্ত্রই যদি ব্যাখ্যা করা যায় তো দেখা

যাবে তাদের অধিকাংশ স্রেফ প্রকৃতি বন্দনা। :আমরা এখানে লৌকিক জগতে সর্বাধিক প্রচারিত একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন সূর্য স্তুতির মন্ত্র।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

এই মন্ত্রর আসল তাৎপর্য কেবল সূর্যবন্দনা। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সূর্যের রঙ জবা কুসুমের মত হয়। কাশ্যপ পুত্র হিসেবে মহাদ্যুতি হলো এই সূর্য। সকল প্রকার তমিস্রা বা অন্ধকারের বিনাশ সাধন করাই সূর্যালোকের কাজ। সেই সূর্যকে প্রণাম। এই সূর্যবন্দনার মধ্যে কোন গোপন তাৎপর্য লুকিয়ে আছে কি? ঋষি যাস্ক মন্ত্রের বুৎপত্তি ব্যাখ্যায় বলেছেন—**মন্ত্রা মননাৎ** মননের সহায়তা করে বলেই মন্ত্র। আদিম মানব সমাজ থেকে প্রচলিত যাগযজ্ঞ মন্ত্রপাঠ এ সবই পার্থিব কামনার থেকেই উদ্ভব। তাই মীমাংসা দর্শনের প্রাচীন নাম হলো যজ্ঞবিদ্যা। আর এই যজ্ঞ হলো আদিম যাদু। এই যাদুবিদ্যার সঙ্গে ধর্মের আধুনিক অর্থের কোন যোগাযোগ নেই। আসলে এই যাদুবিদ্যা হলো আদিম মানব সমাজের প্রকৃতিকে জয় করার ঐকান্তিক ইচ্ছা। আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে আদিম যাদুবিশ্বাস তাই প্রাক-আধ্যাত্ম বাদী চেতনার পরিচায়ক। ফলে মীমাংসা দর্শনে অধ্যাত্মবাদ বিরোধিতা চরম। সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অত্যন্ত সচেতন ভাবে প্রমাণ করেছেন যে ঈশ্বর বলে কোন কিছু নেই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনোই সম্ভব নয়। সাংখ্য দর্শনের মত মীমাংসা দর্শনকেও নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মীমাংসা দার্শনিক ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান করলেও দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এর উত্তর মীমাংসা দর্শনেই বর্তমান। পূর্বেই উল্লেখ করেছি দিব্ ধাতুর দীপনে প্রকাশই হলো দেবতা। বেদে বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে দেবতাদের নাম যুক্ত আর মীমাংসা দর্শন একান্ত ভাবেই বেদপন্থী। তাই দেবতাদের প্রসঙ্গ মীমাংসা দর্শনে .অনিবার্যভাবে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই দেবতা কি বর্তমান যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থবহ না অন্য কিছু? উত্তরে বলা যায় মীমাংসাদর্শনে উল্লেখিত এই দেবতা প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান গ্রহরাজিমাত্র। আদিম মানুষ ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্বিপাকের কোন কারণ খুঁজে

পেত না। অপার বিস্ময় তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলত। তাদের তুষ্টি বিধানের জন্যই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফরমান তৎকালীন শিক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায় দিয়েছিলেন। বেদপন্থী মীমাংসা দর্শন এসবের উর্দ্ধে নয়। তাই মীমাংসা-দর্শনের মতেও বৈদিক দেবতাগণ নিত্য ও সর্বব্যাপী। সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রাদি-ও আসলে তাই। অবশ্য এই সকল দেবতাগণের অস্তিত্ব কেবলমাত্র বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োজনে মীমাংসা দার্শনিকগণ স্বীকার করেছেন[২২]। কিন্তু এই সকল দেবতা না জগৎ কর্তা, না এদের কোন কর্তৃত্ব আছে। এই সকল দেবতা নামমাত্র, কেবল মন্ত্রের মধ্যেই এসবের নাম ব্যবহৃত হয়। অমর মহাকাব্যের চরিত্রের মত বৈদিক সাহিত্যে এই দেবতা নিছক চরিত্র বা জাতি রূপে গৃহীত। মীমাংসা দর্শনে এই স্ববিরোধিতা একদিকে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, ও যাদু অনুষ্ঠানে বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রত্যাখান আধুনিক চিন্তাবিদের অনেককেই ভাবিয়েছিল তাই তাঁরা নানারূপ স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত করেছেন। তাই কোন অর্থেই মীমাংসার প্রতিপালিত সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে নি। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচেষ্টা দেখা যায় মীমাংসা দর্শনকে কিভাবে সেশ্বর করা যায়। তাই সাংখ্য দর্শনের "ঈশ্বর সাংখ্যর" আমদানি করার মতই পরবর্তীকালে 'সেশ্বর মীমাংসার' ও আমদানি হয়েছে। এই 'সেশ্বর মীমাংসা, নামকরণ থেকেই প্রমাণিত যে মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের স্থান ছিল না। আমরা আধুনিক চিন্তাবিদ রাধাকৃষ্ণনের বক্তব্য এখানে স্মরণ করতে পারি। তাঁর মতে[২৩] পূর্ব মীমাংসা দর্শনের এই বৈপরীত্য পূরণ করার জন্যই পরবর্তী চিন্তানায়কগণ ঈশ্বর তত্ত্ব আমদানি করেছেন। কিন্তু মীমাংসা দর্শনের মূল চিন্তানায়কগণ যেমন শবর, প্রভাকর ও কুমারিল বলিষ্ঠ ভাষায়ই ঈশ্বর খণ্ডন করেছেন। আসলে মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর আমদানির প্রচেষ্টা বিশেষ করে শুরু হয় বেদান্ত দর্শনের প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসেবে। তাই পরবর্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে মীমাংসা দর্শন আলোচনাকালে[২৪] অশ্বস্তিবোধ জাগরিত হতে দেখা যায়। এইসব যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা তার উপলব্ধি বর্তমান বিদ্বানদের আকৃষ্ট করেছে।

মীমাংসা দর্শন শুধু যে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান বা নামসর্বস্ব দেবতাদের পূজা উপাসনা অর্থহীন, এই কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে তাই নয় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বহুল প্রচারিত মোক্ষ তত্ত্বের প্রতিও সমানভাবে ঔদাসীন্য

দেখিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? মীমাংসা দর্শন তো স্বর্গ-অপবর্গ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করা যায় তো দেখা যাবে এই স্বর্গ বা অপবর্গ আসলে কি? মীমাংসা মতে নিরবচ্ছিন্ন সুখই স্বর্গ, আর তা ইহলোকেই সম্ভব। এই জগৎ ছাড়িয়ে স্বর্গরূপ কোন দিব্যধাম নেই। অনাবিল আনন্দ লাভই হলো পরম পুরুষার্থ। সর্ব-দুঃখ-মুক্তিই মোক্ষ। অতএব অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় যে অর্থে মোক্ষের কথা বলেছেন মীমাংসা দর্শনে কোথাও সেই অর্থে মোক্ষ গৃহীত হয়নি। জৈমিনি সূত্রে মোক্ষের কথা না থাকলেও পরবর্তী মীমাংসা দার্শনিকগণ মোক্ষের তত্ত্ব আমদানি করার সর্বতো প্রচেষ্টা করেছেন। তা যে সর্বাংশে অবান্তর প্রচেষ্টা সে কথা আধুনিক পণ্ডিতদের আলোচনায় ধরা পড়েছে।

প্রাচীন মীমাংসকদের এই যে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান, মোক্ষের প্রতি ঔদাসীন্য, তা' কোন আচমকা আমদানিকৃত ব্যাপার নয়। বরং এসবই ভাববাদ বিরোধিতার জন্য ঐকান্তিক আত্মিক প্রয়াস। প্রাচীন মীমাংসা দর্শনেই তত্ত্বগত দিক থেকে ভাববাদ খণ্ডনের যৌক্তিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে মীমাংসা দর্শনই সর্ব প্রথম দর্শন যেখানে ভাববাদ-খণ্ডন সুবিন্যস্ত উপায়ে উপস্থাপিত। অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় মীমাংসা দর্শনের কাছে ভাববাদ-খণ্ডনের ব্যাপারে ঋণী। মীমাংসা দর্শনেই এই ভাববাদ বিরোধী ভূমিকা স্বভাবতই একনিষ্ঠ বৈদিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের তিতিবিরক্তি করেছে। ভাববাদী-পণ্ডিত মাত্রই প্রায় এই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মীমাংসা দর্শনের বিরুদ্ধে। আর প্রাচীন জ্ঞান কাণ্ড প্রধান বলে উপেক্ষা করেছেন, প্রাধান্য দিয়েছেন উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তকে।

মীমাংসা দর্শন একান্তভাবে বেদ নিষ্ঠ বা বৈদিক আবার একই সঙ্গে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ বিরোধী এই দুই স্ববিরোধী ব্যাপার আধুনিক চিন্তাবিদ ও পাঠকদের সংশয়ে আকুল করে তুলতে পারে। কিন্তু যদি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা যায় তো এই স্ববিরোধিতার সংশয় কেটে যায়। আমি এখানে এ কালের বিদ্বান দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য[২৫] তুলে ধরব। তিনি স্পষ্টতঃই সিদ্ধান্ত করেছেন "মনে রাখা প্রয়োজন, এই ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান, মোক্ষ-উপেক্ষা,

ভাববাদ-খণ্ডন প্রভৃতির স্বকীয় দার্শনিক গুরুত্ব যাই হোক না কেন, এ-সমস্তই পুরোহিত-শ্রেণী বা যাজ্ঞিকদের ধ্যান-ধারণাতেই বিকশিত হয়েছিল,—যাঁদের কাছে বৈদিক যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়াকার্যের চেয়ে মূল্যবান বলতে আর কিছুই সম্ভব নয়। অতএব মীমাংসার আর একটি দিক অনিবার্যভাবেই চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। বেদ যে অপৌরুষেয় এবং অভ্রান্ত সে কথা প্রমাণ করবার অবিরাম প্রচেষ্টা, যজ্ঞের খুঁটিনাটি নিয়ে ক্লান্তিকর বিচার বিশ্লেষণ এবং এসবের সমর্থনে নানা উদ্ভট মতবাদের উদ্ভব।

মীমাংসাকে বুঝতে হলে সামগ্রিকভাবেই বোঝবার প্রচেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হয় এ-দর্শনের কিছুটা উপাদান যেন অত্যাধুনিক, কিছুটা অতি আদিম।" এই আপাত বিরোধিতা যে সংশয় সৃষ্টি করে তাতে যে কোন পাঠকেরই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ইতিহাসের ধারাবাহিক পর্যালোচনা এই সংশয় দূর করবে। কালের অগ্রগতি অনুযায়ী যা ছিল আদিম তাই অত্যাধুনিক হয়েছে পরবর্তী মীমাংসকদের সুনিপুণ প্রচেষ্টায়। কিন্তু কখনোই মীমাংসা দর্শন জনগণ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তার নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস বর্তমান। তা অনুধাবন করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মীমাংসা দর্শন পূর্বাপর একই ধারাস্রোতে বহমান। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসটাই এমন জটিল, বাঁকা চোরা পথে তার অগ্রগমন যে সঠিকভাবে কোন দার্শনিক তাৎপর্যকে সনাক্ত করতে হলে পরিশ্রম ও মেধা উভয়েরই একীকরণ প্রয়োজন। কারণ কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজন কেউই অনুভব করেন নি সেহেতু সঠিক সন তারিখ নির্ণয় যেমন সহজ নয় তেমনি নানান বিরুদ্ধ শক্তির অপচেষ্টায় যে স্ববিরোধিতা সর্বস্ব প্রতীয়মান হয় তার কারণ নির্ণয় সুকঠিন। এক্ষেত্রে বিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিত যে প্রবহমান স্রোতে অনেক কিছুই ভেসে আসে কিন্তু সব ভাসমান বস্তুই স্রোতের টানে সমুদ্র অভিমুখী হয় না। খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে আটকা পড়ে তার প্রবহমানতা হারিয়ে স্থাণু হয়ে যায়। কিন্তু প্রবহমান ধারাস্রোত থেমে থাকে না। তা উৎসারিত হতে হতে একসময় সঙ্গমে পেঁছায়। তেমনি ভারতীয়

দর্শনের ইতিহাসটাকে ও অনুরূপভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তাই দেখা যায় প্রাচীন মীমাংসা সূত্রে যে প্রয়োজন যে ভাবে অননুভূত তারই বিশেষ রূপ অনুভূত হয়েছে পরবর্তীকালে। যে ভাববাদ বিরোধিতা মীমাংসা দর্শনে প্রাক্ আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যে সুপ্ত ছিল তা পরবর্তীকালে ক্ষুরধার যুক্তিতে ভাববাদ বিরোধিতায় সূচীমুখ পেয়েছে। শবর, প্রভাকর কুমারিলের কট্টর ভাববাদ বিরোধিতা সত্ত্বেও কখনো মনে হতে পারে কোন কোন বিক্ষিপ্ত শ্লোকে এই বুঝি ভাববাদ অনুরূপভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পূর্বাপর বিচারে এই খণ্ডবিচ্ছিন্ন স্ববিরোধিতামূলক উক্তি অপরিহার্য বিবেচিত হবে না। এ সবই অনিবার্যভাবে ঘটেছে প্রশাসন সৃষ্ট চাপের প্রকোপ বাঁচিয়ে চলার প্রবণতা থেকে। এরই সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে ভাববাদী সম্প্রদায়। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে দৃষ্টির অন্তরালে রাখতে নব নব ব্যাখ্যা উপস্থিত করে স্বজাতীয় ছাপ দিয়ে গোত্রভুক্ত করেছে। তার নিদর্শন এখনও রয়েছে, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে মীমাংসা দর্শনকে একই ধারাস্রোতের ভিন্ন প্রকাশ বলে অভিহিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস বর্তমান। কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে সবই যাচাই হয়।

মীমাংসা শব্দের অর্থ, বিচার। বিচার পূর্বক তত্ত্বাবধারণই মীমাংসা। এই অর্থে মীমাংসা শব্দের প্রয়োগ বেদ-উপনিষদেও পাওয়া যায়।[২৩] এই মীমাংসা শব্দ নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। কেউ কেউ বলে মীমাংসা শব্দের অর্থ বিচার বলতে বেদ বিচারকেই বোঝায়। আবার কারো কারো মতে মীমাংসা অর্থে বেদশাস্ত্র বিরোধী 'তর্ক' শব্দের প্রয়োগও পাওয়া যায়। মীমাংসার 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান বোঝায়। যদি শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা যায় তো দেখা যাবে যে জ্ঞান বিচার অর্থেই মীমাংসার প্রয়োগ।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মীমাংসাই হলো সুপ্রাচীন সম্প্রদায়। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্মৃতিতে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। মীমাংসার প্রাচীনতম নাম ন্যায় ও। পরবর্তী মীমাংসক আপস্তম্ব তা স্বীকার করেছেন। তাই মীমাংসা সূত্রই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আদিসূত্রগ্রন্থ হিসেবে অভিহিত হয়। মহর্ষি জৈমিনিই এই 'মীমাংসা সূত্র' রচনা করেছেন। তবে মীমাংসা সূত্রই এ পর্যন্ত একমাত্র প্রাপ্ত গ্রন্থ হলেও মীমাংসা সম্প্রদায়ের

ইতিহাস সুপ্রাচীন। মহর্ষি জৈমিনি আচার্য পরম্পরায় মীমাংসা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। বাদরায়ণ, বাদরি, ঐতিশায়ন, আত্রেয়, কার্ষ্ণাজিনি লাবুকায়ন, কামুকায়ন প্রমুখ। জৈমিনি পূর্ববর্তী এই সকল মীমাংসক আচার্যগণ শিষ্য পরম্পরায় মীমাংসা দর্শন শিক্ষা দিতেন। জৈমিনিই প্রথম আচার্য যিনি পূর্ববর্তী আচার্যদের শিক্ষাকে সূত্রাকারে সংগ্রথিত করেন। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি সম্পর্কেও বিতর্ক বর্তমান। এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য নেই যার ভিত্তিতে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। জৈমিনি সম্পর্কে নানান কাহিনী বর্তমান। কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত জৈমিনি একটি প্রাচীন গোত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা সামবেদের শাখার নামও যথাক্রমে জৈমিনীয় সংহিতা ও জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনিও আচার্য ব্যাসের কাছে সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। আবার ভট্ট কুমারিলের তন্ত্রবার্তিক থেকে জানা যায় মহর্ষি জৈমিনি হস্তী-পদদলিত হয়ে মারা যান। —**মীমাংসাকৃতমুন্মমাথ সহসা হস্তী মুনিং জৈমিনিম্**। এই রকম নানা স্ববিরোধী উক্তি থেকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বতঃই সুকঠিন।

মীমাংসাসূত্রই প্রাচীনতম সূত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থের অধ্যায়ের সংখ্যা বার। চার পাদের কম কোন পাদই নেই। বরং কোনটায় বা আট পাদ বর্তমান। সবশুদ্ধ ষাট পাদে সম্পূর্ণ সূত্র সংখ্যা হলো দুহাজার সাতশ চুয়াল্লিশ। এছাড়াও সঙ্কর্ষকাণ্ড নামে চার অধ্যায়ের একটি মীমাংসা সূত্রের পরিপূরক গ্রন্থ পাওয়া যায়। অবশ্য এ নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। কারণ সঙ্কর্ষ কাণ্ডের অপর নাম দেবতাকাণ্ড। এই গ্রন্থ জৈমিনির রচিত হওয়া সম্ভব নয়।

মীমাংসা সূত্রের উপর নানা ভাষ্য বর্তমান। মহামুনি বোধায়ন বিশ অধ্যায়ের একটি বৃহৎ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। নাম কৃৎকোটি ভাষ্য। কিন্তু এই ভাষ্যটি অত্যন্ত কঠিন। সাধারণের বোধগম্য নয়। যার ফলে কালের নিয়মে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

পরবর্তী সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার হলেন শবরস্বামী। শবরভাষ্যই সর্বাধিক প্রচারিত পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য। শবর জৈমিনি সূত্রের বারটি অধ্যায়ের উপরই শুধু ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই ভাষ্য অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়। শবরভাষ্য সম্পর্কে বলা চলে, **প্রসন্ন**

গম্ভীরপদা সরস্বতী। অর্থাৎ শবরভাষ্যের ভাষা অতীব সরল ও প্রসাদগুণ যুক্ত। স্পষ্টতই বলতে হয় শবর ভাষ্য ব্যতিরেকে জৈমিনি সূত্র বোঝা দুষ্কর। শবর স্বামী সম্ভবত বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। আবার অনেকের মতে শবরস্বামী কণিষ্কের পরবর্তী। এই সময় রাজানুগৃহীত বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব চলছিল। বৌদ্ধ দর্শন তখন মহাযান বৌদ্ধের ছদ্মবেশে ভাববাদের জয়যাত্রায় মুখর। মহাযান ভাববাদ অনুসারী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তখন কর্মকাণ্ডপ্রধান বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ সংগঠিত করেছিলেন। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে ক্রিয়াকাণ্ড প্রধান বৈদিক সংস্কৃতির চর্চা ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু রাজানুগ্রহ সত্বেও অন্তঃকলহ ও নানান অপরাধকর্মের ফলে একসময় বৌদ্ধ প্রভাব থিতিয়ে যায়।

ঠিক এমনি এক সময়ে কুমারিলের আবির্ভাব। তিনি বৌদ্ধ দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর গ্রন্থসমূহে বৌদ্ধ পদ্ধতিকে খণ্ড বিখণ্ড করেছেন। এই বৌদ্ধমত খণ্ডন যা ছদ্মবেশে ভাববাদেরই জয়গাথা অনেক ভাববাদী পণ্ডিতকে আহত করেছিল। কুমারিল তাই নানান কটাক্ষের সম্মুখীন হন। শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে শঙ্করের উক্তিরূপে এমনই এক কটাক্ষের উল্লেখ করতে পারি। প্রচলিত কাহিনী হলো কুমারিল আচার্য শঙ্করের সমকালীন। শঙ্কর একদিকে বৌদ্ধ দর্শনের বিরুদ্ধতা করার জন্য যেমন কুমারিলের প্রশংসা করেছেন অন্যদিকে ভাববাদ খণ্ডন রূপ নিন্দনীয় কাজ করার জন্য কটাক্ষও করেছেন, বিশেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব গ্রহণ করায়। কুমারিলের জীবন, জন্ম, দর্শনচর্চার স্থান নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। তবে কথিত আছে প্রয়াগে শঙ্করের সঙ্গে কুমারিলের সাক্ষাৎকার ঘটে। কারো কারো মতে তিনি দক্ষিণ ভারতের লোক, কেউবা বলেন তিনি উত্তর ভারতের। প্রচলিত মত হলো বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যভারতের কোন এক জায়গায় জন্ম। বাস করতেন প্রয়াগে। সুপণ্ডিত কুমারিল ভাষ্য অবলম্বন করে তিন খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন—শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক ও টুপ্‌টীকা। শ্লোকবার্তিক মীমাংসা দর্শনের প্রথম পাদ (তর্কপাদ) ভাষ্য অবলম্বনে রচিত।

শ্লোকবার্তিক আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত। আর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম পাদ পর্যন্ত পনেরটি পাদের ভাষ্যের উপর লিখিত বার্তিকের নাম...তন্ত্রবার্তিক। এই গ্রন্থটি পদ্যে ও গদ্যে রচিত। অবশিষ্ট চুয়াল্লিশ পাদের ভাষ্য অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ টুপ্‌টীকা।

কুমারিলের সমসাময়িক মীমাংসক হলেন প্রভাকর। তিনি ভট্ট কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু কুমারিল কটাক্ষ করে প্রভাকরকে গুরু আখ্যা দিয়েছিলেন। তাই প্রভাকর মত গুরুমত হিসেবে প্রচলিত। কুমারিল ও প্রভাকরের সম্পর্ক বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিতর্ক বর্তমান। অবশ্য উভয়েই জৈমিনি ও শবরকে ছাড়িয়ে গিয়ে জীবদ্দশায় দুটি পাশাপাশি সম্প্রদায় যথাক্রমে—ভাট্ট ও প্রাভাকর বেশ খ্যাতির সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। প্রভাকর শবর ভাষ্যের উপর 'বৃহতী' ও 'লঘ্‌বী' নামে দুটি টীকা রচনা করেন। প্রভাকর সর্বাংশে শবরভাষ্যের ব্যাখ্যা করেছেন, কোথাও সমালোচনা করেন নি। কিন্তু কুমারিল কখনো কখনো শবরের সমালোচনা করে নিজ নিজ ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই প্রভাকর কুমারিলের সমালোচনা করেছেন তাঁর লেখায়। প্রভাকরের কোন কোন সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি। শ্রীহর্ষ খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থে বলেছেন—**প্রসিদ্ধমেব লোকেঽস্মিন্ বুদ্ধবন্ধুঃ প্রভাকরঃ।** প্রভাকর বুদ্ধবন্ধু বলেই প্রসিদ্ধ।

ভাট্টমত ও গুরুমতকে কেন্দ্র করে মীমাংসাচার্যগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তবে কুমারিলের প্রভাবই বেশী। মণ্ডন মিশ্র, ভাট্টোম্বেক, পার্থসারথি মিশ্র ও মাধবাচার্য প্রাচীন গ্রন্থকার। আরো পরে খণ্ডদেব, গাগাভট্ট, লৌগাক্ষি-ভাস্কর, আপোদেব, প্রমুখ আচার্যগণ ও কুমারিলেরই পক্ষপাতী। মণ্ডন মিশ্র ও ভাট্টোম্বেক যে কুমারিলের শিষ্য শঙ্কর দিগ্বিজয়গন্থে মাধবাচার্য্যের উক্তি থেকেই জানা যায়। উত্তররামচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটক প্রণেতা মাহকবি ভবভূতির অপর নাম ভাট্টোম্বেক। এর স্বীকৃতি আচার্য চিৎসুখের প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকার, টীকায় পাওয়া যায়। মণ্ডণ মিশ্রের বিধি-বিবেক গ্রন্থের উপর টিকা লেখেন বাচস্পতি মিশ্র। তাঁর টীকার নাম 'ন্যায়কণিকা'। ভট্ট সোমেশ্বর তন্ত্রবার্তিকের টীকাকার। শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়রত্নাকর, ন্যায়রত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থ পার্থসারথি মিশ্র বিরচিত।

আপোদেব ভট্টের 'মীমাংসান্যায়প্রকাশ' এবং লৌগাক্ষি ভাস্করের 'অর্থসংগ্রহ, মাধবাচার্যের ন্যায়মালা, অপ্যয়দীক্ষিতের বিধিরসায়ন' এবং খডদেবের 'ভাট্ট দীপিকা' ইত্যাদি ভাট্টমতে সুপ্রসিদ্ধ। নারায়ণ ভট্টের 'মানমেয়োদয় ভাট্ট-মতের আর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রভাকর মতের অনুসারী মীমাংসাচার্য হলেন শালিকনাথ। তিনি প্রভাকরের 'বৃহতী' এবং লঘ্বী' টীকার উপর যথাক্রমে 'ঋজুবিমলা' ও 'দীপশিখা' রচনা করেন। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রকরণপঞ্চিকা'। তাছাড়া মাধবাচার্যের ন্যায়মালাতেও প্রভাকরের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত।

তবে প্রভাকর ও কুমারিলের পরবর্তী মীমাংসকগণ কোন না কোন ভাবে মীমাংসা দর্শনকে প্রচ্ছন্ন বেদান্ত আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ মীমাংসাও দেবান্ত দর্শনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। তা প্রকট হয়েছে বিশেষ করে শবর, প্রভাকর ও কুমারিলের ভাষ্যে। শবর, প্রভাকর ও কুমারিল ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমিকে নড়বড়ে করে দিয়েছেন। বিশেষ করে কুমারিল যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দার্শনিক ভাবাদকেই খণ্ডন করেছেন। দার্শনিক ভাববাদ জীবনকে প্রহেলিকা সর্বস্ব স্বপ্নময় আখ্যা দিয়েছে। সবই যদি স্বপ্নময় হয় তাহলে যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিছক অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্বপ্নময় জগৎ যেহেতু তখন সুখনিদ্রাই সকল সুখের আশ্রয় ভেবে মানুষ যাগ-যজ্ঞাদি আয়োজন করতে যাবে কোন আক্কেলে? ফলে মীমাংসাসূত্রে যা সুপ্ত অনুল্লেখিত ছিল তাকেই যুক্তিনিষ্ঠ করে কালোপযোগী দর্শন হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। তাই কুমারিল বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছেন ভাববাদ খণ্ডনে। সুপণ্ডিত কুমারিল দার্শনিক ভাববাদের সকল প্রকার উৎস, প্রবণতা সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন ছিলেন। কুমারিল তাই বিচার রহিত অবজ্ঞা দিয়ে নয় দার্শনিক প্রতি-পক্ষের মত যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষ যুক্তির বৈধতা বিচার করেছেন। দার্শনিক ভাববাদ কতখানি বাস্তবানুগ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, না কি অন্তঃসার-শূণ্য যুক্তির জন্য যুক্তির অবতারণা সর্বস্ব ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ভাববাদী পণ্ডিত ভাববাদ প্রতিষ্ঠার কাজ সমাধা করেছেন। এককথায় কুমারিলের মূল কাজ হলো ভাববাদ প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যুক্তিবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী কতখানি বৈধ ইত্যাদি বিবেচনা করা। কুমারিল তাঁর শ্লোকবার্তিকে বিশেষ করে

নিরালম্বনবাদ ও শূন্যবাদ অধ্যায়ে ভাববাদ খণ্ডণ করেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে মীমাংসা দর্শন আদিম বস্তুবাদের সূত্র ধরে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একসময় সূক্ষ্ম দার্শনিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই মীমাংসা দর্শনের সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। ভাববাদ খণ্ডন অংশে তা আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

আদি বৌদ্ধদর্শন : শুভগুপ্ত ও অন্যান্য

বৌদ্ধদর্শনের খ্যাতি জগৎ জুড়ে। অন্য কোন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের এমন পরিব্যাপ্তি সম্ভব হয় নি। প্রথাসিদ্ধ অর্থে বুদ্ধদেব সনাতন ভারতীয় পথ গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত প্রচলিত সনাতন দার্শনিক চর্চাকে কোনদিন প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর জীবনাচরণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাজপরিবার পরিত্যাগ করে বুদ্ধদেব প্রথমে সন্ন্যাসই গ্রহণ করেন। কেননা জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর পর চতুর্থ যে ঘটনা চোখে পড়েছিল তা হলো সৌম্য মূর্তি সন্ন্যাসীর রূপ। দৃঢ়-সংকল্প-বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে উরুবিল্বে পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সনাতন প্রথায় কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে তপস্যা শুরু করেন। কঠোর তপস্যায় শরীর অস্থিচর্মসার হলো। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সিদ্ধিলাভ হলো না। ছ' বছর কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধান্তে এলেন সনাতন কৃচ্ছ্রতা সাধনের পথে মুক্তি নেই।

বুদ্ধদেব নিজের উপলব্ধি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন[৫৭] "আমার শরীর দুর্বলতার চরম সীমায় পেঁৗছিয়াছিল, অথচ প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিগুলি অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় স্ফীত হইয়াছিল...উষ্ট্রশকটদের সংযোগ স্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্ত সদৃশ হইয়াছিল। লতাবেষ্টিত যষ্ঠির ন্যায় পৃষ্ঠকন্টক উন্নতাবনত হইয়াছিল। আমার অস্থিপঞ্জর জীর্ণগৃহের কাঠামো সদৃশ হইয়াছিল।...গভীর কূপে তারকা-বিম্ববৎ আমার চক্ষু-তারকা ও কোটরগত দেখাইত।...অপক্ক অলাবু ছিন্ন হইলে যেমন উহা বাতাতপে শুষ্ক ও ম্লান হয় তদ্রূপ আমার শিরচর্ম শুষ্ক ও মলিন হইয়াছিল। ...অল্পাহার হেতু আমার উদরচর্ম পৃষ্ঠকন্টকের সহিত লীন হইয়াছিল।...মলমূত্র ত্যাগের জন্য দাঁড়াইবা মাত্র ভূপতিত হইতাম। শরীরে হস্ত সঞ্চালন করিলে

লোমরাজি স্খলিত হইত। আমাকে দেখিয়া লোকে বলিত 'শ্রমণ গৌতমের দেহ কালবর্ণ', কেহ বলিত 'শ্যামবর্ণ', অপর কেহ বলিত 'ধূসরবর্ণ', আমার পরিশুদ্ধ গৌরবর্ণ দেহের সৌন্দর্য এইরূপ বিনষ্ট হইয়াছিল।

তথাপি এই তপশ্চর্যা দ্বারা আমি চরম দর্শন লাভ করি নাই। (আমার চিন্তা হইল) বোধি (=জ্ঞানে)-র নিমিত্ত অন্য উপায় কিছু আছে কি না? ...পুনশ্চ আমি স্থূল আহার—ডাল ভাত—গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ...সেই সময় আমার সহিত পাঁচজন ভিক্ষু বাস করিত।...স্থূল আহার গ্রহণ করিতে দেখিয়া আহারা আমার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল।"

এইভাবে কঠোর তপস্যা থেকে বিরত হয়ে বোধিবৃক্ষের নীচে মাত্র কয়েক দিনের ধ্যান মগ্নতায় তাঁর বোধিলাভ হয়। বুদ্ধদেবের বোধি বা জ্ঞান-দর্শন হলো চারটি আর্যসত্য। দুঃখ, দুঃখসমুদায়, দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তিমার্গ।

যে অতৃপ্তি থেকে বুদ্ধদেব তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানেই ফিরে এলেন। নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনকে জড়িয়ে যে জগৎ এককথায় মানব-জীবনধর্মই তাঁর চর্চার মূল বিষয়। বাস্তব জীবন ও জগতের মূল্যায়নে তিনি উপলব্ধি করলেন[২৪] দুঃখ ও দুঃখ নিবৃত্তিই জীবনের প্রধান সমস্যা। দুঃখ জর্জর মানুষকে এড়িয়ে বিশুদ্ধ চর্চা মুর্খামি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরব। মানুষ জীবন যন্ত্রণায় জর্জর। তাই এই মুহূর্তের কাজ হলো এই দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করা। আর এর পরিবর্তে যদি বিশুদ্ধ-দর্শন-চর্চার কথা বলি তাহলে আমরা সেই মূর্খ লোকের মতই আচরণ করব যে তীরবিদ্ধ, যন্ত্রণায় কাতর সে তীর তুলে ফেলে তার থেকে অব্যাহতির চেষ্টা না করে যদি এই অলস চর্চায় রত হয় যে কেন এই তীর, কার তৈরী, কিভাবেই বা কে, কেন নিক্ষেপ করল ইত্যাদি।[২৫]

এইভাবে বুদ্ধ প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সহমর্মিতায় বিশ্লেষণ করে নিরসনের উপায় বাৎলে দিয়ে বিশ্বমানবের যন্ত্রণামুক্তির উপায় স্থিরীকৃত করে স্বস্তি দিতে চেষ্টা করেছেন।[২০] কুমারিল তাঁর তন্ত্রবার্তিকে এই বিষয়টিকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথিত চারটি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ আজও সমানভাবে অর্থবহ। তিনি দুই চরম পথকেই ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন: ভোগ-বিলাস ও কঠোর

শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধন সন্ন্যাস দুইই বর্জনীয়। সাধারণ জীবনের দুঃখ, কি হেতু এই দুঃখ, দুঃখকারণ বিচার-বিকল্প ও দুঃখ নিরোধ মার্গই জীবনের একমাত্র মহনীয় পথ। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি এই তিন অবশ্য পালনীয় কর্ম জীবনকে যন্ত্রণামুক্ত করবে। সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্পই প্রজ্ঞা। শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের যথার্থ বিচারই হলো সম্যক্ দৃষ্টি। হিংসা পরিহার করে অহিংসার সাধন পরদ্রব্যে লোভ সংবরণ ও ব্যভিচার কর্ম থেকে বিরত হওয়াই শারীরিক কর্ম। অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত হয়ে প্রিয় বাক্য ব্যবহারই বাচনিক কর্ম। ভ্রান্ত ধারণা প্রতিহিংসা লোভ প্রভৃতির বিলোপ সাধন করে শুভ ভাবনার চর্চাই হলো মানসিক কর্ম। এইভাবে রাগ, হিংসা, দ্বেষ বর্জিত দৃঢ় জীবন যাপনই সম্যক্ সংকল্প। আর এইভাবে সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম ও সম্যক্ জীবিকা অবলম্বন করাই শীল বা সদাচার। সম্যক্ প্রযত্ন ও সম্যক্ স্মৃতি সম্যক্ সমাধিই সমাধি। সংযম ও সুস্থির প্রচেষ্টাই সম্যক্ প্রযত্ন। সুস্থ জীবন বোধের মানসিক অভ্যাসই হলো সম্যক্ স্মৃতি। এই সবই চিত্ত একাগ্রতাকে তরান্বিত করে একেই চরম স্তর বা সমাধি বলা হয়। যার মূল তাৎপর্য হলো সর্বজন হিতসাধন।

এই লোকায়ত জীবনযাপন যাতে কোনভাবে বিপথে চালিত না হয় তার জন্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অবাক্যতানি বলে অকথনীয় দশটি প্রশ্নের সীমারেখা নির্দেশ করেছেন। অপ্রয়োজনীয় এই দশটি প্রশ্ন হলো : (১) জগৎ কি নিত্য (২) জগৎ কি অনিত্য (৩) জগৎ কি সসীম (৪) জগৎ কি অসীম (৫) আত্মা ও দেহ কি এক (৬) আত্মা ও দেহ কি ভিন্ন (৭) সত্যদ্রষ্টা কি মৃত্যুর পর ও বেঁচে থাকেন (৮) সত্যদ্রষ্টা কি মৃত্যুর পর আর কোথাও থাকে না (৯) মৃত্যুর পর সত্যদ্রষ্টা থাকেন আবার নাও থাকেন কি (১০) সত্যদ্রষ্টা বেঁচে থাকেন না, আবার বেঁচে যে থাকেন না, তাও নয়? এখানে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বুদ্ধদেব জটিল এই সকল প্রশ্ন অকথনীয় বলেছেন অর্থ এই নয় যে বুদ্ধদেব আত্মা ও ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রশ্নে নীরব ছিলেন। এখানে অকথনীয় অর্থ অপ্রয়োজনীয় কিন্তু আধুনিক চিন্তাবিদদের কেউ কেউ রঙিন কাঁচে ভিন্ন অর্থে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায়[৪১] "বুদ্ধ কোন কোন বিষয়কে অকথনীয় (=অব্যাকৃত) বলিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্মে অনভিজ্ঞ কতিপয় উৎসাহী ভারতীয় লেখক উক্ত বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বলিতে চাহেন যে, বুদ্ধ ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। তদ্ধেতু এই নীরবতার অর্থ ইহা নহে যে, বুদ্ধ উহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধের অকথনীয় বিষয় সমূহের সূচীপত্র সম্পর্কে অজ্ঞ এই লেখক সম্প্রদায় তাহার প্রকৃত বক্তব্য গোপন করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত বাক্য নিজেরাই এ বিষয়ে সংযোগ করিয়াছেন।”

সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই সকল কিছুর বিচার হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। যখন সংস্কারের বেড়াজালে আটকে থেকে বেদবাদের প্রভাব কিছুটা স্তিমিত। জাতিভেদ প্রথা, পূজা-পাঠ, পুরোহিতদের প্রতি মোহভঙ্গ প্রবল করে তুলেছিল প্রতিবাদ। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দ্বিবিধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সনাতন পন্থীদের প্রচেষ্টা যা প্রতিফলিত হয় উপনিষদ সমূহে, এক নতুন ধর্ম আন্দোলন হিসেবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন উপনিষদে বেদনিন্দা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে বেদবাদ এখানে কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় নি। বরং যুগোপযোগী করে তত্ত্বগত ব্যাখ্যায় বেদবাদকেই সঞ্জীবিত করে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যে নিষ্ঠাবান প্রবক্তাগণ নবোদ্ভূত ধর্মীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম বজায় রাখলেন। এঁদেরকে নাম দেওয়া হলো বিধর্মী, নাস্তিক, বেদ বিরোধী বলে। এই দুটি ধারাই পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয় ভাববাদী ধারা ও বস্তুবাদী ধারা হিসেবে।

বুদ্ধদেবকে যে কেবল উপনিষদ পন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাই নয়। লোকায়ত ধারায় ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিন্তার ছড়াছড়ি ছিল। স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, আজীবক ইত্যাদি সম্প্রদায় পরিমণ্ডলকে ধোঁয়াস করে তোলার চেষ্টা করছিল।[৪২] বুদ্ধদেব বস্তুবাদী ধারাকে গতিমুখ করে তুললেন। তাই বুদ্ধদেবকে কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন চার্বাক[৪৩] বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কথিত আছে বুদ্ধদেবের মূল শিক্ষা লোকায়ত আচার্যর কাছেই।[৪৪] শৈশব কৈশোরের লোকায়ত শিক্ষাই বুদ্ধদেবের জীবনের গতি নির্দেশ করে দেয়। সংস্কার ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়ে সনাতন পথকে আশ্রয় করে তিক্ত অভিজ্ঞতায় শেষ পর্যন্ত তা বর্জন করতে বাধ্য হন। শিষ্যদের স্পষ্ট

নির্দেশ দেন তিনি—জর্জর মানুষকে সনাতন ধর্মের কথা বলার অর্থ, তাদের বিভ্রান্ত করা। জীবন থেকে দুঃখের মূল বিনাশ করতে হবে। বুদ্ধদেব তাঁর জ্ঞানচর্চা শুরু করেন মানুষের গঠন ও প্রকৃতি থেকে। সুস্থ শরীরই সুস্থ মনন দেয়, সুস্থ মননই সুস্থ দর্শন দেয়, আধুনিক বিদ্বান চেরবাটস্কি এইভাবে অনুরূপ সিদ্ধান্তে পেঁাচেছেন তাঁর গ্রন্থে।[৪৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে যা তা হলো—বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থ লিখে যান নি। তিনি মুখে মুখে বাণী প্রচার করেন—সেই বাণী মুখে মুখে ঘুরতে ফিরতে লোকায়ত রূপ নেয়। তাঁর সার কথা জগতের সকল কিছুই অস্থায়ী। শরীর মনের চর্চায় নিজেই নিজের মুক্তি অর্জন কর। অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মুক্তিলাভের উপায়। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় কোন সমস্যা উপস্থিত হয় নি। তা দেখা দিল অন্তর্হিত হওয়ার পর। বুদ্ধদেব নির্দেশ দিতেন লোক সাধারণের মধ্যে যেতে হলে লোক সাধারণের ভাষায় কথা বলতে হবে। শিষ্যগণ তাঁর বাণীগুলিকে সেই অনুযায়ী মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলিকে পিটক বলা হয়। পিটক কথার অর্থ পেটি বা ঝাঁপি। এই পিটকগুলিতেই প্রাচীন বৌদ্ধমতের নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। এরা ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ত্রিপিটক হলো—বিনয় পিটক, সূত্তপিটক ও অভিধম্ম পিটক। বিনয় পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণের নিয়মাবলীর কথা বলা আছে। সূত্ত পিটকে সরস গল্পের আঙ্গিকে বুদ্ধদেবের উপদেশ সংরক্ষিত আছে। আর অভিধম্ম পিটকে আছে দার্শনিক আলোচনা।

কালে কালে শিষ্য পরম্পরায় বৌদ্ধদর্শনের নানা বিভ্রান্তি ঘটলেও আদি বৌদ্ধদর্শন তাঁর প্রচারিত আর্যসত্য চতুষ্টয়ের মাধ্যমেই জানা যায়। এই আর্যসত্য চতুষ্টয় যে তৎকালীন সমাজ-পরিস্থিতির প্রভাব একথা নানান চিন্তাবিদ তুলে ধরেছেন। বুদ্ধ এই আর্যসত্য তৎকালীন প্রচলিত লোকায়ত মত থেকেই গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ হলো তৎকালীন চিকিৎসা শাস্ত্র। সেই সময়ের চিকিৎসা শাস্ত্রে ও অনুরূপ চারটি অঙ্গ বর্তমান। রোগ, রোগের হেতু, রোগমুক্তি অর্থাৎ আরোগ্য ও আরোগ্য লাভের

উপায়। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের চারটি সুস্পষ্ট বিভাগ যেন আর্যসত্য চতুষ্টয়ের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে।[৩৬]

আধুনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও স্পষ্ট করেই বলেছেন যে আদি বৌদ্ধদর্শনে সুসংহত অধিবিদ্যাগত দার্শনিক চর্চার অনীহা বিশেষ প্রকট, সর্বাধিক মনোযোগ সংহত ছিল কেবল আর্যসত্য চতুষ্টয়ের উপর।[৩৭] আর্যসত্য চতুষ্টয় মূল বৌদ্ধ দর্শনের চাবিকাঠি স্বরূপ। এর মূল বক্তব্য হল—**সর্বম্ অনিত্যম্**। সকলই অনিত্য। অনিত্যতাই স্বাভাবিক নিয়ম। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। জীবন ও জগৎ হলো উৎপত্তি ও বিনাশের বিরামহীন প্রবাহ। জন্ম ও জীবনই দুঃখের কারণ। জরা-মরণই দুঃখ। কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো জীবন ও জগৎ। এই কার্য-কারণ তত্ত্বই প্রতীত্যসমুৎপাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদই ধর্ম। ধর্ম শব্দটি মূল বৌদ্ধদর্শনে ব্যবহারিক অর্থেই গৃহীত। অর্থাৎ ধর্ম শব্দটি এখানে অন্যান্য শব্দ যেমন বস্তু, দ্রব্য, পদার্থ কার্য-কারণ ইত্যাদির সমার্থক। প্রতীত্য-সমুৎপাদ অনুযায়ী সকল কিছুই প্রতীত্যসমুৎপন্ন এবং সৎ। বৌদ্ধমতে প্রত্যেক সৎ বস্তুই অনিত্য। জগতে কোন কিছুরই স্থায়ী সত্তা নেই। যে কোন ধর্মের উৎপত্তিই কারণ নির্ভর। যার উৎপত্তি আছে, তার বিনাশও আছে। ফলে সকল ধর্মই উৎপত্তি ও বিনাশ সম্পন্ন। উৎপত্তি ও বিনাশ পরিবর্তন সূচক। অতএব জগৎ একটি বিরামহীন পরিবর্তনের প্রবাহ। বৌদ্ধমতে এই জগৎ—**রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস স্পর্শত্ব আয়তনানি**। অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণের সমষ্টি হয়ে বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষের ধারণায় এই সকল বস্তু স্থির। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুশীলন করলেই দেখা যাবে যে প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। প্রতিক্ষণেই নতুনের আবির্ভাব হচ্ছে। এই জগৎ অসংখ্য ক্ষণিক বস্তুর প্রবাহ। বৌদ্ধ পরিভাষায় এই ক্ষণের প্রবাহ হলো সন্তান। **সর্বং ক্ষণিকম্** বলতে জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক। অর্থাৎ সকল ধর্মই ক্ষণস্থায়ী। কোন ধর্মই দুই ক্ষণে একরূপ থাকে না। নিত্য-নতুন-রূপ পরিগ্রহণ করে। আর যা ক্ষণস্থায়ী তা দুঃখ উৎপাদক। তাই জরা মরণের অনিবার্য দুঃখ কেউ এড়াতে পারে না। বৌদ্ধ দর্শনে এই তত্ত্ব ক্ষণিকবাদ নামে চিহ্নিত। এখন প্রশ্ন সৎ বস্তুমাত্রেই যদি ক্ষণিক ও অনিত্য হয় তো লোকায়ত জীবন অচল

হয়ে পড়ে। কারণ উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি বিনাশ হয় তো লোক ব্যবহার অসম্ভব। বৌদ্ধ মতে উৎপন্ন বস্তু পরমুহূর্তে বিনষ্ট হয় ঠিকই। কিন্তু বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশক্ষণেই অন্য একটি সদৃশ বস্তুর জন্ম দেয়। আমাদের অজ্ঞান বশতই এই প্রবাহকে নানাভাগে ভাগ করি। এই ভাগ প্রত্যয়সিদ্ধ। বিশ্বাসযোগ্য—এই ভাগকে অবলম্বন করেই লৌকিক জীবন চলে। কিন্তু এই প্রত্যয়সিদ্ধ ভাগকেও পুনরায় বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে ভাগ করা যায়। এই ভাগ করতে করতে সর্বশেষ ভাগে পেঁছোনো সম্ভব। যাকে লৌকিকভাবে আর ভাগ করা যাবে না। এই অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম ভাগই বৌদ্ধদর্শনে 'ক্ষণ' রূপে চিহ্নিত। এই ক্ষণই অস্তিত্বশীল। নানা ক্ষণের প্রবাহকেই আমরা দ্রব্য বলি। লোক ব্যবহার সকল দ্রব্যই প্রমাণগম্য ও প্রত্যয় সিদ্ধ। তাই বৌদ্ধ মতে বলা হয়—**অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণং সৎ।** প্রমাণ সিদ্ধ হতে গেলে বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকা দরকার। উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী প্রমাণ সিদ্ধ সত্যই মানবজীবনের উপকরণ। অতএব বৌদ্ধ মতে ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী বস্তুমাত্রেই সৎ। যা প্রমাণসিদ্ধ তাই সৎ ও সত্য। মানব জীবনে যা অনুপকারী তা বৌদ্ধমতে অনর্থক ও আলোচনার অযোগ্য। সুতরাং লৌকিক প্রমাণসিদ্ধ জীবনও জগতের সঙ্গে যা অসঙ্গতি পূর্ণ অর্থাৎ যা প্রমাণের অতীত যেমন অলৌকিক তত্ত্ব ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ধর্মবাদের অলৌকিক দিক, বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা বৌদ্ধ দর্শনে অস্বীকৃত। তাই বৌদ্ধ দর্শনে একমাত্র লৌকিক প্রমাণ গম্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষও অনুমান সিদ্ধ মাত্রই সৎ রূপে স্বীকৃত। যাবতীয় বস্তুর মত মানুষ জীবনও বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধ বর্তমান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চার মহাভূত রূপের অন্তর্গত। বিজ্ঞান হলো মন বা চেতনা। বেদনা হলো সুখ-দুঃখের অনুভূতি। সংজ্ঞা হলো হুঁশ। সংস্কার হলো বাসনা। পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি এই ব্যক্তিজীবনে তাই দুটি উপাদান থাকে নাম ও রূপ। মানসিক অংশ হলো নাম, আর জড় অংশ হলো রূপ। চক্র, দণ্ড, অশ্ব, সারথী প্রভৃতি অংশ নিয়ে যেমন রথ, অথচ রথ বলতে কেবলমাত্র চক্র, দণ্ড, অশ্ব বা সারথী নয়, তেমনি আত্মা বলতে বোঝায় পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টিই। ফলে শরীর অতিরিক্ত আত্মা বলে কোন

স্বতন্ত্র দ্রব্য নেই। বুদ্ধদেবের এই মতবাদ অনাত্মবাদ বা নৈরাত্মবাদ রূপে চিহ্নিত।

বুদ্ধদেবের মতে—**সর্বম্ অনাত্মম্**। এই অনাত্মবাদ **অনিত্যবাদেরই** ফলশ্রুতি। বুদ্ধপূর্ববর্তী ও সমকালীন সমাজে বিশেষ করে উপনিষদে ঋষিগণকে সনাতন আত্মতত্ত্বের প্রচারক রূপে দেখা যায়। তেমনি ভূতবাদী লোকায়ত দার্শনিকদের দেখা যায় সনাতন আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে। অর্থাৎ সমকালীন আত্মবাদ দুভাগে বিভক্ত ছিল। ইন্দ্রিয়গোচর আত্মা রূপী ও অতীন্দ্রিয় আত্মা অরূপী। কিন্তু বুদ্ধদেব এক স্বতন্ত্র স্বকীয় পরিভাষায় আত্মাকে ব্যক্ত করলেন তা হলো—সৎকায় দৃষ্টি। সৎকায়ের অর্থ কায়াতে বিদ্যমান। আর এই সৎকায় আত্মা যা প্রত্যক্ষগোচর, বুদ্ধদেব এইভাবে আত্মতত্ত্বকে দৃষ্টির দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। যার ফলশ্রুতি হলো তাঁর মতে এ জগতে কোন শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব নেই। কাজেই শাশ্বত সনাতন আত্মার অস্তিত্বও থাকতে পারে না। তা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কারণ যা কিছু অধি মানস তা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। বুদ্ধদেব দু প্রকার ধর্মের কথা বলেছেন বাহ্য ও মানস। রূপ রস প্রভৃতি ধর্মগুলি বাহ্য এবং অনুভূতি, ধারণা সংস্কার ও বিজ্ঞানের ধর্মগুলি মানস। মানস ধর্মগুলি আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু পরিবর্তন অতিরিক্ত সনাতন স্বতন্ত্র আত্মা কখনোই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। তেমনি বৌদ্ধমতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কারণ ঈশ্বর অপ্রামাণ্য ও অনস্তিত্বশীল। বৌদ্ধ দর্শনে তাই ঈশ্বর আলোচনা সর্বৈব পরিত্যক্ত।

আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা অর্থাৎ সনাতন অতীন্দ্রিয় আত্মায় বিশ্বাস না করলেও বুদ্ধ কর্মবাদ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ধর্ম শব্দটির মত কর্ম শব্দ সম্পর্কেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধদেব কর্ম বলতে এখানে বুঝিয়েছেন ক্রিয়া। বৌদ্ধ দর্শনে তাই চিন্তা, প্রবৃত্তি, বাক্য, দৃষ্টি, সংকল্প ও কর্ম শব্দ সমার্থক। বৌদ্ধমতে যে কোন জীবের কর্ম তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলপ্রসূ কর্মই মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করে। প্রচলিত প্রবাদ বাক্য হলো, যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফলভোগ করে। জীবের পূর্বের কর্মই বর্তমান সত্তার কারণ, আর বর্তমান সত্তা হলো ভাবী সত্তার কারণ। তাই বৌদ্ধ দর্শনে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর স্বীকৃত। জীবের বর্তমান সত্তা দুঃখময়,

কার্যকারণ শৃঙ্খলের নিয়মেই এসব ঘটে চলেছে। কার্য-কারণ-শৃঙ্খলই প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর প্রতীত্যসমুৎপাদই ধর্ম। ধর্মমাত্রেই সৎ ও সত্য। এ সম্পর্কে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জীবের দুঃখময় সত্তার আদি কারণ। আর্যসত্য চতুষ্টয়ের জ্ঞানের অভাবই মানুষকে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু মানুষ অবিদ্যামুক্ত হলে, তার দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে। এই দুঃখ নিবৃত্তিই নির্বাণ।

নির্বাণ শব্দের অর্থ হলো নির্বাপিত হওয়া বা নিভে যাওয়া। পালি ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপদে বলা হয়েছে, নির্বাণ হলো এক পরম সুখ। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ একে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, **নির্বাণং পরমং সুখম্**। মূল বৌদ্ধশাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লেখিত প্রতীতসমুৎপন্ন নাম-রূপ যা জীবন বা প্রবাহরূপে চিহ্নিত। সেই জীবনে দ্বাদশ নিদান সর্বস্ব আবদ্ধ তৃষ্ণার যে আকর্ষণ তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিই হলো নির্বাণ। এক কথায় অনাবিল আনন্দের অবস্থাই নির্বাণ। বুদ্ধদেবের জীবনাচরণে আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব যেমন অত্যন্ত ভোগবিলাসসর্বস্ব জীবনের ঘোরতর বিরোধী তেমনি শরীরনিগ্রহ সর্বস্ব জীবনবিমুখতারও তিনি ঘোরতর বিরোধী। বিচার-বিবেচনা জ্ঞান-বুদ্ধির জীবন ও জগতই বৌদ্ধ দর্শনে শ্রেয় এবং প্রেয়। বুদ্ধ-দেবের জীবনকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট হলো প্রজাতন্ত্রে জন্ম ও প্রজা-তন্ত্রেই মৃত্যু। শাক্য প্রজাতন্ত্রে জন্ম ও মল্ল প্রজাতন্ত্রে মৃত্যু। বুদ্ধদেবের দার্শনিক ভিত্তিও সেইরূপ। জীবন ও কর্মের, জগৎ ও ধর্মের দ্বন্দ্বাত্মক নিয়ন্ত্রিত রূপই স্বাধীনতা। তাই বুদ্ধদেবকে দেখা যায় স্থিতু ও সংরক্ষণকারী স্থিতিস্থাপক বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্লেষিত এই বিচার ধর্ম, যা ক্রান্তিকারী ও বৈপ্লবিক রূপে চিহ্নিত। তিনি বেদবাদ থেকে ভিন্ন মৌলিক দার্শনিকতত্ত্ব ভূতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। সেই মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বই প্রতীত্যসমুৎপাদ। যা তৎকালীন সমাজ সংরক্ষক প্রভু সম্প্রদায়কে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণী সমন্বয়ের ইতিহাস। বুদ্ধদেবকেও দেখা যায় তার শিকার হতে। তাঁর এ নিয়ে আক্ষেপও ছিল।[৪৪] পরিণতিতে দেখা যায় রাজা-প্রজা, সম্রাট-বণিক-মহাজন-অভাজন সকলেই তাঁর পতাকার নীচে সম্মিলিত। কিন্তু দুই বিপরীত কখনো মেলেনা, মিলতে পারে না। দ্বান্দ্বিক বাদের এই নিয়ম।

তাই রাজা-প্রজার মধ্যস্থতাকারী বৌদ্ধ ধর্ম শেষ পর্যন্ত শাসকধর্মে রূপান্তরিত হয়। চরম পরিণিত লাভ করে ভাববাদের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের সুপ্রাচীন অতীত থেকে আজও পর্যন্ত এইই পরিণতি।

বৌদ্ধ দর্শনের এই হলো আদিরূপ। বহির্বাস্তবের স্বরূপই হলো বৌদ্ধ-দর্শনের মৌল বিষয়। তারই জন্য এসেছে আর্যসত্য চতুষ্টয় যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের দুঃখমুক্তি। বুদ্ধদেব আশু প্রয়োজন হিসেবে শিষ্যদের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন যে শরাহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর তুলে ফেলে নিরাময়ের ব্যবস্থা করা যখন প্রধান কর্তব্য তখন যেমন শরটি কি দিয়ে তৈরী, কোথা থেকে এলো এসব প্রশ্ন হাস্যকর তেমনি দুঃখজর্জর মানুষের দুঃখ মুক্তির কথা না ভেবে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হওয়া সমান হাস্যকর। অর্থাৎ বুদ্ধদেব এই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর বৌদ্ধ দর্শন আর সেই অবস্থায় টিকে থাকে নি। অবশ্য এই আশঙ্কা বুদ্ধদেব জীবদ্দশায়ই করেছিলেন। এমনকি জীবনের শেষ পর্যায়ে স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও কখনো কখনো সমন্বয় সাধন করতে হয়েছিল। এই বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন সুপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। এখানে একটু বিশদ বিবৃতি তুলে ধরছি।[৩৭]

"বুদ্ধ, দারিদ্র্য ও দাসত্বের মুক্তির বিষয় স্বীয় কার্যসূচীর অন্তর্গত করেন নাই। তথাপি জানা যায়, প্রারম্ভিক সময়ে দারিদ্র্য ও দাসত্বের ভীষণতাকে কিছু হালকা করিবার প্রবৃত্তি বৌদ্ধ ধর্মে বিদ্যমান ছিল। সেই সময় ঋণ-দাতারা সম্পত্তি না থাকিলে দেহ পর্যন্ত খরিদ করিবার অধিকার রাখিত। তদ্ধেতু কতিপয় ঋণী মুক্তির আশায় ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া ছিল। কিন্তু যখন মহাজনেরা বিরোধী হইয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেন, তখন বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

"ঋণীকে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) দেওয়া অনুচিত" (মহাবগগে ১। ৩। ৪। ৮।)

এই প্রকারে দাসদিগকে ভিক্ষু করায় স্বীয় স্বার্থের উপর আঘাত হইতে দেখিয়া দাস-প্রভুগণ যখন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন তখন বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—

"ভিক্ষুগণ" ; দাসকে প্রব্রজ্যা দিবে না।" (মহাবগগে ১। ৩। ৪। ৯)

বুদ্ধের ধর্মাবলম্বী মহারাজ বিম্বিসারের সৈনিকগণ যুদ্ধাভিযানের পরিবর্তে যখন ভিক্ষু হইতে আরম্ভ করিল তখন সেনাপতি ও রাজা খুব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রধানত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত সৈন্যশক্তির উপরই নির্ভর করে। বিম্বিসার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন রাজসৈন্যকে ভিক্ষু করিলে কি দণ্ডার্হ হয়? বিচারকগণ উত্তর দিলেন—'দেব। সেই গুরুর শিরশ্ছেদ করা বিধেয়, অনুশাসকের ভিক্ষু করিবার সময় বিধিবাক্যপাঠকারীর জিহ্বা ছেদন করা উচিত গণ (সংঘ)-এর অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক।'

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট গিয়া ইহার অভিযোগ করিলেন। তখন বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—

'ভিক্ষুগণ। রাজসৈনিকগণকে প্রব্রজ্যা দিবে না।' এই প্রকারে দুঃখসত্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা সংসারে দুঃখহেতুরাশি দূর করিবার যে সমস্যা ছিল তাহার সমাধান হইল। এখন উহার কেবল আধ্যাত্মিক মূল্য রহিয়া গিয়াছে। তথাপি বুদ্ধের দর্শন ধনিক সম্প্রদায়কে বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় শান্ত করিয়াছিল।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি, তৎকালীন দাসত্ব ও দারিদ্র্য দুঃখসত্য উপলব্ধির সাধক ছিল, দুঃখ দূর করা সম্ভব ইহা বুঝাইতে গিয়া বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদে পৌঁছিয়াছেন—ক্ষণিক, তথা হেতুপ্রভব হইলে উহার অবসান সম্ভব। জগতে সত্যপ্রদর্শকগণ দুঃখ কারণ সমূহ অপসারণ করিতে অসমর্থ বুঝিয়া তাহারা উহার অলৌকিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই সিদ্ধান্তকে পুনরায় ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন দেখি না। যা সত্য তা পরিষ্কার করে বলতে হলে দাঁড়ায় বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে সমন্বয় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর সেই বৌদ্ধধর্ম শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে পরিপূর্ণরূপে অতীন্দ্রিয়বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে দুটি বিশেষ ধারা হীনযান ও মহাযান। ভাববাদী মহাযান দর্শন পূর্বেই আলোচিত। এখন আলোচ্য-বিষয় হীনযান। হীনযান সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী নামে পরিচিত। সর্বাস্তিবাদিগণ আবার দুভাগে বিভক্ত, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় অনুযায়ী মন ও জড়বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

বর্তমান। ভাববাদী যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাই কালের প্রয়োজনে সর্বাস্তিবাদী সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়কে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন করতে হয়েছিল। তাঁদের মতে (ক) বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে ভাববাদীদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষই অব্যাখ্যাত থেকে যায়। (খ) বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব না থাকলে বস্তু ও বস্তুর চেতনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। (গ) বাহ্যবস্তু যদি নাই থাকে তো বস্তুর বিভিন্ন চেতনা হয় কি করে? (ঘ) বাহ্যবস্তু যদি নাই থাকল তো বস্তুর ধারণা যে বস্তু অনুযায়ী তা বুঝা যায় না। (ঙ) বস্তু যদি মনই তবে ক্ষুধার সময় বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় কেন? (চ) আর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই যদি না থাকে তো বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষ কি করে হয়? এই সব যুক্তি অনিবার্যভাবে প্রমাণ করে যে চেতনা নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও ত্রুটি যেটুকু তা হলো তাঁদের সিদ্ধান্ত যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান, ঠিকই কিন্তু তাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না। কেবল অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। বিস্ময়ের হলেও সত্য যা তা হলো সৌত্রান্তিকগণ এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে বলেই তার প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব হয়। অনুমান তো প্রত্যক্ষাশ্রয়ী। এই ত্রুটি সৌত্রান্তিক দর্শনকে কালের বিচারে আড়াল করে দিয়েছে। সৌত্রান্তিক দর্শন তাই বাহ্যানুমেয়বাদ রূপে চিহ্নিত। এই সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য দার্শনিক লকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। লক ও অনুরূপভাবে বলেছেন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান তবে তা সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায় না। বাহ্যবস্তু মনের ধারণা বা কপি বা প্রতিরূপ মাত্র। লকের মতবাদ তাই প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলে চিহ্নিত।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বৈভাষিক সম্প্রদায়। তাঁরা যে জড় ও মন উভয়ের বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তাই নয় তাঁরা স্পষ্টভাবেই অগ্রগতি সম্পন্ন যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করেছেন বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব। বৈভাষিক মতে চেতনার বাইরে বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমান এবং তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈভাষিক মতবাদ তাই বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ রূপে চিহ্নিত।

বৈভাষিক সম্প্রদায় স্পষ্টই ঘোষণা করেন বাহ্যবস্তু ভৌতিক। মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারটি ভূত-পরমাণু সংযোগে বাহ্যবস্তুর উৎপত্তি। এই পরমাণু সমূহ মৌলিক, অবিভাজ্য, নিত্য ও অবিনশ্বর। পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মন বা চিত্ত ও পরমাণু সম্ভূত। এই বাহ্যবস্তু ত্রৈকালিকসৎ ও স্বলক্ষণের প্রবাহ। যা অন্যবস্তুতে নেই তাই স্বলক্ষণ অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ। এই স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ যোগ্য। উদাহরণ হিসেবে বলেন ঘট কে প্রত্যক্ষ করি বলেই ঘটের ধারণাটিই যে ঘটেরই মানস প্রতীক তা জানি। অতএব বাহ্যবস্তুকে সরাসরি জানা যায়, তার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্ভব। অভিধর্ম মহাবিভাষা বা অভিধর্মের ভাষা অনুসরণ করেই বৈভাষিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় তিনশ বছর পর এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। অপরপক্ষে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারশ বছর পর। এখান থেকে উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রগতি সম্পন্ন যুক্তি সমূহ উপলব্ধি করাও আমাদের সুবিধে হয়।

কি সৌত্রান্তিক কি বৈভাষিক উভয় সম্প্রদায়ই বুদ্ধ প্রচারিত আর্যসত্য চতুষ্টয়ের মূল রূপকে ধরে রাখার চেষ্টায় তৎপর থেকেছেন। তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে অনিত্যবাদ, ক্ষণিকবাদ, অনাত্মবাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নির্বাণকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা নির্বাণকে কখনোই অভাবাত্মক ও অনির্বচনীয় বলে ব্যাখ্যা করেন নি। সংস্কার মুক্ত চিত্তের নির্বিকার অবস্থাই নির্বাণ। আধুনিক পণ্ডিত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন বৈভাষিক মতে নির্বাণ হলো ঐহিক জীবনের কামনা বাসনামুক্ত সম্পূর্ণ ভাবাত্মক নির্বিকার অবস্থা। সুপণ্ডিত গুণরত্নও সৌত্রান্তিক দর্শন ব্যাখ্যায় বলেছেন, নিরন্তর নৈরাত্ম ভাবনা থেকে জ্ঞান-সন্তান সমূহের উচ্ছেদ ঘটে, তার উচ্ছেদই হলো নির্বাণ।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের থেকে বৈভাষিক সম্প্রদায় বৌদ্ধদর্শনে বাস্তব দিককে প্রকটিত ও কালানুক্রমিক করতে সচেষ্ট হলেও উভয় দর্শনই বৌদ্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন। বুদ্ধদেবকে তথাগতরূপে ঈশ্বর সাজানোর প্রচেষ্টা এই উভয় সম্প্রদায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছেন। অবশ্য এ সবই যুগের প্রভাব। যাকে বুদ্ধ নিজের জীবদ্দশায়ও এড়াতে পারেন নি। আমরা যদি এইসব ব্যতিক্রমী অবস্থাকে এড়িয়ে বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করি তো

বৌদ্ধদর্শনের বস্তুবাদী ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারব। এই আদি অবিকৃত রূপ প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনেই আমরা পাই। পরবর্তী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় যুক্তিবিস্তার করে তাকে কালোপযোগী করে তুলেছেন। উৎকৃষ্ট বৈভাষিক সম্মত গ্রন্থ হলো বসুবন্ধু রচিত 'অভিধর্ম কোষ'। কিন্তু বসুবন্ধু পরবর্তী কালে বিজ্ঞানবাদকে আশ্রয় করেন। তবে অভিধর্মকোষে তিনি বাহ্যবস্তুবাদকে সুশৃঙ্খল বিচার পদ্ধতির সাহায্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ। সর্বাস্তিবাদ অনির্বচনীয় বাদের প্রভাবে চাপা পড়ে যায়। ক্ষীণকায় ধারণ করে। প্রায় দশ বছর পর শুভগুপ্তের প্রচেষ্টায় সর্বাস্তিবাদ আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে তিনি বৈভাষিক দর্শনের উপর 'বাহ্যার্থ-সিদ্ধি' নামে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটি ছন্দে লিখিত। যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কুমারিলের শ্লোকবার্তিকের। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ভাববাদ খণ্ডন। শুভগুপ্ত তাঁর ব্যতিক্রমী ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াও ভাববাদ খণ্ডনে যে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তা আধুনিক বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। ভাববাদ খণ্ডনের সময় আমরা শুভগুপ্তের বাহ্যার্থসিদ্ধিকে আলোচনার বিষয় করব।

জৈনদর্শন ঃ অকলঙ্ক ও অন্যান্য

বৌদ্ধদর্শনে বুদ্ধদেব যেমন নিজস্ব উপলব্ধি বোধির সাহায্যে জেনেছিলেন যে কঠিন কৃচ্ছ্র সাধন ও তপস্যায় কখনোই শ্রেয়োলাভ হয় না, অনুরূপ ভাবে সমসাময়িক জৈন দর্শন ঘোষণা করেছিল বাস্তব জগতের উপর নির্ভর করে নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। আর তার জন্য বৈদিক অনুশাসন, সত্যদ্রষ্টা ঋষির কাছে যাওয়া ঈশ্বর চিন্তা বা অনুরূপ অতীন্দ্রিয় অলীক তত্ত্ব আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। জৈন-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হলো, জয় করা। জি ধাতু সম্ভূত জৈন মানে যিনি সংযমের মধ্য দিয়ে রাগ, দ্বেষ, বাসনা ও ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করেছেন। এক কথায় জিতেন্দ্রিয়ই জৈন। এই জিতেন্দ্রিয়ই জিন নামে অভিহিত। জৈন সাহিত্যে এই রকম চব্বিশজন জিনের উল্লেখ আছে। এরা তীর্থঙ্কর

বা পথ প্রদর্শক হিসেবে খ্যাত। শেষতম তীর্থঙ্কর হলেন মহাবীর। পাটনা শহর থেকে সাতাশ মাইল দূরে বৈশালীনগরে এক ক্ষত্রিয় বংশে তাঁর জন্ম।

ঠিক বৌদ্ধদর্শনের মত জৈন দর্শনও মহাবীরের বাণী প্রচারের সময় অলিখিত ছিল। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জেকবির সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে মন্তব্য করেছেন[৪০] বুদ্ধের সমসাময়িক মহাবীরও কোন ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা যেমন নয় তেমনি কোন বিশেষ সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠা করে যান নি। বরং স্পষ্ট করে বলতে গেলে তিনি একজন ঋষি, জৈন দর্শনের পথ প্রদর্শক। অথচ মহাবীর পরবর্তী সময়ে মহাবীরের নামে জৈন দর্শন অন্তত চুরাশিটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দুটি সম্প্রদায় টিকে থাকে যথাক্রমে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। বৌদ্ধদর্শনের মত অলিখিত জৈনদর্শনকে শিষ্যগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত টেনেছেন। জৈনগণের অধিকাংশই বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজ স্বার্থের সংরক্ষণে যে কোন প্রকার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে ঠিকই কিন্তু নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একচুলও সরতে রাজি নয়। তাই পরবর্তী জৈন দর্শনে যথারীতি বেদবিরোধিতা ও ঈশ্বরবিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অতীন্দ্রিয়বাদের কর্মনির্ভর তত্ত্ব - যা কিনা কালিক প্রভাবের অনিবার্য ফল। তাই আমাদের আলোচনার বিষয় জৈন দর্শনের আদি অকৃত্রিম রূপ।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মত জৈন সাহিত্যের আদি গ্রন্থগুলি অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় লেখা। উত্তরকালে সমকালীন দর্শনের যুক্তিপদ্ধতি খণ্ডনের নিমিত্ত গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। জৈনদর্শনের আদি গ্রন্থ বলতে দু-ধরনের গ্রন্থ, চতুর্দশ পূর্ব ও একাদশ অঙ্গ। কালের প্রভাবে চতুর্দশ পূর্ব অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবল একাদশ অঙ্গ জৈন গ্রন্থের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বর্তমান। একাদশ অঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ প্রকিরণ, ছয় ছেদসূত্র প্রভৃতি। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে প্রাচীন গ্রন্থ সকলই বিলুপ্ত। বর্তমানে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই ফোলান ফাঁপানো কৃত্রিম। এ সবের উপর প্রাচানতম ভাষ্যগ্রন্থ যা পাওয়া যায় তা হলো উমাস্বাতির তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র। তাছাড়া শান্তাচার্য্যর ভাষ্য তর্কবার্তিক,

নেমিচন্দ্রের দ্রব্যসংগ্রহ, মল্লীসনের স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী এবং অকলঙ্কর তত্ত্বার্থরাজ বার্তিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জৈনদর্শনের মূল কথা হলো পরিদৃশ্যমান অনন্তধর্মাত্মক পদার্থময় এই জগৎ সত্য। বস্তুময় এই জগৎ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্বময়। কেননা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় পদার্থময় এই জগতকে জানি। পদার্থময় জগতের যথার্থ ধারণাই হলো জ্ঞান। জৈনমতে জ্ঞান হলো পদার্থের অভ্রান্ত নিঃসন্দিগ্ধ ও যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি। যথার্থ জ্ঞানে কোন প্রকার সন্দেহ বা ভ্রান্তির অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ অবাধিত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তা প্রয়োজন সাধক, সফল উদ্দেশ্যের সহায়ক। জৈন মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধে থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। উভয়ের যে কোন একটির অভাবে জ্ঞান সম্ভব নয়। জৈনমতে জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। যথার্থ জ্ঞান আবার পাঁচপ্রকার যথাক্রমে, মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায়, কেবল। অবধি, মনঃপর্যায়, ও কেবল হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আর মতি ও শ্রুত হলো পরোক্ষ জ্ঞান। জৈন মতে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে আমরা জগতের প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। আমরা বস্তুকে তিনটি উপায়ের সাহায্যে জানতে পারি। তা হলো যথাক্রমে—দূর্নীতি, নয় প্রমাণ। —**সদেব সৎ স্যাৎ ইতি ত্রিধার্থোমিয়তে দূর্নীতি-নয়-প্রমাণ।**[41] সমগ্রের অংশ হিসেবে ভ্রান্তিদর্শন বা চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কিত জ্ঞান হলো দূর্নীতি বা অবৈধ যুক্তি। যেমন যখন কোন বস্তুকে চূড়ান্ত সত্য বলে চিহ্নিত করা ইত্যাদি। আর বস্তু সম্পর্কে সাপেক্ষিকতাসর্বস্ব সিদ্ধান্ত যেমন বস্তুটি সৎ হলো, নয়। কিন্তু যখন বস্তুটি সম্পর্কে বলা হয় বস্তুটি আংশিক সত্য আপেক্ষিক, সর্ত সাপেক্ষ অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করলে হয় প্রমাণ বা বৈধ যুক্তি। জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনন্ত গুণ বিশিষ্ট, **অনন্ত ধর্মাত্মকং বস্তু।**[42] বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সাধারণ মানুষ এক একটি বস্তুকে দেখে বলে বস্তুর পূর্ণজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই জাগতিক বস্তু সকল বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব বস্তুর জ্ঞান অবস্থা নিরপেক্ষ নয়। জৈন দর্শনে তাই বস্তুর জ্ঞানমাত্রই আপেক্ষিকতাবাদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। মূল কথা হলো প্রত্যেক বস্তুর সম্পর্কে আমাদের প্রকাশিত জ্ঞান

সম্ভাবনামূলক। তাই জৈন দর্শনে, জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করার সময় একটি সম্ভাবনা নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয় তা হলো 'স্যাৎ'। 'স্যাৎ' কথার অর্থ চূড়ান্ত কিছু নয়, সব জ্ঞানই অবস্থাসাপেক্ষ সত্য। জৈনদের এই মতবাদ স্যাৎবাদ নামে চিহ্নিত। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সত্যতার প্রতীক স্যাৎ এই শব্দটি বসিয়ে প্রকাশ করলেই প্রত্যেক নয় বা অবধারণ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। এইভাবে মোট সাত প্রকার অবধারণ বা নয় গঠন করা যায়। যেমন **স্যাৎ অস্তি, স্যাৎ নাস্তি, স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ, স্যাৎ অবক্তব্যম্, স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যং চ, স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ, স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ**। জৈন দর্শন অনুযায়ী জাগতিক বস্তু অনন্ত ধর্মগুণ বিশিষ্ট হলেও সকল বস্তুর বর্ণনা কোন না কোন ভাবে এই সাত প্রকার নয়ের কোননা কোনটির অন্তর্ভুক্ত হবেই। বিশেষ ভাবে উল্লেখের তা হলো এই সপ্তভঙ্গী নয় কখনোই মনোগত নয় বস্তুগত। বস্তুর বিভিন্ন বাস্তব অবস্থাই প্রতিফলিত হয়। এর ফলেই আপেক্ষিক সত্য প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন যে আধুনিক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তা অঙ্কুরের আকারে বহুপূর্বে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই জৈন দর্শনেই তা প্রকাশিত। ঠিক অনুরূপভাবে আধুনিক পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের মূল সূত্রের উল্লেখ এই জৈন দর্শনেই পাওয়া যায়। এই জৈনদর্শনের আপেক্ষিকতাবাদ মূলত বস্তুবাদকে সূচিত করে, কোনভাবেই সংশয়বাদ বা ভাববাদকে চিহ্নিত করে না।

জৈন মতে তাই জ্ঞানে প্রকাশিত যাবতীয় বস্তুই সৎ। জাগতিক বস্তুর সত্তা জ্ঞান নিরপেক্ষ। এই বস্তু বা দ্রব্য কি? এর উত্তরে জৈন দার্শনিকগণ বলেন[৪৪], **'গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যমিতি'**। যার গুণ ও পর্যায় বর্তমান তাই দ্রব্য বা বস্তু। অতএব দ্রব্যমাত্রেই সগুণ, অর্থাৎ গুণ ও পর্যায়ের আশ্রয়। দৃশ্যমান জাগতিক বস্তু পরিবর্তনশীল হলেও গুণ ও পর্যায়ের ধারকরূপ দ্রব্য স্থিতিশীল। তাই জৈন মতে পরিবর্তন ও অপরিবর্তন উভয়ই সত্য। দ্রব্য মাত্রেরই তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতি, [৪৫]**উৎপাদ-ব্যয়-ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ**। জৈনগণ সকল মৌলিক দ্রব্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন—জীব ও অজীব। **বোধাত্মকো জীবঃ অবোধাত্মকস্তুজীবঃ**। চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন হলো জীব এবং নিশ্চেতনা বা বোধশক্তিহীন হলো

অজীব। জীব দু প্রকার মুক্ত ও বদ্ধ। অজীব দ্রব্য চার প্রকার—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদগল। পুদগল বা পরমাণু দু প্রকার, অণু ও সংঘাত। জৈন দর্শনে জড় দ্রব্যমাত্রেই পুদগল। জড দ্রব্য দু প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। ঘট, পট ইত্যাদি জড়দ্রব্য হলো স্থূল। এই স্থূল জড়দ্রব্যকে ভাগের পর ভাগ করলে অবশেষে অবিভাজ্য সূক্ষ্ম জড়কণা পাওয়া যায় তার নাম পরমাণু। নিরংশ এই পরমাণু যৌগিক ও নিত্য, উৎপত্তি বিনাশ রহিত। জড় জগতে মৌলিক উপাদান এই পরমাণুসমূহ সগুণ। **'স্পর্শরসবর্ণবন্তঃ-পুদগলাঃ।'** পুদগলমাত্রেই রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শগুণ যুক্ত। পুদগলগুলি সগুণ হলেও এদের কোন গুণগত পার্থক্য নেই। পরমাণু সকল সক্রিয়। **পুরয়ন্তি-গলন্তীতি পুদগলাঃ।** পরমাণু সকল সক্রিয় বলেই পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। এই পরমাণুসমূহে মিশ্রণই স্কন্ধ বা সংঘাত নামে অভিহিত হয়। ক্ষুদ্রতম জড়কণা অণুর সংঘাতের মাধ্যমেই আকার বিশিষ্ট যৌগিক দ্রব্য গঠন করে। গুণগুলি অণুর মধ্যে অব্যক্ত থাকে, সংঘাতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। মন প্রাণ বাক্ ও শ্বাস প্রশ্বাস সকলই জড় থেকেই উৎপন্ন। এই অসংখ্য অণুর সংযোগে গঠিত হয় অসংখ্য বিশেষ স্কন্ধ। এই বিভিন্ন বিশেষ স্কন্ধের দ্বারা বিশ্বজগৎ গঠিত হয়। এই জন্য বিশাল জগৎকে বলা হয় মহাস্কন্ধ। জৈন মতে আত্মা প্রত্যক্ষ যোগ্য এবং দেহকে আশ্রয় করেই থাকে। আমরা প্রত্যক্ষের সাহায্যে যে যার নিজের দেহে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। সুখ দু:খ কামনা বাসনা ইত্যাদি আত্মার ধর্ম। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহীই জীব। দেহের বিস্তার অনুযায়ী চৈতন্যের বিস্তার। তাই প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চেতনার অনুভূতি হয়। পূর্বেই বলেছি জীব দুই প্রকার মুক্ত ও বদ্ধ। কর্ম অনুযায়ী জীব মুক্ত ও বদ্ধ হয়। বদ্ধ জীব দু প্রকার ত্রস বা গতিশীল, স্থাবর বা গতিহীন। কর্ম আট প্রকার, জ্ঞানা-বরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ুষ, নাম, গোত্র ও অন্তরায়। এই আট প্রকার কর্মের জন্য জীবের বদ্ধাবস্থা হয়। অবিদ্যামূলক কর্মের প্রভাবে আত্মার স্বরূপ ঢাকা পড়ে। তাই বদ্ধাবস্থা দুঃখ ও বেদনার অবস্থা। এর থেকে পরিত্রাণই মোক্ষ। আর আত্মার পূর্ণ বিকাশই মোক্ষ। **সম্যগ্ দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রানি মোক্ষমার্গাঃ।** সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞানও সম্যগ্ চারিত্র এই তিন রত্নের সুসমঞ্জস অনুশীলনের দ্বারাই অর্থাৎ এদের সমন্বয়ের ফলেই

মুক্তিলাভ হয়। এর জন্য জৈনদার্শনিকগণ পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখে তেমনি অবিদ্যা আত্মার স্বরূপ ঢেকে রাখে। পঞ্চমহাব্রত পালনে অবিদ্যার বিলোপ হয়, সূর্যের মত আত্মাও স্বজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। তাই মোক্ষ বা মুক্তির অবস্থা হলো অনাবিল আনন্দ বা শান্তির অবস্থা। এই মোক্ষলাভই জৈন দর্শনের মানবজীবনের চরম নৈতিক আদর্শ।

জৈনদর্শন প্রমাণ নির্ভর বলে প্রমাণের অতিরিক্ত সকল কিছুকেই অস্বীকার করে। যেমন জৈন মতে এই প্রমাণসিদ্ধ বস্তুজগৎ ছাড়িয়ে কোন অতীন্দ্রিয় জগৎ নেই। তেমনই অতীন্দ্রিয় আত্মা বা পরমেশ্বরও নেই। জৈন দর্শন তাই নিরীশ্বরবাদী। কারণ ঈশ্বর প্রমাণ সিদ্ধ নয়। অতএব জগৎ ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের কষ্টকল্পনা একান্তই অনাবশ্যক। এইভাবে নানান যুক্তির সাহায্যে জৈনদর্শনে ঈশ্বরবাদ খণ্ডিত হয়েছে।

জৈনদর্শনের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই দর্শন পরিপূর্ণরূপে আদ্যন্ত ভাববাদ বিরোধী। এমন কি শুধু ভাববাদ বিরোধী বলা হলে এই দর্শনকে খাটো করা হবে, কার্যত জৈন দর্শন বস্তুবাদী। কারণ কি জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে, কি তত্ত্ব বিদ্যার দিক থেকে, জৈন দর্শন বস্তুবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে জৈনদর্শন ও অন্যান্য বস্তুবাদী দর্শনের মত স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে বিষয়ের অভ্রান্ত নিঃসন্দিগ্ধ যথার্থ উপলব্ধিই হলো জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দই হলো জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্পর্কেই জ্ঞান উৎপন্ন। বহির্জগতের বস্তুরাজিই জ্ঞানে এসে ধরা পড়ে। জৈনদর্শন বিভিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। বিষয়হীন অভিজ্ঞতা অর্থহীন। আধুনিক চিন্তাবিদ হিরিয়ান্না অনুরূপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মন্তব্য[৪৮] করেছেন এই কারণেই জৈনদর্শন বস্তুতান্ত্রিক। বিশেষ করে জ্ঞানতন্ত্রের ক্ষেত্রে জৈনদর্শন সম্প্রদায় অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের থেকেও বাস্তবমুখী ও বিস্তৃত। এইভাবে জৈন দর্শন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও তার ভিত্তিতে অনুমান, শব্দ ইত্যাদিকে জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করায় জগৎতত্ত্ব ও সমানভাবে বস্তুবাদসম্মত।

জৈন তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞানতত্ত্ব নির্ভর। জাগতিক বস্তু জ্ঞানে প্রকাশিত কিন্তু জ্ঞান নিরপেক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতন্য থেকে বস্তু স্বতন্ত্র হলেও বস্তুর স্বরূপ চৈতন্যে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। জগতের প্রতিটি বস্তুই অনন্তগুণ সম্পন্ন অনন্ত ধর্মাত্মকং বস্তু, এই যুক্তি থেকে কখনোই ধারণা করা ঠিক নয় যে জৈন দর্শন বহুত্ববাদী। বহু বস্তুর সত্তা স্বীকার করলেও জৈন দর্শন দ্বৈতবাদী। তাঁরা যাবতীয় জাগতিক বস্তুকে জড় ও অজড় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। জগতে এক নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা বর্তমান। এই নিয়মশৃঙ্খলা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। পুদগল ও অদৃষ্ট শক্তির সমন্বয়ে এই জগৎ সৃষ্ট। এইভাবে জৈনদর্শন পরমাণুবাদী বলে চিহ্নিত। পরমাণুপুঞ্জই জগৎ সৃষ্টির আদি উপাদান। এই পরমাণু সকলের সক্রিয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণে পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ বা সংঘাত ঘটে। এই সংঘাতের অনিবার্য ফল হলো দুটি অণুর সংমিশ্রণ বা দ্যণুক। ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ অণুদের মহাসংঘাতই হলো এই বিশাল জগৎ। এইভাবে জৈন দর্শন সংঘাত স্বীকারের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক নিয়মকেও স্বীকার করেছে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে জৈন তর্কপদ্ধতি যেমন সুপ্রাচীন তেমনই সুপ্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিত অকলঙ্ক ভট্ট জৈন তর্কবিদ্যার উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ফলে জৈন তর্কবিদ্যা জৈন দ্বন্দ্বপদ্ধতিরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। অতএব সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই জৈন দর্শন বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াস চালিয়েছে। এখন প্রশ্ন তবে কি জৈন দর্শনকে আধুনিক বস্তুবাদের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচার করা যাবে? এর উত্তরে বলা যায় যে না, তা সম্ভব নয়। জৈনবস্তুবাদকে বিচার করতে হবে সেই কালের পটভূমিতে। নাহলে সুবিচার হবে না। কারণ আধুনিক বস্তুবাদের আলোকে জৈনশাস্ত্র বিচার করলে জৈন তত্ত্বশাস্ত্রের অনেক দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যাবে। সব প্রশ্নের সম্যক্ উত্তরও মিলবে না। কেননা অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মত জৈন দর্শনও কেবল মানুষের দুঃখ মুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই অন্যান্য অনেক ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের মত তত্ত্ব আলোচনা কখনো মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে নি। তাই বাস্তবমুখী চিন্তাধারা থেকে জৈন দর্শনে যতখানি পুরুষকার প্রকটিত হয়ে দেখা দিয়েছে ততখানি সম্পূর্ণতা নিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে নি। কিন্তু মূলত বেদ উপনিষদেও

দুটি বিশেষ ধারায় জৈনদর্শন যে ভাববাদ বিরোধী এ কথা আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই স্বীকার করেছেন। এখানে তেমনই একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। আধুনিক চিন্তাবিদ হিরিয়ান্নার মতে[46] উপনিষদের মূল দুটি ধারার মধ্যে একটি বাস্তবমুখী ও একটি অবাস্তব কল্পনামুখী। জৈন দর্শন প্রথম ধারার অনুসারী। জৈন দর্শন গতিশীল বাস্তব জগতকে প্রাধান্য দিয়ে তার দর্শন গড়ে তুলেছে। অতএব জৈন দর্শনের যেটুকু সীমাবদ্ধতা তা সমকালের ভিত্তিতে বিচার করলে অভাবনীয় কিছু মনে হবে না।

এতৎসত্ত্বেও যে নানান প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করা যাবে না তা নয়। কেননা জৈন দর্শনও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মত ধর্ম, কর্ম, অনেকান্তবাদ ও অদৃষ্টবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই এই সব বিষয় কোনপ্রকার ব্যতিক্রমী চিন্তার উন্মেষ ঘটাবে না। যেমন ধরা যাক ধর্ম প্রসঙ্গ। জৈনদর্শনে ধর্ম শব্দটি লোকায়ত অর্থে গৃহীত। ধর্ম এখানে বস্তুর গতি, অধর্ম বস্তুর স্থিতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্ম ও অধর্ম হলো গতি ও স্থিতির আশ্রয়স্থল। এখান থেকে এটুকু উপলব্ধি করলে ভুল হবে যে ধর্মই গতি উৎপন্ন করে। না, তা নয়। ধর্ম হলো গতির সহকারী কারণ, ধর্মের আনুকূল্য ব্যতীত গতি সম্ভব নয়। অধর্মও অনুরূপ স্থিতির সহায়ক কারণ মাত্র। এই ধর্ম ও অধর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের ভিত্তিতে জানা যায়। জৈন দর্শন জগতকে জীব ও অজীব দুইভাগে ভাগ করেছে। অজীব আবার চতুর্বিধ—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদগল। এখান থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে জৈন দর্শনে ধর্ম কথাটি লোকায়ত বা বস্তুগত অর্থেই গৃহীত। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও[47] জৈন দর্শনে ধর্ম কথাটি যে লোকায়ত অর্থে গৃহীত তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন ধর্ম কথাটি অস্তিকায় অর্থে ব্যবহৃত। যেমন জল মাছকে চলতে ফিরতে সাহায্য করে তেমনি ধর্ম বস্তুর গতিকে ও অধর্ম স্থিতিকে সাহায্য করে।

ধর্ম ও অধর্মের মত কর্ম শব্দটি ও জৈন দর্শনে বস্তুগত অর্থে অর্থাৎ লোকায়ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্ম শব্দটি ক্রিয়া বা কাজ অর্থে বোঝানো হয়েছে। পুদগল পরমাণুর সংঘাত এই কর্ম জন্যই। জৈনদর্শনে তাকে

কর্মপুদগল না বলে সংক্ষেপে কর্ম বলা হয়। ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ ইত্যাদি কর্মের প্রভাবে জীবদেহে যে রাগ দ্বেষাদি ভাব ঘটে তাই বন্ধনের প্রাথমিক কারণ। এই কর্ম আট প্রকার। এই আট প্রকার কর্মই জীবকে আবৃত করে রাখে। শুভ কর্ম করার ইচ্ছে থাকলেও অন্তরায় কর্ম অশুভ কর্মে প্রবৃত্ত করে। তাই মানুষ দুঃখ ভোগ করে থাকে। জৈনমতে কৃতকর্ম থেকেই একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি ভাবকর্ম রূপে চেতনাকে আবৃত করে, সেখান থেকেই নানারূপ দুঃখ ভোগ হয়। **আস্রবো ভবহেতুঃ সংর্বরো মোক্ষকারণম্।** জীব নিজের অশুভ কর্মের জন্যই বদ্ধ হয় আবার নিজ কর্মের দ্বারাই বন্ধনমুক্ত হয়। চারিত্রিক তিন রত্নের সুসমঞ্জস অনুশীলনের মাধ্যমেই এই দুঃখমুক্তি সম্ভব। জৈনদর্শনে এই কর্মের যে রূপ আমরা পাই তা কার্যত বস্তুজগতই। আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই জৈনদর্শনে কর্মের লোকায়ত প্রয়োগ স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত [৪৮] জৈন দর্শনে কর্মকে একপ্রকার জড়াংশ পুদগল-পরমাণু বলে স্বীকার করেছেন। হিরিয়ান্না [৪৯] ও অনুরূপভাবে জৈনদর্শনে কর্মের লোকায়ত রূপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এমনকি জৈন দর্শনের অনন্ত ধর্মাত্মকং বস্তু কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জৈন দর্শনকে অনির্বচনীয়বাদের প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন কেউকেউ। কিন্তু জৈন দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জাগতিক বস্তু সকল অনন্তগুণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু অনন্তগুণবিশিষ্ট হওয়ায় চূড়ান্তভাবে কোন কিছুকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর মানে এই নয় যে জৈনদর্শন অনির্বচনীয়বাদকেই প্রকাশ করেছেন। অনির্বচনীয়বাদ আসলে ভাববাদেরই চূড়ান্ত রূপ। তা কি করে জৈনদর্শন যা মূলত ভাববাদ বিরোধী তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আমরা আধুনিক চিন্তাবিদ হিরিয়ান্নার[৫০] ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরতে পারি। তাঁর মতে জৈন অনেকান্তবাদ যেমন বস্তুর স্ববিরোধিতাকে সূচিত করে না তেমনি অনির্বচনীয়বাদকেও কোনভাবে নির্দেশ করে না। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও বলেছেন জৈন অনেকান্তবাদের মূল তাৎপর্য হলো কোন কিছুকেই চূড়ান্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না কেননা যে কোন ব্যাখ্যাই সীমার মধ্যে সত্য। অতএব জৈন অনেকান্তবাদ

কে ভিত্তি করে কখনোই জৈন দর্শনকে ভাববাদসর্বস্ব বলে চিহ্নিত করা যায় না।

এরপরও সংশয় থেকে যায়। কেননা জৈন দর্শন অদৃষ্টবাদের প্রবক্তা। কিন্তু জৈন দর্শনকে ঠিক ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনে যে অর্থে অদৃষ্ট কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন জৈন দর্শনে সেই অর্থে অদৃষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। জাগতিক বস্তু সমূহকে জৈনদর্শনে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কখনোই কোন পর্যায়ে অদৃষ্ট শব্দটি নিয়তি অর্থে দর্শনে ব্যবহৃত হয় নি। এখানে অদৃষ্ট হলো নয় দৃষ্ট। জগৎ একটি নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রবহমান। তার কিছু দৃষ্ট আর কিছু অদৃষ্ট। জ্ঞানের অভাবই মানুষকে এই নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি রহস্যাবৃত ধারণা দেয়। সেই রহস্যাবৃত অব্যাখ্যাত ধারণাই হলো অদৃষ্ট। অতএব কোনভাবেই জৈনদর্শনকে ভাবরাদী চিহ্নিত করা যায় না। জৈন দর্শন স্পষ্টত বস্তুবাদী।

যেটুকু স্ববিরোধিতা সাধারণভাবে চোখে পড়ে তা হলো ভারতীয় দর্শন ইতিহাসের আঁকা বাঁকা স্রোতের অনিবার্য ফলশ্রুতি। কালের নিয়মে জৈন দর্শনেরও সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ দর্শনের মত মহাবীরের বাণীও মুখে মুখে প্রচারিত হত। মহাবীরের দেহত্যাগের পর শিষ্যপরম্পরায় জৈন শাস্ত্র লিখিত হয়। তাই উক্ত জৈনদর্শনের মৌলিকত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ করার অবকাশ থেকে যায়। কেননা বৌদ্ধদর্শনের মত জৈন দর্শনও পরবর্তী শিষ্যগণের বিবাদে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুটি সম্প্রদায়ের জৈনদর্শন টিকে থাকে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উক্ত শিষ্য সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ধর্মের আধুনিক অর্থের মোড়ক গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে জৈন দর্শনের আদি অবিকৃত রূপ এক সময় বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে।

আমরা জৈনদর্শনে প্রাচীন গ্রন্থকার হিসেবে উমাস্বাতিকে পাই। তাঁর গ্রন্থ হলো তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র। কিন্তু জৈনমতে আদিতে কেবলমাত্র দু ধরণের গ্রন্থ বর্তমান ছিল, চতুর্দশ পূর্ব ও একাদশ অঙ্গ। চতুর্দশ পূর্ব কালে কালে বিনষ্ট হয়ে যায়। টিকে থাকে কেবলমাত্র একাদশ অঙ্গ। পরবর্তীকালে একাদশ অঙ্গের সঙ্গে দ্বাদশ উপাঙ্গ যুক্ত হয়। এই একাদশ অঙ্গই কারো

কারো মতে হলো দৃষ্টিবাদ। উমাস্বাতির পর জৈনপণ্ডিত হলেন সান্তাচার্য্য, নেমিচন্দ্র, মল্লীসেন, সিদ্ধসেন, দিবাকর, অনন্তবীর্য, প্রভাচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দেবসূরী প্রমুখ। উমাস্বাতির কাল নির্ণয় যেটুকু স্বীকৃত তাহলো খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। তারপর দীর্ঘকাল জৈনদর্শনের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা পাই সান্তাচার্য ও নেমিচন্দ্রকে। কিন্তু বর্তমানে জৈনপণ্ডিত অকলঙ্কভট্টের তত্ত্বার্থরাজবার্তিক নামে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। যা জৈন দর্শনের এক মূল্যবান সম্পদরূপে চিহ্নিত। অকলঙ্কভট্টের কাল হলো খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। তিনি উক্ত গ্রন্থে অত্যন্ত যুক্তি নিষ্ঠ আকারে ভাববাদ খণ্ডন ও পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া ও ষড়্দর্শন সমুচ্চয় গ্রন্থে গুণরত্নের জৈন দর্শন আলোচনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

বৈশেষিক দর্শন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অতীব প্রাচীন দর্শন হিসেবে যে দু একটি দর্শন আধুনিক গবেষকদের বিবেচনায় স্থান পেয়েছে বৈশেষিক দর্শন তাদের অন্যতম। আধুনিক যে কোন পাঠকই বৈশেষিক নামের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায়ের উল্লেখ করবেন। কেননা কালে কালে উভয় দর্শনই সমানতন্ত্র হিসেবে পরি-গণিত। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বৈশেষিক দর্শন ন্যায়দর্শনের থেকেও পূর্ববর্তী, প্রাচীন। এই বৈশেষিক এমনকি চরকেরও পূর্বে রচিত। কেননা চরকসংহিতায় বৈশেষিক সূত্রের উদ্ধৃতি বর্তমান। শুধু তাই নয় সম্পূর্ণ চরক-সংহিতার শরীর বিজ্ঞান বৈশেষিক পদার্থ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[৮১] লঙ্কাবতারসূত্রের পরমাণু-তত্ত্বের উল্লেখ থেকে এই সিদ্ধান্তও করেছেন যে বৈশেষিক সূত্রের কাল বুদ্ধ পূর্ববর্তী হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে বৈশেষিক সূত্র নীরব। যদি বৌদ্ধ দর্শন সমকালে প্রচলিত হত তো আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় একবার না একবার নৈরাত্মবাদের উল্লেখ থাকত। আত্মার ব্যাখ্যায় বৈশেষিক সূত্রে লোকায়ত আত্মতত্ত্বের মত সরাসরি 'আমি' ধারণাকে চিহ্নিত

করেছে। এমনকি এই বৈশেষিক সূত্রে অন্য কোন দর্শন সম্প্রদায়ের তেমন কোন উল্লেখ নাই, মীমাংসা ও মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ আছে মাত্র। তবে এর মানে এই নয় যে মীমাংসা দর্শনের বিশেষ করে জৈমিনির মীমাংসা সূত্রের উল্লেখ আছে। বরং প্রাচীন মীমাংসার কোন এক পর্যায়ের উল্লেখ আছে মাত্র। কারো কারো মতে বৈশেষিক সম্প্রদায় আসলে মীমাংসা সূত্র পূর্ববর্তী প্রাচীন মীমাংসারই কোন এক সম্প্রদায় বিশেষ। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অনুমান করেছেন যে চরক সংহিতার প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির আলোচনা থেকেই ন্যায় দর্শনের উৎস অনুমান করায় বাধা নেই। অবশ্যই ন্যায় দর্শনের প্রকৃত আদি রূপ নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। কিন্তু আধুনালভ্য গ্রন্থ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র। অতএব বৈশেষিক দর্শনে আদি রূপ অন্বেষণে আমাদের পক্ষে চরক সংহিতা পর্যন্ত পিছু হটার কারণ থাকতে পারে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত আরো অনুমান করেছেন যে চরক সংহিতায় সাংখ্য দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন উভয়েরই পরিচয় বর্তমান। কিন্তু তাঁর মতে আয়ুর্বেদের এই আকর গ্রন্থটি চিকিৎসা প্রণালী প্রসঙ্গে সাংখ্যর তুলনায় বৈশেষিক মতই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও চরক সংহিতায় বিশেষত সামান্য ও বিশেষ এই দুটি পদার্থের অর্থ আধুনালভ্য বৈশেষিক দর্শন থেকেপৃথক। কিন্তু এই পার্থক্য পরকালের উদ্ভাবন হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে যে বৈশেষিক দর্শনে আদি রূপ অন্বেষণেও কি আমরা চরক সংহিতা পর্যন্ত পিছু হটতে পারি? অবশ্যই এই প্রসঙ্গে বহু সমস্যা উঠতে বাধ্য। তবুও এখানে মন্তব্য করা যেতে পারে যে বৈশেষিকের উৎস আয়ুর্বেদের মূল দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে। অন্বেষণ সাপেক্ষ কিনা এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বর্তমান। বৈশেষিক দর্শনের কালাকাল নিয়ে আমরা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্ধৃতি[৮২] এখানে তুলে ধরতে পারি। তাঁর মতে "বৈশেষিক লইয়া আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠার রকম। আমরা তো অত পাই নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে—**বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতি-র্বেদে**। সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর একরকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একে-

বারেই নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক একরকম ফিজিকাল সায়েন্স। সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার।”

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেন, আধুনিক বিদ্বান এম, হিরিয়ান্নাও[৮৪] অনুরূপভাবে বলেছেন যে বৈশেষিক দর্শন বেদবিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ন্যায় দর্শনের সঙ্গে সমানতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হওয়ার সময় বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। অতএব এই দর্শন যে বেদবিরোধী ছিল তার প্রমাণ আমরা এই দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচলিত যে কটাক্ষ বর্তমান সেখান থেকেই আঁচ করতে পারি। বৈশেষিক দর্শন প্রতিষ্ঠাতা কণাদের নামেই কটাক্ষ জড়িত। কণাদ মানে কণ ভক্ষ অর্থাৎ কণভুক্, শস্যকণাতে জীবন নির্বাহ করতেন। আবার কণাদ উলূক নামেও খ্যাত। উলূক মানে পেঁচা। তাই বৈশেষিক দর্শনকে ঔলূক্য দর্শনও বলা হয়। শুধু প্রতিষ্ঠাতার নাম নিয়েই যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এতেই শেষ নয়। নানান শ্লোকের মাধ্যমে বৈশেষিক দর্শনকে উপহাস করা হয়েছে। কলাপ ব্যাকরণে উল্লেখ আছে যে—**ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্। হিমবদ্‌গন্তুকামস্য সাগরগমনোপমম্।** অর্থাৎ বৈশেষিক ধর্ম ব্যাখ্যা শঠতারই নামান্তর। কেননা ধর্ম ব্যাখ্যার নামেই কণাদ আসলে ছটি পদার্থ বর্ণনায় ব্যস্ত হয়েছেন, এ আসলে হিমালয় গমনেচ্ছু ব্যক্তির সাগর গমন করার মত। এমনকি বৈশেষিক মোক্ষ সম্পর্কেও কটাক্ষ বর্তমান। সেই কটাক্ষ কতখানি নীচু স্তরের তার উল্লেখ করলেই বোধগম্য হবে। একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো—**বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং বৃণোম্যহম্। ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।** বরং পরজন্মে শেয়াল হয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অনেক শ্রেয়, কখনো বৈশেষিক ব্যাখ্যাত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করব না। এইভাবে দেখা যায় বৈশেষিক দর্শন কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ঘৃণা কুড়িয়েছিল। সুপ্রাচীন এই দর্শন যে বেদবিরোধী ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন ভাবে চাঁদ সদাগরকে শেষ পর্যন্ত বাম হাতে হলেও মনসার পূজা দিতে হয়েছিল তেমনভাবেই হয়ত সমানতন্ত্র চিহ্নিত হওয়ার সময় বেদের প্রাধান্যকে এই বৈশেষিক দর্শনকেও স্বীকার করতে হয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত কণাদের বৈশেষিক

সূত্রই টিকে আছে, অন্যান্য গ্রন্থের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শনের বেদবিরোধিতাসর্বস্ব প্রাচীন ভাষ্য অন্যান্য বেদবিরোধী দর্শনের মত সর্বাংশেই বিলুপ্ত। বেদান্ত দর্শনে বৈশেষিক মত খণ্ডন কালে আচার্য্য শঙ্করের উল্লেখ থেকে জানা যায় লঙ্কেশ্বর রাবণই সুপ্রাচীন বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার। পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য হিসেবে আচার্য প্রশস্তপাদের পদার্থ ধর্মসংগ্রহ অনেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বিজ্ঞান মহলে বিতর্ক আছে। আমরা এখানে আধুনিক বিদ্বান অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের[৭৪] উদ্ধৃতি যা তিনি তর্কালঙ্কার থেকে নিয়েছেন, তা তুলে ধরতে পারি।

"অনেকের মতে প্রশস্তপাদাচার্যের পদার্থ ধর্মসংগ্রহ বৈশেষিক-দর্শনের ভাষ্য, কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। পদার্থ ধর্মসংগ্রহে সূত্র ব্যাখ্যাত হয় নাই। সূত্রের তাৎপর্য সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।" বৈশেষিক দর্শনের উপর অধিক গ্রন্থ না লিখিত হওয়ার তাৎপর্য থেকেই বোঝা যায় বৈশেষিক দর্শন অবজ্ঞাত। কেবল যখন ন্যায় দর্শনের সঙ্গে সমানতন্ত্র পরিগণিত হয় তখন হিন্দু দর্শনের পংক্তিভুক্ত হয়েছে মাত্র। অবজ্ঞা বা অবহেলা যা ছিল তাইই আছে। ন্যায় দর্শনের প্রচার বা প্রসার যতখানি ঘটেছে ততখানি প্রচার বা প্রসার বৈশেষিক দর্শনের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ভবিষ্যতের গবেষণায় এ সবই ধরা পড়বে। আমরা বর্তমানে বৈশেষিক দর্শনের প্রতি কেন এই অবজ্ঞা, উপহাস তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করব বৈশেষিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তুলে ধরে।

বৈশেষিকদর্শনের পেছনে এই সব বাঁকা কথার মূল কারণ হলো বৈশেষিক দর্শনের **'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ'** কথার মধ্য দিয়ে পদার্থ-বর্ণনরূপ প্রতিষ্ঠান বিরোধী অপ্রীতিকর ভূমিকা পালন করার জন্য। বৈশেষিক দর্শন সরাসরি বাহ্য পদার্থের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি লোকায়ত চার্বাক সম্প্রদায়ের মত কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। (প্রসঙ্গত, ধীষণ, পুরন্দর প্রভৃতি পরবর্তী চার্বাক দার্শনিক অনুমানের স্বীকৃতি দিয়েছেন)। কেবলমাত্র এই দুটি প্রমাণ স্বীকারের মধ্য দিয়েও বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণিত। সূত্রকার কণাদ ছটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে সপ্তম পদার্থ হিসেবে অভাব স্বীকৃত হয়। ফলে বৈশেষিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পদার্থই।

জাগতিক যাবতীয় সত্তা সাতটি পদার্থের অন্তর্ভূক্ত। পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ। পদের মাধ্যমে প্রকাশিত বস্তুই পদার্থ। সত্তাশীল বস্তু যাদের ধারণা ব্যতীত কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় তাই পদার্থ। পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানই মানুষকে যন্ত্রণামুক্তিতে সাহায্য করে। সাতটি পদার্থ যথাক্রমে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। দ্রব্য হলো এমন পদার্থ যাতে গুণ ও ক্রিয়া আশ্রিত।

এই দ্রব্য পদার্থ নয় প্রকার। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। প্রথম পাঁচটি আবার পঞ্চভূতরূপে চিহ্নিত। ভৌত পদার্থ এই পঞ্চভূত, মূলীভূত পরমাণুসমূহের সুযোগেই যৌগিক দ্রব্য উৎপন্ন হয় যেমন ঘট, পট ইত্যাদি। জগতের সকল বস্তুই যৌগিক। বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণেই বস্তুর উৎপত্তি। আর বিভিন্ন অংশের বিয়োজনেই বস্তুর ক্ষয় বা বিনাশ হয়। একটি বস্তুকে বিভাজন করলে শেষ পর্যন্ত অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সূক্ষ্ম কণা পাওয়া যায়। খালি চোখে যা দেখা যায় না, তার নাম পরমাণু। সকল পরমাণুর পরিমাণ ও আকৃতি একইরূপ। প্রত্যেক পরমাণুই ধর্ম বিশিষ্ট, যেমন মৃত্তিকা জাতীয় পরমাণুর গন্ধ, বায়ুর স্পর্শ, জলের রস ও অগ্নির রূপ হলো বিশিষ্ট গুণ। ফলে গুণও একটি পদার্থ। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে। বৈশেষিক মতে গুণ আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। এই গুণ হলো চব্বিশ প্রকার যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ। সূত্রকার কণাদ কিন্তু মোট সতের প্রকার গুণের কথা বলেছেন। এই দ্রব্য ও গুণ থেকে ভিন্ন আর এক পদার্থ হলো কর্ম। কর্মের অর্থ গতি বা স্থান পরিবর্তন। দ্রব্যেরই কর্ম থাকে। কর্মের ফলেই জগতে সকল কিছুর সংযোজন ও বিয়োজন হয়ে থাকে। এই কর্ম পাঁচ প্রকার। যথা উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধে নিক্ষেপ করা), অবক্ষেপণ (নিম্নে নিক্ষেপ করা), আকুঞ্চন শরীরের সংকোচন), প্রসারণ (বিস্তার লাভ) ও গমন (স্থানান্তর প্রাপ্তি)। জাগতিক যাবতীয় বস্তু বা প্রাণী বিভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটা সমান-ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত সকলেরই মধ্যে একটা সমভাব রয়েছে তা হলো তারা মনুষ্য পদবাচ্য। এই

রূপ সমান শ্রেণীধর্মই হলো সামান্য। বৈশেষিক মতে সামান্যও একপ্রকার পদার্থ। বিশেষ হলো সামান্যের বিপরীত। পরমাণু ইত্যাদি অবয়বহীন দ্রব্যের পরস্পর ভেদ ব্যাখ্যা করবার জন্য বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে। বৈশেষিক-গণ বিশেষ ছাড়াও আর একটি পদার্থের কথা বলেছেন তা হলো সমবায়। বৈশেষিক মতে জাগতিক বস্তু মাত্রই পরমাণুর সমন্বয়। এই সমন্বয় দুভাবে হয়ে থাকে একটি সংযোগ আর একটি সমবায়। এই দুই প্রকার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ অনিত্য। কারণ বস্তুর সত্তা এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না। দুটি পদার্থের সম্বন্ধ যদি এরূপ থাকে যে একটি অপরটিকে আশ্রয় করে থাকে, অচ্ছেদ্য এই সম্বন্ধকেই বলা হয় সমবায়। বস্তুর বিনাশ ব্যতীত একটিকে কখনোই ভিন্ন করা যায় না। সমবায় হলো এক ও অবিভাজ্য। মহর্ষি কণাদ এই ছয় প্রকার পদার্থের কথাই বলেছিলেন। প্রশস্তপাদই পরবর্তীকালে অভাব হিসেবে সপ্তম পদার্থের কথা স্বীকার করেন। প্রশস্তপাদের মতে বস্তুর এমন এক অবস্থা আছে যাকে ব্যাখ্যা করার জন্য অভাবরূপ পদার্থের প্রয়োজন। যেমন 'পাত্রে জল নেই।' এখানে পাত্রটিকে যেভাবে পদার্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয় পাত্রে জলাভাব ও একটি পদার্থ। পাত্র এখানে ভাবপদার্থ এবং জলাভাব হলো অভাব পদার্থ। ঘরে বস্তুটি নেই, তার অনুপস্থিতি অর্থাৎ অভাব ও প্রত্যক্ষের বিষয়। পরবর্তী বৈশেষিক সমর্থকরা অভাব নামে একটি পদার্থ যোগ করেছেন। অভাব দু প্রকার—অন্যোন্যা-ভাব ও সংসর্গাভাব। দুটি ভিন্ন বস্তুর একটিতে অপরটির অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। যেমন ঘট জল থেকে ভিন্ন। আর একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর সংসর্গ বা সংস্পর্শের অভাবকেই সংসর্গাভাব বলে। এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে যে কার্যের অভাব যেমন ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটের যে অভাব হলো প্রাগভাব। এই প্রাগভাব অনাদি কিন্তু সান্ত। অর্থাৎ প্রাগভাবের আরম্ভ নেই, কিন্তু শেষ আছে। আর ধ্বংসাভাব হলো উৎপন্ন বস্তু যখন ধ্বংস হয়। অর্থাৎ উৎপন্ন বর্তমান ঘটটি যখন ভেঙে যায়। এই ধ্বংসাভাবের আরম্ভ আছে শেষ নেই। কেননা যে ঘটটি ভেঙ্গে গেলো সেই ঘটকেই আর প্রস্তুত করা যাবে না। আর অত্যন্তাভাব হলো কোন বস্তুর

সঙ্গে অপর বস্তুর সংসর্গ যখন কোনকালেই থাকে না। যেমন শশকশৃঙ্গ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোনদিনই শশকের কোন শিং নেই। তাই অত্যন্তাভাবের আদিও নেই অন্তও নেই।

বৈশেষিক দর্শন এই সাত প্রকার পদার্থের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে এই সকল পদার্থই হলো জগৎ সৃষ্টির আদি এবং একমাত্র উপাদান কারণ। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে জগৎ কর্তারূপে ঈশ্বরের ভূমিকার কথা কোনভাবেই উল্লেখ করেন নি। বৈশেষিক দর্শন তাই নিরীশ্বরবাদীরূপে চিহ্নিত। অথচ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত পরবর্তী বৈশেষিক-গণ যথারীতি ঈশ্বরতত্ত্ব আমদানি করেছেন। এই সকল শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় কোনদিন ভেবে দেখার অবকাশও পাননি যে এই ঈশ্বরতত্ত্ব আমদানি বৈশেষিক দর্শনের ক্ষেত্রে কতখানি বেমানান বা পারম্পর্যহীন। আসলে এই শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায়ের মৌল পাঠক্রম হলো শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণ। কালক্রমে তাই নিরীশ্বরবাদী বৈশেষিক দর্শনকেও ঈশ্বরবাদী মতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। আর তা যে কোন অংশে সুপ্রযুক্ত নয় তার প্রমাণ ইতিপূর্বেই পাঠকসাধারণ পেয়েছেন। বৈশেষিক দর্শন বরং কোন অংশেই ভাববাদী নয়, কারণ এই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অস্তিত্বশীল বস্তুজগৎ। আর তার জন্য অতীন্দ্রিয় কোন বিষয় সম্পর্কেই কোনরূপ উৎসাহ দেখানো তো দূরের কথা এমনকি উদাসীন না থেকে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেছেন। এইভাবে বৈশেষিক দর্শন সর্বাংশেই ভাববাদ বিরোধী।

ভারতীয় দর্শনের পাঠকমাত্রেই প্রশ্ন করতে পারেন যে বৈশেষিক দর্শন নিরীশ্বরবাদী হলেও কি ধর্ম জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু নয়? এমনকি ধর্ম ব্যাখ্যায় অদৃষ্ট স্বীকার করে নিয়তিবাদকেই কার্যত রূপায়িত করেন নি? এর উত্তরে বলা যায় বৈশেষিক দর্শন নিয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যেই বিতর্ক বর্তমান। যেমন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও এম, হিরিয়ান্না দুজনেই বৈদান্তিক হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত করেছেন বৈশেষিক দর্শন সম্পর্কে। যেমন [৮৫]হিরিয়ান্না যখন বলছেন যে বৈশেষিক দর্শন বেদ বিরোধী হিসেবেই চিহ্নিত, পরবর্তীকালে বৈদিক আখ্যাত হয়েছে, তখন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[৮৬] বলেছেন বৈশেষিক দর্শন মূলতই

বৈদিক। বৈদিক কি অবৈদিক আমাদের আলোচনার বিষয় কিন্তু তা নয়। কারণ বেদেও দুপ্রকার দর্শনের দ্বন্দ্ব সুপ্রকট। একটি প্রকৃতিবাদ ও অপরটি প্রকৃতিবাদবিরোধিতা বা অতীন্দ্রিয়বাদ। সেই অর্থেই বৈশেষিক দর্শন কোন দিকে? বিদ্বান হিরিয়ান্নার ইংগিত হলো বৈশেষিক দর্শন অতীন্দ্রিয় বৈদিক-ধারার বিরোধী, যেমন করে লোকায়ত দর্শন সম্প্রদায় বর্তমান। ঠিক অনুরূপভাবে অধ্যাপক দাশগুপ্ত বৈশেষিক দর্শনকে বৈদিক বললেও তা যে কোন অংশে বৈদিক-বেদান্তসদৃশ একথা কখনোই বলেন নি। অর্থাৎ কর্মকাণ্ড প্রধান বৈদিক দিককেই সূচীত করেছেন।

এখন প্রথম প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করা যাক। যেমন বৈশেষিক দর্শন তো ধর্মজিজ্ঞাসা দিয়েই শুরু। এর উত্তরে বলা যায় ধর্ম শব্দটিকে যদি আধুনিক অর্থে ধরা হয় তো পাঠক সাধারণের ধাঁধার উপস্থিত হতে পারে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত[৮৭] পর্যন্ত প্রচলিত প্রবাদকে তুলে ধরে মন্তব্য করেছেন যে ধর্ম ব্যাখ্যা প্রথমত বিসদৃশ ও অযৌক্তিক মনে হয়। এখান থেকেই প্রমাণিত হয় বৈশেষিক দর্শনের ধর্ম কথাটি কখনোই অতীন্দ্রিয়বাদ সর্বস্ব অর্থে গৃহীত হয় নি। বরং পদার্থ ব্যাখ্যায় ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ এখানে ধর্ম বলতে পদার্থ ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে। যে কথা অধ্যাপক দাশগুপ্তও স্বীকার করেছেন। অতএব বৈশেষিক দর্শনের ধর্ম ব্যাখ্যা কোন অর্থে স্ববিরোধিতা নয়। লৌকিক বস্তুগত অর্থেই বৈশেষিক দর্শনে ধর্ম চিহ্নিত।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন বৈশেষিক দর্শনে কি অদৃষ্ট স্বীকারের মধ্য দিয়ে নিয়তিবাদকেই স্বীকার করা হয় নি? জৈনদর্শন প্রসঙ্গে বিষয়টি সূত্রাকারে আলোচিত হয়েছে। ধর্ম ব্যাখ্যায় বৈশেষিক দর্শন যাবতীয় বস্তুরাজিকে দু ভাগে ভাগ করেছেন যথাক্রমে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট অর্থাৎ যা কিছু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। আর যা সরাসরি অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না, বোধের বাইরে তাকেই বৈশেষিক দর্শন অদৃষ্ট বলে চিহ্নিত করেছেন। এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও বিজ্ঞান অব্যাখ্যাতকে নানান উপায়ে জানার চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের কালে যখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজকের মত সূচিত হয় নি সেখানে তো এইটাই স্বাভাবিক। অভিজ্ঞতা-লব্ধকে দৃষ্ট এবং তার বাইরের সমস্ত কিছুকে চিহ্নিত করার জন্য একটি

লৌকিক শব্দে অভিহিত করা। অদৃষ্ট সেই অর্থেই বৈশেষিক দর্শনে গৃহীত। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[৫৪] ও এই অর্থকেই চিহ্নিত করেছেন। অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাখ্যাই হলো দৃষ্ট এবং অব্যাখ্যাত অনভিজ্ঞতাই অদৃষ্ট। এই ব্যাখ্যা উপস্থিত করেও অধ্যাপক দাশগুপ্ত অদৃষ্ট শব্দটির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয়বাদের ইংগিত খুঁজে পেয়েছেন। কার্যত পরবর্তী বৈশেষিক শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় অদৃষ্টকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করতে উদ্দিষ্ট হয়েছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্ব আমদানির সঙ্গে সঙ্গে নিয়তিবাদে এই অদৃষ্ট শব্দটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। অতএব এই ব্যাখ্যা শ্রেণী পাঠক্রম সর্বস্ব চিন্তার অনিবার্য ফলশ্রুতি। পাঠক সাধারণকে এটুকু উপলব্ধি করতে কোন প্রকার অসুবিধে হবে না। কেননা বৈশেষিক মুক্তি বা মোক্ষ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃত জ্ঞানের ফলশ্রুতি হিসেবে যা ধর্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়েই সম্ভব। আর ধর্ম হলো সপ্তপদার্থ মাত্র। অতএব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৈশেষিক দর্শন সর্বাংশেই বস্তুকেন্দ্রিক, ভাববাদ বিরোধী।

ন্যায়দর্শন ঃ গৌতম-উদয়ন

ভাববাদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একমাত্র গতি এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অন্তত ন্যায় দর্শনের সবিশেষ চর্চা প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ সম্প্রদায়ই কোন না কোন ভাবে ন্যায় দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এমন কি বেদান্ত ও ব্যতিক্রম নয়।[৫৫] সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে কালক্রমে ন্যায় দর্শন দার্শনিক তাৎপর্যে উন্নীত হয়েছে যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় একান্তই দূরকল্পনা-মূলক ভিত্তি সর্বস্ব। [৬০]ন্যায় কথাটি 'নী' ধাতু থেকে এসেছে। নী'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশক। ন্যায় কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়ঃ। লোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে যে শাস্ত্র নিঃসন্দিগ্ধ যথার্থ জ্ঞানের প্রণালীসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে তাই ন্যায়। এক কথায় ন্যায় শাস্ত্রের কাজ হলো সংশয় নিরসনের জন্য বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে মীমাংসায় অর্থাৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। অতএব প্রমাণের মাধ্যমে বিষয়জ্ঞানের যথার্থতা পরীক্ষণই হলো ন্যায়শাস্ত্র।

ন্যায়শাস্ত্রের অপর নাম 'প্রমাণশাস্ত্র' বা তর্কশাস্ত্র। তর্কর লৌকিক নাম বাদানুবাদ। তাই ন্যায় বাদবিদ্যা ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলেও পরিচিত। শুধুমাত্র প্রমাণের মধ্যেই যদি ন্যায়শাস্ত্র সীমাবদ্ধ থাকত তবে ন্যায় দর্শন নিয়ে কোন প্রকার কোন্দল বাধত না। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র কেবল যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী শিক্ষাই দেয় না, জ্ঞানতত্ত্ব থেকে তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়সলাভ পর্যন্ত ন্যায়সূত্রকার নির্দেশ করেছেন।

নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ নিয়ে বিতর্ক অছে। তবে সর্বাংশে গৃহীত মত হলো ইষ্টলাভ। এখানে ইষ্টলাভ বলতে সকল প্রকার অভীষ্টের কথা বলা হয়েছে, এমনকি মুক্তিও। ন্যায়দর্শনে মুক্তি কি? [61]মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কোন এক অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতের ভাষাপরিচ্ছেদ ব্যাখ্যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলতে চেয়েছেন তা এখানে তুলে ধরলাম। 'গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়, তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গৌতম কহিতেছেন পদার্থ সাত প্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার'। নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ করা হয়েছে যেমন। [62] "নিঃশ্রেয়স কথাটির অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, অভীষ্ট বস্তু। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দার্শনিক গ্রন্থে, শব্দ ব্যবহার করা হয় মুক্তি, মোক্ষ, অপবর্গ, নির্বাণ বা কৈবল্য অর্থে।" ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর নিঃশ্রেয়স ব্যাখ্যায় লিখেছেন নিঃশ্রেয়স দু প্রকার। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হলো দৃষ্ট। আর যে পদার্থ জ্ঞায়মান নয় (নহি কশ্চিৎ পদার্থো জ্ঞায়মানো) অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অদৃষ্ট। প্রাচীন ন্যায় মতে ষোল প্রকার পদার্থ বর্তমান। এই ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ হয়। এইভাবে প্রমাণশাস্ত্র হিসেবে ন্যায়দর্শন জীব ও জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে শেষ পর্যন্ত জীব ও জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পথের নির্দেশ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব যে দর্শন জগতকে জগৎ এবং জীবনকে জীবনরূপে চিহ্নিত করে সে দর্শন তো বিরুদ্ধবাদীদের ঈর্ষা দ্বেষ কুড়োবেই। মহাভারতের শান্তিপর্বে ইন্দ্র-কাশ্যপ সংবাদে তর্কবিদ্যা অনুরক্ত আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়-

দর্শনকে নিরর্থিকা বলে নিন্দা করা হয়েছে। [৬৪]রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলছেন তুমি অনর্থকুশল, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা করছ নাকি? এরা বেদাদি ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করে আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি আশ্রয় করে অনর্থক বিবাদ করে।[৬৪] এখান থেকে প্রমাণিত ন্যায়শাস্ত্র লোকায়ত শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। আর লোকায়ত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নিন্দা-মন্দ সর্বাংশে স্বীকৃত। মহা-মহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও স্বীকার করেছেন যে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়াত শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিনি লিখেছেন[৬৫] "তবে প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্র ও লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকট শুনিয়াছি।......কৌটিল্য লোকায়ত শব্দের দ্বারা ন্যায়-শাস্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। বার্হস্পত্য সূত্রের মত লোকসম্মত—লোক বিস্তৃত।...মূল কথা, রামানুজের কথা, কৌটিল্যের কথা এবং হরিবংশের শ্লোক চিন্তা করিলে প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্র "লোকায়ত" নামেও অভিহিত হইত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।"

শুধু প্রমাণশাস্ত্র হিসেবে নয়, বিশেষ করে ন্যায় দর্শন ততোধিক প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনকে সঙ্গে করে সমানতন্ত্র মর্যাদায় লোকায়ত রূপে তৎকালীন শাসকশ্রেণীর নিন্দিত ও অবদমিত ছিল তার প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্রে বর্তমান। এমনকি প্রবাদের আকারে মুখে মুখে নিন্দা শ্লোক প্রচারিত ছিল। শুধু শাস্ত্র হিসেবে যে ন্যায়-বৈশেষিক নিন্দিত তা নয়, শাস্ত্র প্রণেতা হিসেবে কণাদ ও গৌতম কটাক্ষ হজম করেছেন। গৌতমকে কটাক্ষ করে বলা হত 'গোতম'। গো-তম অর্থাৎ গুরুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নামান্তরে গৌতমকে অক্ষপাদ বা পদাক্ষ বা চরণাক্ষ অর্থাৎ পায়ে চোখ এই শব্দার্থে কদর্থ করা হত। কাব্য-সাহিত্যে এই কটাক্ষ করা হত যেমন দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ নৈষধ চরিতে ইন্দ্রের কাছে চার্বাকের বর্ণনা করতে গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রকে চরম কটাক্ষ করেছেন। **"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্। গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ্থ তথৈব সঃ।"** ন্যায় দর্শনের মোক্ষ মৌক্ষাভিলাসীকে শিলাখণ্ডে পরিণত করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। হে লোক সাধারণ তোমরা বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে যে 'গোতম' নামে জান, তিনি সত্যিই তাই। এখন প্রশ্ন ন্যায়দর্শনের বিরুদ্ধে এই কটাক্ষ কেন? সেকি

লোকায়ত বলে? লোকায়ত মাত্রেই বেদ বিরুদ্ধ বলে? ন্যায়দর্শন কি বেদ বিরোধী?

অন্তত প্রচলিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ন্যায় দর্শন বৈদিক হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু বৈদিক হলে ও ন্যায় দর্শনকে বেদ-স্বতন্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। বেদ-স্বতন্ত্র বৈদিক পর্যায় ভুক্ত। আধুনিক চিন্তাবিদগণের অনেকেই যেমন হিরিয়ান্না সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সকলেই কিন্তু ন্যায় দর্শনকে শ্রুতিসম্মত বলে দাবী করেছেন। কিন্তু সর্বাধুনিক গবেষকদের মধ্যে এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ তো নিশ্চিত ভাবেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ন্যায় দর্শন বেদ বিরুদ্ধ। ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতির ইতিহাসে লোকায়ত দর্শন মাত্রেই বেদ বিরুদ্ধ বলে চিহ্নিত। ন্যায় দর্শন যে লোকায়ত দর্শন হিসেবে সুপ্রাচীন অতীত থেকে প্রচলিত ছিল তা ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেছেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কোন একসময় ন্যায় দর্শন অবশ্যই বেদ বিরোধী ছিল। তাছাড়া বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য যোগ ও বৈশেষিককে সরাসরি বেদ বিরুদ্ধ বলে প্রমাণ করানোর চেষ্টা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শন যদি বেদবিরুদ্ধ হয় সমানতন্ত্র হিসেবে ন্যায়দর্শন কি করে বৈদিক আখ্যায়িত হয়? আধুনিক বিদ্বান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন [৬৬] 'প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে ন্যায় ও বৈশেষিকের প্রভেদকে 'অবান্তর মত বৈলক্ষণ্য' বলা হয়েছে। অতএব প্রশ্ন ওঠে, প্রাচীন আস্তিক ঐতিহ্য অনুসারে বৈশেষিক যদি মূলতই শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় তাহলে ন্যায়কেই বা শ্রুতিসম্মত আখ্যা দেবার প্রকৃত সুযোগ কতটুকু? স্বভাবতই এ প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই হতে পারে। ন্যায় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীতে শ্রুতির প্রতি মৌখিক আনুগত্যের পরিচয় যেমনই হোক না কেন এবং শ্রুতিসম্মত পুরুষার্থ প্রভৃতির গৌরব যে ভাবেই কীর্ত্তিত হোক না কেন—প্রকৃত দার্শনিক বিচারে ন্যায়কে শ্রুতিমূলক বলবার সত্যিই কোন সুযোগ নেই।'

এখন প্রশ্ন ন্যায় সূত্রের যে অংশে বেদ সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি বর্তমান সেই অংশ কি সংশয়াতীত। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশের মত প্রনিধানযোগ্য। তিনি আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন[৬৭] "পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায় সূত্রই যে মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, ইহা ভাষ্যকার বাৎসায়ন প্রভৃতি

আচার্যগণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংশয়েরও সূচনা করেন নাই। কিন্তু এখন কোন কোন ঐতিহাসিক মনীষীর সমালোচনায় ইহাও পাইয়াছি যে, প্রচলিত ন্যায়দর্শনের অধিকাংশ সূত্রই পরে অন্য কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরে রচনা করিয়া সংযোজিত করা হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ে বৌদ্ধমতের আলোচনা থাকায়, উহা বৌদ্ধ-যুগে রচিত এবং মূল ন্যায়শাস্ত্র কেবল হেতুবিদ্যা ; উহাতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন কথাই ছিল না।

পঞ্চাধ্যায় ন্যায় দর্শনই মহর্ষি অক্ষপাদের প্রণীত, এ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদের চিহ্ন না থাকিলেও ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও অনেক সূত্রপাঠে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বহু মতভেদ দেখা যায়। বাৎস্যায়নের পূর্ব হইতেই নানাকারণে ন্যায়সূত্র বিকৃত ও কল্পিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের উদ্ধার করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও যে ন্যায়সূত্রের সংখ্যা ও পাঠ লইয়া বিবাদ ছিল, তাহা বাৎস্যায়নের কথার দ্বারা ও অনেক স্থানে মনে আসে।"

শুধু তাই নয় ন্যায়সূত্রের যে যে অংশে বেদের প্রামান্য প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়, যেমন মোট বারটি সূত্রে, তা অনেকাংশে প্রক্ষিপ্ত। দায়সারা ভাবে কোনরূপে স্বীকৃতি মাত্র। সে কি শুধু হেতু বিদ্যাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য ? এ নিয়ে আধুনিক বিদ্বান অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ন্যায় সূত্রের যে অংশে বেদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে এসেছেন[৬৪] : " এই কি প্রকৃত বেদবিশ্বাস ? নাকি, বেদ বিশ্বাসের প্রতি কোন একরকম নেহাতই মৌখিক আনুগত্য দেখিয়ে কোনমতে তর্কবিদ্যাকে আইন কর্তাদের বিধি-নিষেধ থেকে বাঁচাবার আয়োজন ? বেদকে সত্যিই প্রমাণ বলে মানতে গেলে তাকে অপৌরুষেয় এবং স্বতঃঅভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে। 'ন্যায়সূত্র'কার ও বাৎস্যায়ন তার ধারকাছ দিয়েও যান নি। বাৎস্যায়ন তো সরাসরি বলেছেন **"ন ভিদ্যতে চ লৌকিকাৎ বাক্যাৎ বৈদিকং বাক্যং প্রেক্ষ-পূর্বকারিপুরুষ প্রনীতত্বেন** (ন্যায়ভাষ্য, ৪।১।৫৯)। ফণিভূষণ তর্জমা করেছেন : "পরন্তুপ্রেক্ষাপূর্বকারী অর্থাৎ যথার্থ বুদ্ধিপূর্বক বাক্য-রচনাকারী পুরুষের প্রণীতত্ব-বশতঃ লৌকিক বাক্য হইতে বৈদিক বাক্য

ভিন্ন অর্থাৎ বিজাতীয় নয়।" সরল ভাষায়, লৌকিক বাক্যও যে কারণে প্রমাণ, বৈদিক বাক্যও সেই কারণে প্রমাণ।

তাহলে, সংক্ষেপে বেদের প্রামাণ্য নিয়ে ন্যায়দর্শনের আদি রূপটিতে অতো আস্ফালন মোটের উপর এক রকম মুক্তিপণ বা ransom দিয়ে তর্কবিদ্যাকে কোনমতে বাঁচানো।"

এইভাবে যে ন্যায় দর্শন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করে বেদকে নিমরাজি স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল সেই ন্যায়দর্শনই কালে কালে শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় সুগভীর আত্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল কিভাবে তা নিয়ে পৃথক গবেষণার প্রয়োজন। কিভাবে কতখানি ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ন্যায়দর্শনকে লোকায়ত পরিমণ্ডল থেকে লোকবিরুদ্ধ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সংরক্ষণ উপযোগী করে তোলা হয়েছে ইত্যাদি। শুধু একথা ভেবে শিহরিত হই সেই সময়ে আইনকর্তাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে কিভাবে ন্যায়দর্শন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করেছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষ করে চার্বাক দর্শন যখন রাজরোষে, ধ্বংস বিধ্বস্ত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যই আবার তুলে ধরছি[৩৩]...'চার্বাকরা ধর্মশাস্ত্রকারদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনমতে তর্কবিদ্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন আর নাই করুন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই উন্নত পর্যায়ে আনার দিন যেন ঘনিয়ে আসছে। কেননা, সমগ্র ভারতীয় দর্শনে একমাত্র তাঁরাই সেকালের শোষণ ভিত্তিক সমাজের মূল মতাদর্শের উপর প্রবল আঘাত হানতে চেয়েছিলেন।' বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে জ্ঞান পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় কখনোই অতীন্দ্রিয় জগতসর্বস্ব ভাববাদ নয় বরং ভাববাদ বিরোধিতাই ন্যায়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মত ন্যায় দর্শনেও কালে কালে যেভাবে ভাববাদের গৈরিক রঙ চাপানোর সুপ্রযুক্ত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তা যে মেলানো যায় নি ন্যায় দর্শন ব্যাখ্যায় তার স্বরূপ উপলব্ধি হবে।

প্রাচীন ন্যায় মতে পদার্থ ষোল প্রকার। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। যে প্রণালীর সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই

প্রমাণ। প্রমাণ চার প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান। প্রমেয় হলো জ্ঞানের বিষয়। ন্যায়মতে তার সংখ্যা বারটি। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, ও মোক্ষ। সন্দিগ্ধ অনিশ্চিত জ্ঞানই সংশয়। মানুষকে কর্মে প্রবৃত্তকারী উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজন। সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণসিদ্ধ ঘটনাই দৃষ্টান্ত। সুপ্রতিষ্ঠিত যৌক্তিক উপসংহারই সিদ্ধান্ত। অবয়ব হলো সিদ্ধান্ত সর্বস্ব আশ্রয়বাক্য অর্থাৎ পঞ্চাবয়বই এখানে অবয়ব। তর্ক হলো সাহায্যকারী প্রাকল্পিক যুক্তি। নির্ণয় হলো পরস্পর বিরোধী যুক্তি থেকে নির্ণীত গৃহীত মত। সত্যতা নির্ধারণে নিজ মত প্রতিষ্ঠাই বাদ। নিছক বিবাদ হলো জল্প। পরমত-খণ্ডন সর্বস্ব অপ্রয়োজনীয় বিতর্কই বিতণ্ডা। দোষযুক্ত হেতুই হেত্বাভাস। দ্ব্যর্থবোধক বাক্‌চাতুর্যে প্রতিপক্ষের দোষ দেখানোকে বলে ছল। জাতি হলো ব্যাপ্তি-অপ্রতিষ্ঠ অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি। বিতর্কে পরাজয়ের হেতু হলো নিগ্রহস্থান। এই ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজগতই অভীষ্ট বস্তুলাভের সহায়ক। জ্ঞেয় ও অভিধেয় সত্তাবান বস্তুই পদার্থ। অর্থাৎ পদার্থ মাত্রই সত্তাবান। যার সত্তা আছে, যাকে জানা যায়, নামকরণ করা যায় তাই পদার্থ। আর পদার্থমাত্রেই জ্ঞেয় ও বোধগম্য। এই পদার্থ দু প্রকার ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। অভাব পদার্থ, ভাব পদার্থকে আশ্রয় করেই থাকে। আর সেই রূপেই জ্ঞেয় হয়।

প্রমাণ ব্যতীত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান কখনোই সম্ভব নয়। যার সাহায্যে বিষয় যথাযথভাবে জ্ঞাত হয়, তা হলো প্রমাণ। ন্যায় মতে প্রমাণ চার প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ হলো প্রমাণ জ্যেষ্ঠ, সকল প্রমাণের মধ্যে প্রধানতম, অনুমান, উপমান, শব্দ অন্য সমস্তই প্রত্যক্ষ-নির্ভর। জাগতিক সকল কিছুই জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বর্তমান। বাহ্য বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যে নিশ্চিত জ্ঞান হয় তাই প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার যে প্রক্রিয়া তাই হলো অনুমান। অনুমান দ্বিবিধ, স্বার্থ ও পরার্থ। নিজের জন্য অনুমান হলো স্বার্থানুমান। আর অপরকে বোঝানোর জন্য যে অনুমান তাকে পরার্থানুমান বলে। পরার্থানুমান পঞ্চাবয়ব। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। আর শব্দ হলো কোন বিশ্বাসযোগ্য

ব্যক্তির বাক্য। বাক্যের বিষয়ভেদে শব্দের দ্বিবিধ রূপের কথা নৈয়ায়িকগণ বলেছেন যথাক্রমে দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে আপ্ত বাক্য হলো দৃষ্টার্থ আর আত্মা, পরমাণু প্রভৃতি সম্পর্কে যে বিবরণ তা হলো অদৃষ্টার্থ। পূর্ব পরিচিত কোন বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি নতুন বস্তুর সাদৃশ্য দেখে উক্ত বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার প্রণালীই হলো উপমান। এইভাবে ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচিত।

এই জ্ঞানতত্ত্ব জগততত্ত্ব ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। ন্যায়মতে জগৎ পদার্থের সমন্বয়। এই জগতের অন্তর্ভুক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত। পঞ্চভূত, আকাশ এবং কাল ইত্যাদি। পঞ্চভূতের চারটি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এর প্রত্যেকটিতে আবার দু প্রকার অবস্থা বর্তমান, মৌলিক ও যৌগিক। মৌলিক বলতে বোঝায় প্রতিটি ভূতকে যদি বিভাজন করা যায় তো সর্বশেষ মূলীভূত অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ যাকে পরমাণু বলা হয়। পরমাণুসমূহের যোগেই এই জাগতিক চেতন, অচেতন দ্রব্য নিচয় সৃষ্টি হয়েছে। পরমাণু মৌলিক বলে তা অবিভাজ্য। অক্ষয়, অবিনশ্বর ও অনন্ত। আর জড় পদার্থ পরমাণুসমূহের সংযোগে সৃষ্ট হয় বলে অংশ যুক্ত বিভাজ্য ও বিনাশশীল। এই পরমাণুসমন্বিত বস্তুজগৎ মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র। এই জগৎ সৃষ্টির পেছনে বস্তুগত কারণই বর্তমান। জগতে কোন কিছুই বিনা কারণে ঘটে না। বিশিষ্ট কার্যের বিশিষ্ট কারণ বর্তমান। অসাধারণ কারণই বিশিষ্ট কারণ। কারণ তিন প্রকার যথা নিমিত্তকারণ, সমবায়ী কারণ ও অসমবায়ী কারণ। প্রাগভাবপ্রতিযোগী হলো কার্য। কার্য একটি নতুন সৃষ্টি। কার্য কারণ দুটিই ভিন্ন পদার্থ যদিও তাদের ধর্ম ও ক্রিয়ার পার্থক্য বর্তমান। মহর্ষি গৌতম আত্মার কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত। অর্থাৎ আত্মা ও বস্তুগত। এই আত্মা আমাদের আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয়। চৈতন্য হলো আত্মার আগন্তুক গুণ। তার ফলে প্রাচীন ন্যায়ে সনাতন আত্মার পথ ধরে ঈশ্বরতত্ত্ব আসেনি। মহর্ষি গৌতম যে ষোলটি পদার্থের নাম করেছেন তাতে ঈশ্বর নেই। কেবলমাত্র ন্যায়সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের নামোল্লেখ আছে মাত্র। ঈশ্বর সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনাকে কোনভাবেই স্থান দেননি। তাই প্রাচীন ন্যায় স্পষ্টতই নিরীশ্বরবাদী।

কিন্তু পরবর্তীকালে শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় ঈশ্বর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমদানিকৃত এই ঈশ্বরতত্ত্ব অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ন্যায় দর্শনের ক্ষেত্রেও সুপ্রযুক্ত হয় নি।

এই ন্যায়দর্শন স্পষ্টতই বস্তুবাদ সর্বস্ব। ন্যায়দর্শনে এই বস্তুবাদ নিছক বিশ্বাস বা অনুভূতিসর্বস্ব নয়, যুক্তি তর্ক ও বিচারমূলক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এককথায় ন্যায় দর্শন যুক্তিমূলক বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শন শুধু যে বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্বই স্বীকার করেছে তাই নয় স্পষ্টই নির্দেশ করেছে যে কোন জ্ঞাতার জ্ঞানের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক শূন্য হয়েও বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বর্তমান। অতএব জগৎ সম্পর্কে এই মতবাদ কোন শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, অনুভূতি, বোধ কিংবা শাস্ত্র উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ন্যায় দর্শনেও জীবনের পরম লক্ষ্য মোক্ষ কেবলমাত্র যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই লাভ করা যায়। আর তত্ত্বজ্ঞান তখনই সম্ভব যখন জ্ঞানের স্বরূপ, উৎস, যাথার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সংক্ষেপে তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞানলাভের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞানতত্ত্ব। কিন্তু এই ন্যায় দর্শন নব্যনৈয়ায়িকদের আমদানিকৃত তত্ত্বের দৌলতে স্বরূপে থাকতে পারে নি। কালের নিয়মেই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের পথ বেয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভাববাদ সর্বস্ব দর্শন করে তোলার ঐকান্তিক প্রয়াস কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটুকু প্রমাণিত যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র। উভয় দর্শনই ভাববাদ বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। বিকশিত ভাববাদের বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় ন্যায়-বৈশেষিক ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য বিভাগের থেকে অনেক বেশী অগ্রসর। ন্যায়-বৈশেষিকের এই ভূমিকার সঙ্গে তুলনা হতে পারে কেবলমাত্র বৈভাষিক শুভগুপ্ত ও মীমাংসক কুমারিলের আলোচনার সঙ্গে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ভাববাদ বিরোধী ভূমিকা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে এসে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। আধুনিক বিদ্বান হিরিয়ান্না অত্যন্ত[70] সুন্দর ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বিশেষ করে জৈন পরমাণুবাদ যা অত্যন্ত প্রাথমিক আকারে উপস্থিত হয়েছিল, তাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে উন্নত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এই মন্তব্য করতে গিয়ে হিরিয়ান্না সতর্কীকরণও করেছেন যে

ন্যায়-বৈশেষিক পরমাণুবাদ কোন অংশেই জৈন পরমাণুবাদ ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। বরং বলা যায় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন তার নিজস্ব গতি অনুযায়ী লৌকিক জ্ঞান থেকেই তার জ্ঞানতত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ্যা গড়ে তুলেছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[71] বলেছেন যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন তার সকল তাত্ত্বিক আলোচনাই লৌকিক জগতের বর্ণনা ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া যা সাধারণভাবে সত্য ও বাস্তব বলে চিহ্নিত। দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য ইত্যাদি লৌকিক শব্দ ও ধারণাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে গৃহীত। অনুরূপ তথ্য উপস্থিত করেছেন হিরিয়ান্নাও। তাঁর মতে ন্যায়-বৈশেষিক তত্ত্ব সাধারণের ধারণা থেকে গৃহীত। যার ফলে সাধারণের বর্ণিত স্বতন্ত্র বস্তু সকলকেই যেমন টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দর্শনের বিষয় করেছে। শুধু তাই নয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মূল লক্ষ্যও সাধারণ ধারণারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। ন্যায়-বৈশেষিক কেবল সেই সবের দার্শনিক তাৎপর্য দান করেছে। যেমন মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যে দুটো পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব বর্তমান সেদিক দিয়েও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন ভাববাদ বিরোধী শিবিরের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। হিরিয়ান্না[72] পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মোক্ষ সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী দুটো মতবাদ বর্তমান। একটি মতবাদ অনুযায়ী মোক্ষ হলো সম্পূর্ণত দুঃখ নিবৃত্তি, আর একটি হলো সম্পূর্ণ দিব্যানন্দাবস্থা। ন্যায়-বৈশেষিক প্রথমোক্ত মতবাদের সপক্ষে। এই ভাবে ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র ভারতীয় ইতিহাসে বস্তুবাদী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই প্রতিপালন করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাববাদ খণ্ডন অংশে এই তাৎপর্যের সবিশেষ উপলব্ধি ঘটবে।

সাংখ্যদর্শন ঃ কপিল ও অন্যান্য

প্রাচীনতম শাস্ত্র হিসেবে সাংখ্যদর্শন চিহ্নিত। আমরা এর উল্লেখ ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্য সবেতেই পাই। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন জনিত ফলশ্রুতি হলো এই জাগতিক

বিষয়রাজি। সৃষ্টি ক্রিয়ার এই সাধারণ ধারণা থেকেই এই দর্শনের শুরু। এককথায় প্রকৃতি দর্শনই ক্রমে ক্রমে সাংখ্য দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছিল[৭৪]। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ৭২ নং সূক্তে ও ১২৯ নং সূক্তে সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ উভয়ই উল্লেখিত। আদিতে সৎও ছিল না অসৎ ও ছিল না। পরিদৃশ্যমান কোন জগৎ বৈচিত্র্যও ছিল না। আবার কিছুই যে ছিল না এমনও নয়। বীজের আকারে সকলই আবৃত ছিল। সেই অসৎ থেকেই সৎ বিবর্তিত। এইভাবে ঋগ্‌বেদে আদি পদার্থ চিহ্নিত[74]। সেই অকৃত্রিম, অব্যক্ত আদি পদার্থ থেকেই 'ইয়ং বিসৃষ্টি': এই জগৎ বৈচিত্র্য। সেই আদি অকৃত্রিম পদার্থ আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতি প্রেমিক কবি এই পরিব্যাপ্ত আকাশ বা ব্যোমকেই তাঁর ছন্দের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সৃষ্টি ক্রিয়ার রহস্য। পুরুষ ও প্রকৃতি, প্রকৃতি ও পুরুষ একাকার হয়ে আদিম ধারণায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। সাংখ্য দর্শন সেই লোকায়ত উৎস থেকেই উদ্ভূত।

পুরুষ ও প্রকৃতির এই দ্বৈত তত্ত্ব বেদের শেষভাগে উপনিষদে এসে একত্ববাদের সঙ্গে মৌলিক বিরোধে লিপ্ত হয়। কিন্তু লোকায়ত বোধ বুদ্ধিকে সর্বাংশে এড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে উপনিষদে সাংখ্য মতবাদ নানাভাবে উল্লিখিত। প্রক্ষিপ্ত হলেও সাংখ্য দর্শনের পারিভাষিক শব্দ এবং কপিলেরও উল্লেখ রয়েছে। আর তা করতে গিয়ে সংগ্রহকর্তাগণ যে আপন মাধুরী মেশান নি একথাও হলফ করে বলা যায় না। এ কথার তাৎপর্য ক্রমশই উপলব্ধির বিষয় হবে।

[75]শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে। কপিলের নামের উল্লেখও এখানে রয়েছে। কঠোপনিষদে[76] উল্লেখ আছে যে বিবর্ত ক্রিয়ার আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় সকল পদার্থই নিহিত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে গুণত্রয়ের আভাস বেশ স্পষ্ট[77]। যদিও পরবর্তীকালের তবুও মৈত্রায়নী উপনিষদে সাংখ্যের ভাবধারা বেশ স্পষ্ট। সাংখ্য তন্মাত্র, ত্রিগুনাত্মক প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ এখানে স্বীকৃত[78]।

উপনিষদে যা অস্পষ্ট ভাসা ভাসা তাই মহাকাব্যে এসে বিশেষ করে মহাভারতে সাংখ্য দর্শন একটি আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত।[79] এখানে

পুরুষ প্রকৃতির ভেদ ছাড়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ বর্তমান। দার্শনিক আসুরি, পঞ্চশিখ ও অসিত দেবলের মতের উল্লেখ আছে। তবে এখানে স্পষ্টতই সাংখ্যের পরস্পর বিরোধী দুটি ধারা বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত—নিরীশ্বর সাংখ্য ও সেশ্বর সাংখ্য।

মহাকাব্যে নয় এমনকি মনুস্মৃতি, পুরাণেও সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ আছে। যদিও মনু সাংখ্য নামের উল্লেখ কোথাও করেন নি, প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি বর্ণনায় যে সাংখ্য প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৪০] তিনি তিন প্রকার জ্ঞান, তিন প্রকার গুণের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। পুরাণে বিশেষ করে ভাগবতে, (৩৫) মৎস্যপুরাণে (৩), অগ্নিপুরাণে (১৭) ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাংখ্য মতবাদের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই সব শাস্ত্রে ও পুরাণে সাংখ্য মতবাদের উল্লেখ থাকলেও এ সবে ঈশ্বরবাদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তবে নিরীশ্বর সাংখ্যের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

বেদান্তসূত্র প্রণেতা বাদরায়ণ উপনিষদ নিঃসৃত দর্শন হিসেবে সাংখ্যকে বাতিল করেছেন। কেননা উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় অদ্বৈত তত্ত্ব। আর সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় দ্বৈত তত্ত্ব। এখন প্রশ্ন কেন বাদরায়ণ উপনিষদের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনকে মেলাতে গেলেন? তবে কি বাদরায়ণের সময় সমাজে এবম্বিধ প্রচেষ্টা প্রচলিত ছিল? যে ভাবেই হোক না কেন বাদরায়ণ সাংখ্যদর্শনকে বাতিল করার সর্বৈব প্রচেষ্টা করেছেন। সেই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন শঙ্করাচার্য। শঙ্কর বাদরায়ণের থেকেও আর এক কদম এগিয়ে ঘোষণা করলেন যে সাংখ্যদর্শন বেদান্ত দর্শনের প্রধান মল্ল, এক কথায় প্রধান বিরোধী। কেননা সাংখ্যদর্শন শ্রুতিবিরুদ্ধ।[৪১] এইভাবে শঙ্কর সাংখ্যদর্শনের খণ্ডনে বিশেষ প্রচেষ্টা করেছেন। কারণ শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায়ের সাংখ্য প্রীতি তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। শঙ্কর তাঁর শারীরক ভাষ্যে লিখেছেন, কপিল সাংখ্য শাস্ত্রের উদ্গাতা ও সগর-সন্তানদের দাহ কর্তা হিসেবে যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত তাতে লোক সকল মুগ্ধ ও ভ্রান্ত ধারণাবশত বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করে। —**কপিলমিতিশ্রুতি সামান্যমাত্রত্বাৎ অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেব নাম্নঃ স্মরণাৎ**। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেছেন শাস্ত্রান্তরে দুই কপিলের অস্তিত্ব

বর্তমান। এক কপিল অতি প্রাচীন, অন্য কপিল ব্যাসদেব পরবর্তী। যে কপিলেরই সাংখ্য দর্শন হোক না কেন তা অদ্বৈততত্ত্ব বিরোধী। সাধারণভাবে লৌকিক প্রভাব পুষ্ট পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈত তত্ত্ব শঙ্কর শিষ্যদেরও বিচলিত করত। তাই অদ্বৈত তত্ত্ববিদ কি বাদরায়ণ কি শঙ্কর সাংখ্যদর্শন খণ্ডনে অধিক মনোযোগ দিয়েছেন।[৪২] আধুনিক বিদ্বান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন শঙ্কর অবশ্যই এমনকি বাদরায়ণ ও সাংখ্যদর্শনকে প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করেছেন। তার প্রমাণ ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।—'কেননা বাদরায়ণ ও সাংখ্যদর্শনকে বেদান্ত দর্শনের —অর্থাৎ উপনিষদ্ বা শ্রুতি প্রতিপাদ্য তত্ত্বের—প্রধানতম প্রতিপক্ষ বলেই গ্রহণ করেছেন। —সংখ্যা-গণিতের একটি সরল হিসেব থেকেই এ-কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। ব্রহ্মসূত্রে মোট ৫৫৫টি সূত্র আছে। তার মধ্যে অন্তত ৬০টি সূত্র প্রধানতই সাংখ্য খণ্ডন উদ্দেশ্যে রচিত। তুলনায় বাকি সব বিরুদ্ধ-মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বাদরায়ণ মোট ৪৩ টি সূত্র রচনা করেছেন; তার মধ্যে জৈন-মত খণ্ডনে মোট ৪টি সূত্র এবং সমস্ত রকম বৌদ্ধমত খণ্ডনে মোট ১৫ টি সূত্র দেখা যায়। এই হিসেবটুকু থেকেই বোঝা যায় সূত্রকারের কাছে বিরুদ্ধ-মত হিসেবে সাংখ্যর গুরুত্ব কতখানি ছিল। সাংখ্য যদি প্রকৃতই শ্রুতিমূলক হয় তা হলে শ্রুতি-তত্ত্বর ব্যাখ্যায় সাংখ্য খণ্ডনে এমন উৎসাহ কেন?'

অথচ সাংখ্যদর্শনকে শ্রুতিমূলক ব্যাখ্যা করার জন্য পূর্বাপর বিদ্বৎজনের কি যার পর নাই প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যের ভূমিকায় বলেছেন '**কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান-সুধাকরম্। কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥** কালসূর্যের গ্রাসে সাংখ্যদর্শন ভক্ষিত। কলামাত্রই অবশিষ্ট আছে। আমি তাকে অমৃত বাক্যের দ্বারা পূরণ করব। নিরীশ্বর সাংখ্য কি শেষ পর্যন্ত এইভাবে প্রায় বেদান্ত মতে সেশ্বর সাংখ্যে পরিণত হয়েছিল[৪৩]? এই আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণিত হবে যদি গৌড়পাদ আলোচনা করি। সাংখ্যকারিকার দুটি ভাষ্য আবিষ্কৃত: একটি রাজার অন্যটি গৌড়পাদের। রাজার ভাষ্যটি বিলুপ্ত। গৌড়পাদের ভাষ্যে সাংখ্যকে প্রচ্ছন্ন বেদান্ত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা বর্তমান। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব বর্তমান। সাংখ্য মতে পুরুষও আবার এক নয় বহু।

অদ্বৈত মতে পুরুষ এক। তাহলে তো সাংখ্য পুরুষকে ও এক হতে হয়, বহু নয়। তাই সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ সারাংশ করেছেন[৪৪]—**অনেকং ব্যক্তমেকমব্যক্তং তথা পুমানপ্যেকঃ।** ব্যক্ত বহু, কিন্তু অব্যক্ত এক, অতএব পুরুষও বহু হয় কি করে? পুরুষও এক। গৌড়পাদ পরবর্তী সাংখ্য কারিকার টীকাকার অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র। তাঁর গ্রন্থের নাম সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। তিনি ও যার পর নাই চেষ্টা করেছেন সাংখ্যদর্শনকে প্রচ্ছন্ন বেদান্তে পরিণত করার। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি উত্তরকালে সাংখ্য দর্শনের আলোচনা যে সকল বিদ্বান করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সাংখ্যদর্শন আদিতে শ্রুতিমূলক ছিল, পরবর্তীকালে নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের প্রভাবে নিরীশ্বর সাংখ্যে পরিণত হয়েছিল।[৪৫]

এইভাবে কোনটি প্রকৃত সাংখ্য ও কোনটি বিকৃত সাংখ্য তার নির্ণয় নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের লোকায়ত দিক ও লোকায়ত বিরোধী দিক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সাংখ্য প্রধানতই লোকায়ত। প্রকৃত হোক বা বিকৃত হোক কোনখানেই সাংখ্যের লোকায়ত রূপকে মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। শুধু কালোপযোগী করে তোলার প্রাণান্তকর প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে মাত্র।

যে কোন আলোচনাই সাংখ্যদর্শন নিয়ে এ পর্যন্ত হয়েছে সবেতেই কপিলকে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনিই সাংখ্যসূত্র রচয়িতা। কিন্তু সাংখ্যসূত্রের কোন অংশই আজো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে লোকায়ত দর্শন মাত্রেরই এই ভবিতব্য পরিলক্ষিত। আর সাংখ্যদর্শনকে অধিকাংশ বিদ্বানই সুপ্রাচীন বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে কত প্রাচীন তা নির্ণয় করবার উপায় নেই। তা গবেষণার বিষয়। অবশ্য কপিল আদি বিদ্বান বলে খ্যাত। এই কপিল সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী নানান কাহিনী প্রচলিত। এ সবের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য নেই। বিস্ময়ের যে বাঙালী তর্পণ বিধিতে একটি তর্পণ পাওয়া গেছে যা সাংখ্যাচার্যদের তর্পণ ব্যবস্থা। সেখানে কপিলের ও পূর্বে কপিল দর্শনের অচার্যগণের নাম রয়েছে। —**সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু**

মন্দস্তেনাম্বূনা সদা। তবে মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদিতে কপিল, আসুরি ও পঞ্চশিখের নাম সবিশেষ উল্লেখ আছে। বলা আছে কপিলের শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ। এমনকি সাংখ্য দর্শনের উপর লিখিত কারিকাগুলিতেও কপিল, আসুরি ও পঞ্চশিখের নামই রয়েছে। অতএব সাংখ্য দর্শনের আচার্যদের কেবল নামই পাওয়া গেছে। মহাভারতে কেবল পঞ্চশিখের দর্শন কিছুটা আলোচিত। এ ছাড়া কোথাও কোন উল্লেখই নাই।

সাংখ্য দর্শনের মূল গ্রন্থ নেই। এখন ও পাওয়া সম্ভব হয় নি। কেবল সাংখ্য দর্শনের উপর কারিকা কতকগুলি পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকাই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব প্রাচীন। এই কারিকার কাল নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। দাশগুপ্ত যখন দ্বিতীয় শতাব্দীকেই কারিকা রচনার কাল বলে চিহ্নিত করেছেন, গার্বে হিরিয়ানা প্রভৃতি বিদ্বানেরা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকেই কারিকা রচনার কাল মনে করেছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার কাল নিয়েই যে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক তা নয়, বিতর্ক গ্রন্থের বিষয় নিয়ে ও। অধিকাংশ বিদ্বানই একমত সাংখ্য কারিকায় আদি সাংখ্য দর্শনের অনেকটাই পরিমার্জিত। ঈশ্বর-কৃষ্ণের পর আমরা গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য পাই। তা ও সাংখ্য দর্শনকে প্রচ্ছন্ন বেদান্ত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস ভিন্ন কিছু নয়। গৌড়পাদ পরবর্তী সাংখ্য কারিকাকে ভিত্তি করে যে গ্রন্থ পাই তা হলো বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। আর সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যের উল্লেখ তো ইতিপূর্বে উল্লেখিত। বিজ্ঞানভিক্ষু কোন প্রকার রাখ-ঢাক বিনাই সাংখ্য দর্শনকে হরণ-পূরণের জন্য বেছে নিয়েছেন বলে স্বীকার ও করেছেন।

এই সকল কারিকার রচয়িতা কেউই মূল গ্রন্থ নিয়ে কোনপ্রকার ভাবনাই প্রকাশ করেন নি। তাঁদের যে এ নিয়ে কোন প্রকার চিন্তা ছিল তার আভাস কোথাও ফুটে ওঠে নি। কেবল ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর কারিকার এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি 'ষষ্টিতন্ত্র'[৪৩] নামের কোন এক সূত্রের উপর ভিত্তি করেই তাঁর কারিকা রচনা করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের যে সেই 'ষষ্টিতন্ত্র' টি ও আজ বিলুপ্ত। অথচ ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ঠিকই টিকে থাকল। জৈন পণ্ডিত গুণরত্ন আত্রেয়তন্ত্র ও মাঠর-ভাষ্য বলে অপর দুটি

সাংখ্য গ্রন্থের উল্লেখ[৪৭] করেছেন। কিন্তু সেই দুটি গ্রন্থের ও কোন চিহ্ন নেই। পরবর্তীকালে অনিরুদ্ধ সাংখ্যসূত্রবৃত্তি ও মহাদেব সাংখ্যসূত্রবৃত্তিসার নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করলে ও সাংখ্য দর্শনের আদি গ্রন্থের বিষয়ে কোন প্রকার আলোকপাতই করেন নি।

চার্বাক দর্শনের মত সাংখ্য দর্শনের ও কোন মূল গ্রন্থ নেই। ফলে এই দুটি দর্শনের কাল নির্ণয় যেমন কঠিন তেমনই কঠিন মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণয়। সুকঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু যেমন চার্বাক দর্শন লোকায়তে আজো টিকে আছে তেমনই সাংখ্যদর্শন ও টিকে আছে। অবশ্য কালে কালে নানা পণ্ডিত নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে এক একটি প্রামাণিক পুঁথি উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেগুলি যে সাংখ্য দর্শন নয় তা তাঁদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বোঝা গেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানভিক্ষুর কথা থেকে সাংখ্যদর্শন নিয়ে হরণ-পূরণের খেলা স্বীকৃত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি চিত্তাকর্ষক উক্তি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখেছেন[৪৪] 'সাংখ্যদর্শন লইয়া মহাগোল। জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন ছিল। সকলেই উহা হইতে আপন মাল মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন।...কপিল সূত্র হইতে বেদ যে প্রমাণ সেকথা নাই। তাই হিন্দুরা ও বইখানিকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। ...ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুঁথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ সে কথা আছে। ...উহাকে (ঈশ্বর কৃষ্ণ) গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানেনা। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধ সভায় যদি কপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে হইবে।" শুধু মহা-মহোপাধ্যায় নন মুক্তমন আধুনিক বিদ্বান অনেকেই অনুরূপ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমরা কিছু পরেই তুলে ধরব। তবে এই সব বক্তব্য থেকে সহজেই প্রমাণিত কেন কালে কালে সাংখ্য দর্শন আপাঙ্‌ক্তেয় বিবেচিত হয়ে কালের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়েছে। মুক্তমন বিদ্বানগণ এই পরিণতিতে যন্ত্রণা অনুভব করেছেন এবং নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী সাংখ্য-দর্শনে আদি ও অকৃত্রিম রূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। দেবীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়ের মতে "সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য বোঝাবার উদ্দেশ্যে ও সাংখ্যের আদি অকৃত্রিম রূপটি সনাক্ত করবার গুরুত্ব প্রায় অপরিসীম। কেননা, আগেই দেখেছি, সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন, ঠিক কত প্রাচীন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলেও অন্তত এটুকু কথা অনুমান করতে বাধা নেই যে গৌতম বুদ্ধের অনেক আগে থেকেই, এমনকি উপনিষদ রচিত হবার আগেও—আমাদের দেশে এ-দর্শনের প্রভাব ছিল। এই কারণে অনেকে মনে করেছেন, সাংখ্যই ভারতের আদি-দর্শন এবং হয়তো এই কারণেই কপিল আদি-বিদ্বান নামে প্রসিদ্ধ। তাই, এই সাংখ্যকেও আমরা যদি বেদপন্থী দর্শন বলে ভুল করি তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বেদ-বেদান্তের প্রভাব সংক্রান্ত প্রচলিত অতিরঞ্জিত ধারণাকেও আরও অতিরঞ্জিত করা হবে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস সংক্রান্ত সংস্কারগত ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করা হবে।" কিন্তু এই সাংখ্য দর্শনের আদি অকৃত্রিম রূপটি আজো আবিষ্কৃত হয় নি। নানান দার্শনিক নানাভাবে চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তাঁদের প্রচেষ্টাকে আপাতত সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করে সফল হয়েছেন। ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন আধুনিক মনীষীদের চিন্তার সূত্র যুগিয়েছেন এই বলে যে দু প্রকার সাংখ্য বর্তমান—একটি মৌলিক সাংখ্য আর একটি হলো উত্তর সাংখ্য। তিনি মৌলিক সাংখ্য বলতে স্পষ্ট করেই প্রকৃত সাংখ্যকেই বুঝিয়েছেন। যার প্রতিপাদিত অর্থ উত্তর সাংখ্য হলো বিকৃত সাংখ্য। এককথায় দু প্রকার সাংখ্যের একটি হলো আদি অকৃত্রিম সাংখ্য, আর একটি হলো কৃত্রিম বা বিকৃত সাংখ্য। এখন প্রশ্ন গুণরত্ন মৌলিক বা প্রকৃত সাংখ্য বলতে কাকে বুঝিয়েছেন, আমরাই বা কাকে মৌলিক সাংখ্য বুঝব? এরই সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে কিছুটা সফল হয়েছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন সাংখ্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে অবশ্যই চরকের আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজো কেউই এ নিয়ে কোন প্রকার প্রচেষ্টিত হন নি। দর্শনের ছাত্র মাত্রেরই চরকের আলোচনা অবশ্যই মনোনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করা উচিত। দাশগুপ্তর নিজের

ভাষায় 'যতদূর জানি আধুনিক কোন গ্রন্থেই এই চরক-আলোচিত-সাংখ্য পর্যালোচিত হয় নি' [৪৩]দাশগুপ্তের মতে চরক বর্ণিত সাংখ্যই সম্ভবত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত আদি ও প্রাচীন সাংখ্য। চরক সংহিতার কাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বলে চিহ্নিত। অর্থাৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকার বহু পূর্বেই চরক প্রাচীন সাংখ্যের রূপ তুলে ধরেছেন। চরক বর্ণিত সাংখ্যের সঙ্গে মহাভারত বর্ণিত পঞ্চশিখের সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণনার বেশ কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। কে এই পঞ্চশিখ? পূর্বেই উল্লেখিত, কপিল শিষ্য আসুরির শিষ্য। অর্থাৎ কপিলের প্রশিষ্য। মহাভারতে পঞ্চশিখ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলেছেন। অনুরূপভাবে চরক সংহিতায় ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যতত্ত্ব হিসেবে বর্ণিত। যেমন অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ষোড়ষকস্তু বিকার ঃ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যথাক্রমে ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) মন পঞ্চ মহাভূত ও অষ্ট প্রকৃতি। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবার মত যে চরক কখনোই পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেন নি। বরং চেতনা বা পুরুষ হলো ষষ্ঠধাতুর অন্যতম ধাতু। এই ষষ্ঠধাতু যথাক্রমে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) ও মন বা চেতনা বা পুরুষ। এই চেতনা বা পুরুষ পার্থিব পদার্থ। অতএব পঞ্চেন্দ্রিয় বস্তুস্বরূপ বা পরমাণুসর্বস্ব, কেননা মন এদের দ্বারাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সতন্ত্র সত্তা প্রমাণিত, কেননা জ্ঞানভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বর্তমান থাকে। কারণ এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে মন জ্ঞানরহিত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগের ফলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব জ্ঞান উৎপত্তির পূর্বে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। অতএব জ্ঞান বা বুদ্ধির পূর্বে মনের এখানে দ্বৈত ক্রিয়া বর্তমান। প্রথমে অনির্দিষ্ট অনুভূতি এবং পরে বিচার বা উপলব্ধি। এই পঞ্চেন্দ্রিয় আসলে পঞ্চ-মহাভূতের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। এইভাবে চরক সংহিতায় যে সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণিত সেখানে পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অব্যক্ত বা প্রকৃতিতেই বিলীন অবস্থায় থাকে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত[৩০] এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে চরক সংহিতায় বর্ণিত সাংখ্য সূত্রে 'পুরুষ' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। টীকাকার চক্রপাণির বক্তব্য তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরেছেন। টীকাকার ও বলেছেন যে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অব্যক্ত। উভয়েই এক হিসেবে পরিগণিত। কি মহাভারতে

পঞ্চশিখের বক্তব্যে, কি চরক সংহিতায় সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণনায়, অব্যক্তকেই চরম সত্তাবলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সব নদী যেমন সাগরে বিলীন অবস্থায় থাকে তেমনই সকল উপাদানই স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন অবস্থায় থাকে। গুণ হলো মনের ভালো মন্দ অবস্থা। সকল উপাদানের সমন্বয় হলো ক্ষেত্র। চরক বর্ণিত এই সাংখ্যতন্মাত্রের কোন প্রকার উল্লেখ নাই। এক প্রকার সূক্ষ্ম উপাদানে প্রকৃতি সমন্বিত। এই সূক্ষ্ম উপাদান আট প্রকার। আমরা এই সাংখ্যের মূল বক্তব্যগুলিকে সাজিয়ে নিতে পারি। (ক) জড় উপাদান অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি। (খ) এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণাত্মক। রজ ও তম যথাক্রমে মন্দ অবস্থা সত্ত্ব হলো উত্তম অবস্থা। এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্য উৎপন্ন হয়। (গ) এমন কি চেতনা বা পুরুষ চিৎ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ বস্তুগত। (ঘ) অব্যক্ত প্রকৃতির দ্বৈত অভিব্যক্তি বর্তমান। একটি ধারায় অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, অন্যধারায় বিষয়সমূহে জ্ঞানের উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। (ঙ) এর দ্বারা প্রমাণিত জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তায় বর্তমান। অর্থাৎ জ্ঞানে যা ধরা পড়ে তা বাস্তব ও সত্য। (চ) দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি বা মোক্ষ। ধাতুবৈষম্যনিবন্ধন শরীর দুঃখ স্বরূপ অজ্ঞাতকে চতুর্ব্যূহ জ্ঞাপন করাই সাংখ্য শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। (ছ) জগৎ নিয়ন্তা হিসেবে কোন সনাতন পুরুষ বা ঈশ্বর নেই। প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। (জ) ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে নিরন্তর ক্রিয়া প্রক্রিয়াই জগৎ কারণ। (ঝ) এই নিরন্তর সংক্ষোভ বা দ্বন্দ্বই হলো সকল কিছুর চালিকা শক্তি।

আমরা এবার চরক বর্ণিত সাংখ্যসূত্রের জগৎতত্ত্ব ও জ্ঞান তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরতে পারি। তত্ত্বসমুদয়ের প্রথম তত্ত্বই হলো প্রকৃতি। এই বৈচিত্র্যময় জগতের অব্যক্ত অবস্থা হলো প্রকৃতি আর ব্যক্ত অবস্থা হলো জগৎ। এই প্রকৃতি আট প্রকার। তিনটি গুণ বিপরীত ধর্ম বিশিষ্ট। যথাক্রমে ভালো ও মন্দ। এই গুণত্রয়ে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে। এই দ্বন্দ্ব পরিণামী। যার ফলে গতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। তখন উপাদান সমূহের সংমিশ্রণ ঘটে। সেই সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি যেমন সাবয়ব শরীর তেমন চেতনাও। প্রাচীন সাংখ্যে তাই অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে চেত উপাদান

সমূহেরও উল্লেখ বর্তমান। অর্থাৎ প্রাচীন সাংখ্যেও চেতনা যে বস্তুগত তা প্রমাণিত। কেননা চরক বর্ণিত সাংখ্যে ও মহাভারত বর্ণিত পঞ্চশিখের বক্তব্যে চেতনা বা আত্মার অস্তিত্ব কর্মের মধ্যেই প্রমাণিত। যা সরাসরি লোকায়ত বক্তব্যকে পুষ্ট করছে। প্রাচীন সাংখ্যে এইভাবে প্রকৃতির দ্বৈত অভিব্যক্তি চিহ্নিত। একটি ধারায় অন্তঃকরণ যেমন মন, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি তেমনি বাহ্যকরণে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও তার ধারায় অন্যান্য উপাদান সমূহ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ইত্যাদি স্বীকৃত। এতক্ষণ জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। এখন জ্ঞানতত্ত্ব জানা দরকার। চরক বর্ণিত প্রাচীন সাংখ্য অনুযায়ী জ্ঞান মাত্রেই সবিষয়। অর্থাৎ জ্ঞান সর্বদাই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করেই হয়, এর অন্যথা নেই। জ্ঞান আছে অথচ বিষয় নেই, অর্থাৎ বিষয় বহির্ভূত জ্ঞান সম্ভবই নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত যা তা হলো জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তায় বর্তমান। জ্ঞানে যে বিয়ষ ধরা পড়ে তা সত্য। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোজনের মাধ্যমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুভূতি জ্ঞান ইত্যাদি আবার ইন্দ্রিয় ও মনের সমন্বয় ব্যতীত সম্ভব নয়। জ্ঞানের মত যাবৎ জাগতিক কার্যই কারণ থেকে এক বিশেষ সমন্বয়ের মাধ্যমেই উদ্ভূত। প্রকৃতি থেকে বিবর্তিত উৎপন্ন যা বিকাররূপে চিহ্নিত তা প্রাচীন সাংখ্যের পরিভাষায় ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত। প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা হলো ক্ষেত্রজ্ঞ। এই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেই চেতনার অবির্ভাব হয়। আবার বিনাশকালে প্রকৃতিতেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আত্মা বা চেতনা শরীর সর্বস্ব। ফলে আত্মা শরীরগামীও। তৃষ্ণাই সকল দুঃখের কারণ। চেতনা সম্পন্ন মুক্ত আত্মা তৃষ্ণা রহিত চতুর্বিংশতিতত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত। এই চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। সাংখ্যদর্শনের মূল উল্লেখ হলো 'অজ্ঞাত-জ্ঞাপকং' যা লৌকিক জ্ঞানে সহজে ধরা পড়ে না তার উপলব্ধি জন্মানো। এই উপলব্ধি বা বোধ যখন জাগরিত হয় তখনই দুঃখ নিবৃত্তি হয়। আর এই দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ। ফলে কোন সনাতন আত্মা বা পুরুষ বা ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর অসিদ্ধ কেননা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নয়। অতএব ঈশ্বরের সর্ব-প্রকার ধারণাই অসিদ্ধ।

এতক্ষণ যে সাংখ্যদর্শনের পরিচয় পাওয়া গেল তা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে হতে পারে। কেননা মূল গ্রন্থ থেকে এসব উদ্ধার করা যায় নি।

মহাভারতে পঞ্চশিখ কথিত উপাখ্যান এবং চরক বর্ণিত অংশ থেকেই গৃহীত। স্বভাবতই এই সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সুকঠিন। কিন্তু যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন সাংখ্য—যাকে গুণরত্ন মৌলিক সাংখ্য বোঝাতে চেয়েছেন—তা উত্তর সাংখ্য থেকে সম্পূর্ণত ভিন্ন। প্রাচীন সাংখ্য তা মূলতই লোকায়তিক উত্তর সাংখ্য সেখানে একান্তই ভাববাদকেন্দ্রিক। প্রাচীন সাংখ্যদর্শন যে স্বতন্ত্র লোকায়তিক সম্প্রদায় হিসেবে পরবর্তী ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল এ কথা আধুনিক বিদ্বানগণ প্রায়শই বলেছেন। আমি ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক হিরিয়ানা তো আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে[৩১] সমগ্র ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই সাংখ্য দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। আসলে বৈদান্তিক হিরিয়ানা বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন লোকায়ত সম্প্রদায় তেমনই লোকায়ত বিরোধী সম্প্রদায় ও অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্য দর্শনের কাছে ঋণী। কিন্তু শঙ্কর এই কারণেই বোধ হয় প্রাচীন সাংখ্য দর্শন নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। কেননা শিষ্যদের অনেকেই সাংখ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি কি উত্তর সাংখ্যের বৈদান্তিক সংস্করণ? কিন্তু আজো সর্বজন স্বীকৃত সত্য যা তা হলো প্রাচীন সাংখ্য স্পষ্টতই বেদ বিরোধী লোকায়ত। পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা[৩২] লিখেছেন সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ বস্তুর ও আত্মার পার্থক্য সূচিত করেছে দৃশ্য ও অদৃশ্য এই বিভাগের মধ্য দিয়ে। এই সর্বজন স্বীকৃত বস্তুর ও আত্মার বিভাগ প্রথম রেখাঙ্কিত হয়েছে সাংখ্যদর্শনে। কেবল তাই নয় পরিবর্তমানতার তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে প্রথম গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। যার থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে বৌদ্ধদর্শন। হিরিয়ানা ও প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন[৩৩] প্রকৃতি শুধু যে জটিল তা নয় পরিব্যাপকও এবং সর্বদা বিবর্তিত অর্থাৎ অবিরাম পরিবর্তিত হয়। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হলেও অভিন্নতা বজায় রাখে বিনাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আসলে পরিবর্তন মানে এখানে পরিণাম যা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্ট রূপে চিহ্নিত। চেরবাটস্কি[৩৪] এই পরিবর্তনের সূত্র ধরেই আলোচনা করেছেন যে ঠিক এই কারণেই বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শন অত্যন্ত কাছাকাছি। শুধু যে সাংখ্যদর্শন জৈন ও বৌদ্ধদর্শনকে প্রভাবিত করেছিল তা নয় সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক

দর্শনেরও নৈকট্য বর্তমান। বিশেষ করে উল্লেখের দাবী করে সাংখ্যদর্শনের মনস্তাত্ত্বিক দিক। সেই সুপ্রাচীনকালে মনস্তত্ত্বের এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না[৩৫]। বিদ্বান গার্বে লিখেছেন কণাদদর্শনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিক সাংখ্য দর্শনের মনস্তাত্ত্বিক দিককে সূচীত করে। কেবলমাত্র চার্বাক দর্শনে আত্মার উদ্ভব ব্যাখ্যায় এমনই এক লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সন্ধান মেলে যা উন্নত বিজ্ঞান চিন্তাকেই সূচিত করে। প্রাচীন সাংখ্যদর্শন-ও তেমনি উন্নত বিজ্ঞান চিন্তার পথ প্রদর্শক। যেখানে উদ্ভট কল্পনা সর্বস্ব অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত। হিরিয়ানার দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্য এখানে[৩৬] প্রণিধান যোগ্য। প্রাচীন সাংখ্য ও প্রচলিত সাংখ্যর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য যা তা হলো প্রাচীন সাংখ্য নিরীশ্বর বাদী। স্বভাবতই প্রচলিত সাংখ্য যা উত্তর সাংখ্য বলে চিহ্নিত তা ঈশ্বরবাদী।

এবার আমরা এই উত্তর সাংখ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আর এখান থেকেই ধরা পড়বে কিভাবে প্রাচীন সাংখ্য কালে কালে উত্তর সাংখ্যে কেন পরিণতি লাভ করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমরা কি কপিল কি আসুরি, কি পঞ্চশিখ কারোরই কোন গ্রন্থ পাই না। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই প্রথম প্রাপ্ত সর্বাংশে গৃহীত গ্রন্থ। কথিত আছে পঞ্চশিখ কপিল সম্মত ষষ্টি সংখ্যক পদার্থের উপর ষষ্টি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর পর থেকে সাংখ্যদর্শন ষষ্টিতন্ত্র নামে খ্যাত হয়। অবশ্য এ সবের কোন হদিশ আজো মেলেনি। তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর কারিকায় ষষ্টিতন্ত্রের উপস্থিতি স্বীকার করে বলেছেন—'আখ্যায়িকাবিরহিতা পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি।' ষষ্টিতন্ত্রে সকল পদার্থেরই বর্ণনা করেছি কেবল আখ্যায়িকা ও পরমত খণ্ডন বাদ দিয়েছি। এর থেকে প্রমাণিত যে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা নির্বাচন মূলক। আর আসুরি ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি সাংখ্যকার যে অংশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যেমন আখ্যায়িকা ও বাদকথার তাকেই সর্বাংশে পরিত্যাগ করেছেন। আর এখান থেকেই ঈশ্বরকৃষ্ণের দায়বদ্ধতার ইংগিত পরিস্ফুট। সাংখ্য দর্শনের উপর ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্ভবত তিনটি গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন যথাক্রমে সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ও তত্ত্বসমাস। এই তিনটির মধ্যে সাংখ্যকারিকাই প্রাচীন ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। পরবর্তী দুটি গ্রন্থের

উপর কোন প্রকার গুরুত্ব দেন নি। এই সাংখ্যকারিকা থেকেই যে সাংখ্যদর্শনের পুনরুত্থান তা উত্তর সাংখ্য রূপে চিহ্নিত।]

সাংখ্যকারিকা বর্ণিত সাংখ্যদর্শনে লোকায়ত সাংখ্য ধারণার যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয় তা হলো প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রাধান্য। অথচ লোকায়ত ভাবকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে প্রধান এবং একমাত্র তত্ত্বরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবিরাম দ্বন্দ্বেই জগতের ক্রম বিকাশ। জড় ও চেতন উভয়ই ফলশ্রুতি। কিন্তু সাংখ্যকারিকায় দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত—পুরুষ ও প্রকৃতি যথাক্রমে চেতন ও জড়। স্বতন্ত্র ও ভিন্ন হলেও পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর নির্ভরশীল। এই উত্তর সাংখ্য অনুযায়ী পুরুষ হলো আত্মা, দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা। প্রকৃতি হলো দৃশ্য, জ্ঞেয় ও অনাত্মা। এই আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর সম্পর্কিত, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। জ্ঞেয় ভিন্ন জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয় অচিন্তনীয়। কাজেই এর থেকে অনিবার্যভাবে যা নিঃসৃত তা হলো আত্মা ও অনাত্মার উর্ধ্বে নিশ্চয়ই একটি সত্তা বর্তমান যার দুটি বিভিন্ন প্রকাশ হলো যথাক্রমে আত্মা ও অনাত্মা। এইভাবে উত্তর সাংখ্য প্রচলিত লোকায়ত ধারণা দ্বৈতবাদকে ভিত্তি করে অদ্বৈতবাদের দিকেই ইংগিত-বাহী। আর তা একান্তই ভাববাদ মূলক অদ্বৈতবাদ।

এর সমর্থনে এমনকি আপাত লৌকিক ব্যাখ্যাও সংযুক্ত। জগৎ প্রকৃতি সৃষ্ট। কিন্তু অনাত্মা প্রভৃতি নিশ্চয়ই নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেন নি। যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তা হলো পুরুষার্থ সাধন। অতএব পুরুষার্থ সাধন প্রকৃতির উদ্দেশ্য। এদিক থেকে বিচার করলে প্রকৃতি পুরুষেরই অধীন। পুরুষই জড় প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য জাগায়। অতএব পুরুষ যদি না থাকতো তবে প্রকৃতিতে কোন চাঞ্চল্যই জাগতো না, আর এই বিচিত্র জগতেরও উদ্ভব ঘটত না। প্রকৃতি যে পুরুষসাপেক্ষ তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। এইভাবে সাংখ্য দর্শনে পরোক্ষ পুরুষের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত যার চূড়ান্ত পরিণতি পূর্বের আলোচিত বেদান্ত তত্ত্ব ভাববাদই।

সাংখ্যকারিকায় দ্বৈতবাদের অসম্পূর্ণতা সুন্দর ভাবে চিত্রিত। দুটি

মূল তত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ স্বভাব। পুরুষ চেতন ও নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি অচেতন অথচ সক্রিয়। প্রকৃতি হলো জগতের উপাদান কারণ। উভয়ের সংযোগে জগতের সৃষ্টি। কিন্তু স্বরূপত ভিন্ন তত্ত্বের সংযোগ কিভাবে হয়? তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সাংখ্যকারিকায় নেই। কেবল কয়েকটি উপমা রয়েছে। তাদের অন্যতম অন্ধ ও খঞ্জের সহযোগিতার উপমা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই উপমা অসার্থক আপাত লৌকিক উপমা। কেননা অন্ধব্যক্তি অচেতন নয় আবার খঞ্জ ব্যক্তি ও নিষ্ক্রিয় নয়। খঞ্জ ব্যক্তি কথার মাধ্যমে অন্ধব্যক্তিকে পরিচালিত করে। এমনকি পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ ব্যাখ্যায় লৌহের ব্যাখ্যা ও অসার্থক। চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ যেমন ক্রিয়াশীল হয় তেমন প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হয়। কিন্তু চুম্বক আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় মনে হলে ও চুম্বক প্রকৃতপক্ষে আকর্ষণ শক্তির আধার। কাজেই চুম্বক নিষ্ক্রিয় নয়। অথচ পুরুষ উদাসী ও নিষ্ক্রিয়। আর একটি উপমা আছে গাই ও বাছুরের সম্পর্ক। যেমনভাবে গো-মাতার শরীরে অচেতন ভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হয় তেমনই অচেতন প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশ্য সাধনে জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আপাত লৌকিক উপমাও সুপ্রযুক্ত নয়। কেননা গো-মাতার স্তন থেকে অচেতন ভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হয় না বাছুরের প্রতি স্নেহ-বশতই হয়। আর গো-মাতার উপমা যদি স্বীকার করতে হয় তো প্রকৃতিকে চেতন বলতে হয়। এমনকি সাংখ্যকারিকা নির্দিষ্ট বহুপুরুষ-বাদও যুক্তিনিষ্ঠ, সমর্থনীয় নয়। তবে কিসের কারণে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই সব ছদ্ম যুক্তির অবতারণা করলেন! তা কি অনবধানতা বশতঃ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? তা নিশ্চয়ই নয়। নাকি সুপ্ত ইচ্ছার রূপায়ণকল্পেই এই সব আপাত যুক্তির অবতারণা? সাংখ্য দ্বৈতবাদ যদি সন্তোষজনক না হয় তবে অনিবার্য ভাবে যা বোধগম্য হবে তা হলো আত্মা ও অনাত্মার উর্দ্ধে একটি সত্তা আছে। এই অদ্বৈত সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ হলো আত্মা ও অনাত্মা। কে সেই উচ্চতর সত্তা। নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কপিল দর্শন কি এতই পলকা, এতই অসম্পূর্ণ ছিল? তা কি কখনো সম্ভব? এর সুনির্দিষ্ট উত্তর আগামীকালের গবেষকদের হাতেই তোলা রইল।

চার্বাক দর্শন

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে সমাজে দ্বিজ ও শূদ্রের শ্রেণী বিরোধ দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দর্শনকে কেন্দ্র করে যে শ্রেণী বিরোধ তা জন বা প্রজা দর্শন ও রাজা বা যজমান বা যাজক সম্প্রদায়ের দর্শনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জন দর্শন ভারতীয় পরিভাষায় রূপ পেয়েছিল লোকায়ত দর্শনের মধ্য দিয়ে আর রাজ বা যজমান দর্শন রাজদর্শন রূপে প্রচলিত ছিল। যেমনভাবে আজকের রাষ্ট্রনীতি সুপ্রাচীন অতীতে রাজনীতি রূপেই প্রচলিত। তবে জন দর্শন লোকায়ত নামে প্রসিদ্ধি পেলেও রাজদর্শন কেবলমাত্র দর্শন নামেই প্রচলিত ছিল। লোকায়ত নাম নিন্দা-সূচক অর্থেই প্রচলন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শঙ্করাচার্য তাঁর শারীরকভাষ্যে বলেছেন[৩৭]—**প্রাকৃতা জনা-:লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ**। প্রাকৃত জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ দর্শনই লোকায়ত দর্শন হিসেবে প্রতিপন্ন। অনুরূপভাবে ষড়দর্শন সমুচ্চয়কার পণ্ডিত গুণরত্ন তাঁর তর্করহস্য দীপিকায় লিখেছেন নির্বিচার আচরণকারী সাধারণ লোকের মত যারা আচরণ করে তারাই লোকায়ত বা লোকায়িতক। কিন্তু কালে কালে লোকায়ত নামে নিন্দা-সূচক অর্থ তিরোহিত হয়ে গৌরব অর্থ গৃহীত হয়। তখন লোকায়ত অর্থ হয়ে দাঁড়ায় লেকেষু আয়তম্ অর্থাৎ গণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত দর্শন। বিংশ-শতাব্দীর অধিকাংশ বিদ্বানই যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাওয়েল ও গাফ লোকায়ত শব্দটি দ্বিতীয়োক্ত অর্থে ব্যক্ত করেছেন। এই সকল বিদ্বান যে কেবল গৌরব অর্থে লোকায়ত শব্দটি ব্যক্ত করেছেন তাই নয় লোকায়ত বলতে বস্তুবাদ বুঝিয়েছেন। এই সকল বিদ্বান হলেন, হিরিয়ানা, দাশগুপ্ত, রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি। লোকায়ত মতই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদী মত কেননা লোকায়ত মত অনুযায়ী লোক সর্বস্ব এই জগতই সত্য। অলীক, কল্পনাপ্রসূত পরলোক, পরমাত্মা ইত্যাদি মিথ্যা।

এই লোকায়ত দর্শনের কোন পুঁথিপত্র পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শন সংগ্রহে[৩৪] উল্লেখ করেছেন যে চার্বাক মতই লোকায়তমত নামে প্রসিদ্ধ। চার্বাক দর্শনের কোন গ্রন্থই আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

লোকসমাজে প্রচলিত লোকশ্রুতি ও প্রতিপক্ষীয় দর্শনের নানান উদ্ধৃতি আলোচনাকে ভিত্তি করেই মাধবাচার্য চার্বাক দর্শন সূত্রাকারে তুলে ধরেন। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। তা হলো প্রতিপক্ষের উদ্ধৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ড বিক্ষিপ্ত ও বিরূপ মনোভাব সর্বস্ব, তুচ্ছতাচ্ছিল্য উপহাস পরিহাসের প্রকাশ। এই সব খণ্ড-বিক্ষিপ্ত বিকৃত উদ্ধৃতিকে ভিত্তি করে একটি সুসংবদ্ধ দর্শন হিসেবে দাঁড় করানো বেশ শক্ত কাজ। অনেকের মতে চার্বাক দর্শনই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীনতম বিচার ভিত্তিক দর্শন। অনেকের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে, Philosophy র প্রতিশব্দ 'দর্শন' কথাটি চার্বাকমত থেকেই নেওয়া। কেন না চার্বাক দর্শনই প্রথম দর্শনশাস্ত্রকে দর্শন বা প্রত্যক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। আর ভারতীয় দর্শনের এমন কোন দর্শন সম্প্রদায় পাওয়া যায় না যাতে দর্শন বা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র মাধ্যম বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া এই দর্শন যে বেদের সমসাময়িক বেদ বিরোধী দর্শন, কারো কারো মতে তার ও আগে প্রচলিত ছিল, একথার স্বীকৃতি অধিকাংশ বিদ্বানেরই লেখায় পাওয়া যায়। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতির উল্লেখ করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[৩৩] সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই লোকায়ত মত অতিপ্রাচীন, সম্ভবত বেদের সমসাময়িক অথবা তারও পূর্বে থেকে আর্যপূর্ব সুমেরীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। এই লোকায়ত মত যে সুপ্রাচীন এবিষয়ে প্রায় সকল পণ্ডিতই যেহেতু একমত এখন আমাদের এই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা প্রয়োজন।

সুপ্রাচীন এই লোকায়ত দর্শনের উল্লেখ আমরা বেদ-উপনিষদে পাই। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, কঠোপনিষদ সবেতেই লোকায়ত মতের উদ্ধৃতি বর্তমান। প্রাচীন এই লোকায়ত মত দেহাত্মবাদ রূপে সর্বাধিক প্রচারিত। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন নামেও কখনো কখনো চিহ্নিত, যেমন স্বভাববাদ যদৃচ্ছবাদ, ভূতবাদ ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই মন্ত্রটিতে নিয়তি-বাদ শব্দটিকেও একই সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে। অথচ লোকায়ত পরি-পন্থী এই মতবাদ কেন যে একই সঙ্গে উল্লেখিত তা গবেষণার বিষয়। পরবর্তী কোন এক সময় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা

দেখি বেদ-উপনিষদেও এই নামকরণ নাস্তিক, বিতণ্ডাবাদ, চার্বাক, লোকায়ত, বার্হস্পত্য ইত্যাদি নামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু উপনিষদ পরবর্তী যুগে লোকায়ত নামটি বিশেষভাবে বজায় থাকে। আধুনিক বিদ্বানগণ এই লোকায়ত মতকেই বস্তুবাদী মত বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে দর্শনের শ্রেণী দ্বন্দ্ব দেখা দেয় জন বা প্রজা দর্শন ও যজমান বা রাজ দর্শনের মধ্যে। জন দর্শন যেখানে দেহাত্মবাদ প্রচার করেছে তখন যজমান বা রাজ দর্শন অতীন্দ্রিয় দেহাতিরিক্ত আত্মার তত্ত্ব প্রচার করেছে। আমরা এই উক্তির সমর্থনে আধুনিক বিদ্বান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন[১০০] 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষটি সর্বপ্রথম রূপায়িত হয় দেহাত্ম-বাদ বনাম-দেহাতিরিক্ত আত্মার সংক্রান্ত মত সংঘর্ষ হিসাবেই'।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে দেহাত্মবাদের সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ পেলেও অন্যান্য উপনিষদেও দেহাত্মবাদ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে এই অপার অনন্ত জগৎ, এমনকি চেতন সত্তাও ভূতপদার্থ থেকে উৎপন্ন আবার ভূতপদার্থেই বিলীন হয়। বিনাশের পর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এমন কি চৈতন্যও। মৃত্যুর সঙ্গে চেতনারও বিনাশ ঘটে। [101] **ইদং মহদ্ভূতমনন্তপারং বিজ্ঞানঘন এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃসমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা-স্তীতি।** ঠিক অনুরূপ আর এক জায়গায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেহাত্মবাদের উল্লেখ বর্তমান। ওখানে বলা হয়েছে যে দেহই আত্মা, অসুর প্রকৃতির লোকেদের এই রকমই অভিমত, তাঁদের উপনিষদ ও এই প্রকার[১০২]। **দেহমাত্রমেব আত্মা আসুরো বদেতি। অসুরাণাং হ্যেষা উপনিষৎ।** এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে দেহাত্ম-বাদ অসুরদের উপনিষদ। আর্যদের উপনিষদ ভিন্ন। আর্য মতবাদ হলো দেহাত্মবাদ বিরোধী মতবাদ। তা সুন্দরভাবে কঠোপনিষদে বর্ণিত। সংক্ষেপে তা হলো **শরীর সত্তীতের জনক নয়, জনিত[১০৪] শরীরস্থায় দেহিনঃ।** অর্থাৎ জড় থেকে জীব নয়, জীব থেকেই জড়ের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপ-নিষদে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে [104] **অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।** দেহাতিরিক্ত চেতন্যই জীবনরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে

নামরূপে প্রভেদ করলেন। উপনিষদে এইভাবে দেহাত্মবাদ বনাম দেহাতিরিক্ত আত্মবাদের সংঘর্ষ ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উপহাসোচ্ছল একটি কাহিনী ও এ নিয়ে বিবৃত হয়েছে। তা হলো ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ। উভয়েই প্রজাপতির কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য গেলে প্রজাপতি বললেন 'চোখে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনিই আত্মা'। এরপর উভয়ে আদিষ্ট হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব পর্যালোকন করে এসে যখন প্রজাপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, তখন লোম-নখ সমন্বিত স্বপ্রতিবিম্বের বর্ণনা দেন। এর পর প্রজাপতি সুবসন পরিহিত হয়ে জল পূর্ণ পাত্রে নিজেকে দেখতে পরামর্শ দেন। তারা তদ্রূপ আচরণ করে এসে জিজ্ঞাসিত হতে বললেন 'সুবসনে বিভূষিত, পরিষ্কৃত শরীর দেখলাম। প্রজাপতি বললেন "ইনিই আত্মা। ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম"। এরপর উভয়েই শান্ত হৃদয়ে চলে আসে। তখন প্রজাপতি মনে মনে বললেন মূঢ়মতিই কেবল এই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করে সর্বনাশ ডেকে আনবে। এরপরের গল্পে দেখা যায় ইন্দ্র অতৃপ্ত হয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে আসেন। বিরোচন কিন্তু এই আত্মতত্ত্বই প্রচার করতে থাকেন। সেই থেকেই দেহাত্মবাদ অসুরমতরূপে প্রচলিত হয়। **—তস্মাৎ অদ্যাপি ইহ অদদানং অশ্রদ্দধানং অযজমানং আহুঃ বত আসুরঃ ইতি।**

উপনিষদ্ পরবর্তী যুগে আমরা দেহাত্মবাদকে লোকায়ত মত রূপে পরিগণিত হতে দেখি বিশেষ করে বাদরায়ণ, শঙ্করাচার্যে ও প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে। বাদরায়ণ তাঁর দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে দেহাত্মবাদ খণ্ডনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ করে তিনি দেহাত্মবাদ খণ্ডনে দুটি সুস্পষ্ট সূত্র রচনা করেছেন। লোকায়ত নাম বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' অনুপস্থিত। কিন্তু শংকাচার্যের 'শারীরক ভাষ্যে' সুস্পষ্ট ভাবেই দেহাত্মবাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকায়ত নামটির ও উল্লেখ করেছেন। শারীরক ভাষ্যে শংকর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন[105] **দেহমাত্রং চৈতন্য বিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ**। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা এই লৌকিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের দ্বারাই অসংস্কৃত প্রাকৃত জনই লোকায়তিক রূপে চিহ্নিত। শারীরকভাষ্য ছাড়া প্রাচীন পালি ত্রিপিটকে লোকায়ত শব্দই বারবার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ করার মত বিষয় যা তা হলো ত্রিপিটকের

কোথাও দেহাত্মবাদ ও লোকায়ত একত্রে প্রতিপাদিত হয় নি। কিন্তু যে অর্থেই লোকায়তিক পদ পালি ত্রিপিটকে ব্যবহার হোক না কেন সর্বত্রই তা যে দেহাত্মবাদকেই সূচিত করেছে এ সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। কিন্তু এই দেহাত্মবাদ যে কাদের মতবাদ তার কোন রকম স্পষ্ট উল্লেখ নেই। আসলে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাচীন দেহাত্মবাদই বর্ণিত।

বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন ছাড়া প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই কোন না কোন ভাবে এই প্রাচীন দেহাত্মবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু কোন দর্শন সম্প্রদায়ই উক্ত দর্শনের কোন গ্রন্থের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে নি। কেবলমাত্র খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০—৩০০ অব্দে এই দর্শনের উপর একটি ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ভাষ্যগ্রন্থ 'বর্তিকা' বা 'বর্ণিকা' রূপে ভাগুরীর নামে প্রচলিত ছিল। যেহেতু ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ বর্তমান মূল গ্রন্থও নিশ্চয়ই কোন একসময় পাওয়া যেত। বিস্ময়ের যা তা হলো কোন দর্শন সম্প্রদায় বা কোন গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আধুনিক বিদ্বান-দের অনেকেই এর জন্য প্রশাসন পুষ্ট দর্শনকেই দায়ী করে থাকেন। আসলে দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ প্রতিষ্ঠায় দেহাত্মবাদের ধ্বংস সাধনই তৎকালীন সমাজের বিধান ছিল। আধুনিক যুগে যেমন রাজনৈতিক দলের উপর রাজরোষে 'নিষিদ্ধ নির্দেশিকা' জারী হয় তেমনই কোন কঠোর অনুশাসন জারী ছিল লোকায়ত দর্শনের সেই সুপ্রাচীন কালেই। অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, জওহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে অধিকাংশ মনীষাই একথার উল্লেখ করেছেন। এহেন লোকায়ত দর্শনের মোটামুটি প্রাপ্ত তথ্যের সংগৃহীত প্রথম গ্রন্থ হলো সায়ন-মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'। পরবর্তী কালে হরিভদ্রসুরীর ষড়দর্শন সমুচ্চয়েও অনুরূপভাবে লোকায়ত মত সংগৃহীত হয়। 'ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ের' উপর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন জৈন পণ্ডিত গুণরত্ন। গুণরত্ন লোকায়ত দর্শনের আলোচনায় অধিক সময় ও মনন দিয়েছেন। অনুরূপভাবে লোকায়ত দর্শনের আলোচনা করেছেন জয়ন্ত ভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, পরবর্তী অধিকাংশ চিন্তাবিদই। কিন্তু সর্বত্রই চার্বাক দর্শন আলোচিত হয়েছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য-পরিহাস-উপহাস-ঘৃণা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে। বেদ উপনিষদে দেহাত্মবাদ 'অবিদ্যা', বলে নিন্দিত। পৌরাণিক উপাখ্যান গুলিতে চার্বাক বা

লোকায়ত মতকে 'অসুর মত' বলে যত প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করা যায় এবং তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে লোকায়তিকদের যে ভাবে হেনস্থা করা দরকার তার সকল রকম দৃষ্টান্তই দেখা যায়। রামায়ণে ও মহাভারতে এই রূপ উদাহরণ বর্তমান। রামায়ণে রামচন্দ্র ভরতকে নির্দেশ দিয়েছেন সে যেন অনর্থকুশল, পণ্ডিতম্মন্য দুষ্টবুদ্ধি সর্বস্ব, ধর্মশাস্ত্র বিরোধী, আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি আশ্রয়কারী লৌকায়তিক ব্রাহ্মণগণের সেবা না করে। অনুরূপভাবে মহাভারতেও লৌকায়তিক ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে জানা যায়। মনুর মানব ধর্মশাস্ত্রে লোকায়তদের সম্পর্কে কড়া অনুশাসন জারী করেছিলেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ হলো শ্রুতি ও স্মৃতির অবমাননাকারী বেদনিন্দক নাস্তিকদের যেন সভা থেকে বহিষ্কার করা হয়··· সঃ সাধুভিঃ বহিষ্কার্যঃ নাস্তিকঃ বেদনিন্দকঃ॥ শুধু এখানেই মনু ক্ষান্ত হন নি তিনি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন পাষণ্ড হৈতুকদের সঙ্গে বাক্যালাপ ও যেন না করা হয়··· **পষণ্ডিণঃ বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্। হৈতুকান্ বকবৃত্তীন্ চ বাঙমাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥** বৌদ্ধশাস্ত্রে ও অনুরূপভাবে লোকায়ত মতকে চূড়ান্ত ভাবে নিন্দা করা হয়েছে। বুদ্ধের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল লোকায়ত চর্চা সর্বৈব নিন্দনীয়। ভিক্ষুদের কেউই লোকায়ত অধ্যয়ন করতে পারবে না। যারা এই নিয়ম ভাঙবে তারা দুষ্কর্মের অপরাধে শাস্তি ভোগ করবে। বুদ্ধ লোকায়ত বিদ্যাকে মনুষ্যেতর বিদ্যা বলে চিহ্নিত করে সকলের পরিত্যজ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই মনুষ্যেতর বিদ্যাকে পালি পরিভাষায় 'তিরচ্ছানবিজ্জা' বলে বর্ণনা করেছেন। এখান থেকে মনে হতে পারে বুদ্ধদেব যেমন আত্মবাদ বিরোধী তেমনই দেহাত্মবাদ বিরোধী। এই রকম সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা তা গবেষণার বিষয়। তবে যা মনে হয় তাতে বুদ্ধদেব যে ভুতবাদ বিরোধী এই সিদ্ধান্ত কোন মতেই করা যায় না।

ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী চার্বাক দর্শনের মুখবন্ধে লিখেছেন[106] "ন্যায় কুসুমাঞ্জলির উদয়নাচার্য্য এবং কুসুমাঞ্জলির প্রকাশ টীকাকার বর্ধমান বুদ্ধকে চার্বাকের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণের আরও কেহ কেহ বুদ্ধকে চার্বাক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বা বৌদ্ধ মত ও চার্বাকমতের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। কেননা প্রাচীন বৌদ্ধমত ভূতবাদ সর্বস্বই। তবে একথা ঠিক বুদ্ধদেব তাঁর মত প্রচারে স্পষ্ট

নির্দেশ করেছেন যে তিনি যেমন আত্মবাদী কথিত শরীর নিগ্রহ সর্বস্ব জীবনের বিরোধী তেমনই বিরোধী নিয়ন্ত্রণহীন ভোগলালসা পূর্ণ জীবনের। পাঠকদের উপলব্ধির জন্য বলি, লোকায়ত বিদ্যা সম্পর্কে সমকালীন প্রচলিত ধারণা হলো **"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ"**। এই মত আসলে উত্তরপক্ষের উপহাসপ্রবণ উক্তি যা লোকায়ত নামে প্রচলিত হয়ে গিয়ে প্রবাদের আকার নিয়েছিল। যেমন আজো সাধারণের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত। নিয়ন্ত্রণহীন ভোগলালসা পূর্ণ জীবন কখনোই লোকায়তদের অভিপ্রেত নয়। তা প্রচলিত লোকায়ত উক্তি থেকেই বোঝা যায়। আসলে লোকায়ত মতে দূষণ ঘটানোর সকল রকম প্রয়াস এক সম্প্রদায়কে দিয়ে শুরু করানো হয়। সেই সম্প্রদায় তান্ত্রিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। যজমান সম্প্রদায় স্বমতরক্ষায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকারী কাপালিক সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে সাধারণের মনে ধাঁধার সৃষ্টি করাতেন। সাধারণ মানুষ সাধারণত লোকায়ত মত সম্পর্কে বিচলিত হত। তাছাড়া তো প্রশাসন পুষ্ট নিরবচ্ছিন্ন নিপীড়ন ছিল। ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়কার হরিভদ্র চার্বাক মতকে কটাক্ষ করে বলেছেন দৃষ্ট বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক অদৃষ্ট বিষয়ে মতি শঠতা ভিন্ন কিছু নয়। তাই চার্বাক মতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিজনিত প্রীতি নিরর্থক, কাম ব্যতীত কোন ধর্মই নেই। হরিভদ্রকে অনুসরণ করে গুণরত্ন লিখলেন "[107]**কাপালিকা ভস্মোদ্ধূলনপরা যোগিনোঃ ব্রাহ্মণাদ্যন্ত্য -জাতাশ্চ, কেচন নাস্তিকা ভবন্তি। তে চ মদ্যমাংসে ভুঞ্জতে মাত্রাদ্যগম্যা-গমনমপি কুর্বতে।** হরিভদ্রের শ্লোকে যা অন্তর্লীন ছিল গুণরত্নের বর্ণনায় তা পরিস্ফুট হয়ে যায়। লোকায়ত বা চার্বাক আসলে নীচ জাতীয় ব্রাহ্মণ ভাস্মলেপনকারী কাপালিকাদি নাস্তিক সম্প্রদায়। বিশেষ করে যারা পাপ পুণ্য নির্বিচারে মদমাংস চর্বণ ও ভক্ষণ করে। এমন কি মাতা প্রভৃতিতে গমন করে। এই সব শিষ্টাচার বহির্ভূত বর্ণনা থেকে আধুনিক বিদ্বানদের কেউ কেউ প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁরা এমন সিদ্ধান্তও করেছেন যে লোকায়তিক আসলে তান্ত্রিক-কাপালিকই। কিন্তু চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন কোন অংশেই তান্ত্রিক বা কাপালিক নয় বরং তাদের সম্পর্কে চার্বাক বা লোকায়তদের যে চরম অবজ্ঞা ছিল তা জানা যায়। যেমন লোকগাথা পাওয়া যায়—**ত্রিদণ্ডং ভস্মাবগুণ্ঠনম্। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি**

বৃহস্পতিঃ। ত্রিদণ্ড ধারণ ভস্মলেপনরূপ সন্ন্যাসের উপকরণ আসলে বুদ্ধি পৌরুষহীনদের জীবিকার উপায়। এই উক্তি কি কোন ভাবে প্রমাণ করে যে লোকায়তরা কাপালিক। অতএব এই প্রকার যুক্তি যে কোন ভাবেই হোক দেহাতিরিক্ত আত্মবাদবাদীদের অর্থাৎ দেহাত্মবাদ বিরোধীদেরই সাহায্য করবে। চার্বাক বা লোকায়ত মতে দূষণ ঘটানোর এমন প্রয়াস আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি যদি জয়রাশি ভট্টের 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ' আলোচনা করি। এই গ্রন্থ আলোচনার তেমন অবকাশ নেই। কিন্তু এই গ্রন্থ যে আসলে চরম ভাববাদ সর্বস্ব তা আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তত্ত্বোপপ্লবসিংহ কি সত্যিই লোকায়তিক বা চার্বাক পন্থী? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে উত্তরে বলেছেন "[১০৪]বিচারে আমরা সম্পূর্ণ নেতিমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। কেননা সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করলে স্বীকার করতেই হবে যে লোকায়ত মত মূলতই বস্তুবাদ; পক্ষান্তরে, জয়রাশি ভট্টর একমাত্র দার্শনিক আত্মীয়তা ভারতীয় দর্শনের চরম ভাব-বাদীদের সঙ্গেই—যে চরম ভাববাদের পরিচয় পাওয়া যায় শূন্যবাদী বৌদ্ধ এবং মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মধ্যে। অতএব, চরম ভাববাদের সহায়ক 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ' লোকায়ত-সম্প্রদায়ের এক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা ঘটে'। কালে কালে লোকায়ত দর্শনের চিরবিলুপ্তি ঘটানোর জন্য :প্রশাসনপুষ্ট যাজক সম্প্রদায় নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রশাসনিক নিপীড়ন ছাড়াও সাহিত্যে গাথায় নানা কৌশলে লোকায়ত মতে দূষণ ঘটানোর পরিকল্পনা হয়েছে। উত্তরপক্ষ যে সমস্ত বিদ্বেষব্যাঞ্জক শব্দ উল্লেখ করেছেন তার কোনটিই কোনভাবে ভূতবাদী লোকায়ত মতকে দুষ্ট করে না। গুণরত্ন বর্ণিত 'মদ্যমাংস' চর্বণ' রূপ পশ্বাচার লোকায়তিকদের উদ্দেশ্যে কখনোই প্রযুক্ত নয়। কেননা লোকায়ত নৃশংস পশুহত্যা বিরোধী, উপহাস করে বলেছেন যজ্ঞে পশু বলি দিলে যদি পশুর স্বর্গ প্রাপ্তি হয় তো যজমানগণ নিজের পিতাকে যজ্ঞভূমিতে বধ করেন না কেন? এমন যুক্তিবাদী লোকায়তিকগণ কি পশ্বাচার সর্বস্ব পঞ্চমকার

সাধনাকারী কাপালিক বা তান্ত্রিক হতে পারেন মাতৃগমনরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন ? সুবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকমাত্রেই এই লোকায়ত মতে দূষণ ঘটানোর প্রয়াসের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। এতক্ষণ চার্বাক দর্শনের পূর্বাপর বিকাশ পর্যালোচনা হলো, এবার আমরা মূল দর্শনের আলোচনা করব। এখানে চার্বাক দর্শন আলোচনার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। তাহলে বর্তমান গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য বিলম্বিত ও ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। তাই আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা চার্বাক দর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার প্রয়াস করেছেন তাঁদের উপনীত সিদ্ধান্তই তুলে ধরে এই দুরূহ কাজে ইতি টানব। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোকায়ত দর্শন গ্রন্থে গভীর বিশ্লেষণ সহকারে সিদ্ধান্তে এসেছেন 'লোকায়ত সংক্রান্ত যে তথ্যাবলী আজও সংরক্ষিত হয়েছে সেগুলিতে (বিশেষত লোকায়ত সংক্রান্ত প্রামাণিক লোকগাথাগুলিতে) লোকায়ত মতের চারটি বৈশিষ্ট্য বারবার উল্লিখিত হতে দেখা যায় : (১) দেহাত্মবাদ (২) স্বভাববাদ (৩) প্রতক্ষ্য প্রাধান্যবাদ এবং (৪) পরলোক বিলোপবাদ।' অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীও। অতএব আমরা এই নিরিখেই চার্বাক দর্শন আলোচনা করব।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ বেদ-উপনিষদে কখনোই কোন একটি ধারা হিসেবে নানান শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয় নি। বরং দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধারার ক্রমবিকাশই হলো বেদ-উপনিষদ। বেদ-উপনিষদে পরস্পর বিরোধী যে দুটি ধারা প্রচলিত তার একটি হলো বিদ্যা ও অপরটি অবিদ্যা একটি পরা ও অপরটি অপরা। চার্বাক দর্শন আলোচনার শুরুতে যে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারার কথা যে পরিভাষায় উল্লেখ করেছি তা হলো জন বা প্রজা দর্শন ও যজমান বা রাজ দর্শন। জনদর্শন লৌকিক, দেহাত্মবাদী আর রাজ দর্শন অলৌকিক, দেহাতিরিক্ত আত্মবাদী, সংক্ষেপে আত্মবাদী। বেদ-উপনিষদে মূল দ্বন্দ্ব তাই দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ বনাম দেহাত্মবাদের। দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ প্রশাসন পুষ্ট হয়ে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রচার ও প্রসারে গরিষ্ঠিতার দাবী করে। কিন্তু তা বলে দেহাত্ম-বাদকে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব হয় নি। বরং যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ বৈজ্ঞানিক সত্যের

পূর্বাভাসবাহী হিসেবে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। এই দেহাত্মবাদ বা ভুতচৈতন্যবাদ বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে সমানে সমান প্রতিপক্ষ হিসেবে যে প্রচলিত ছিল তা উপনিষদে এসে বিশেষ করে চোখে পড়ে। ঋগ্বেদে যে সমাজ পরিচালিত হয় তা আদিম সাম্যবাদী সমাজের সর্বশেষ ইংগিত-বাহী, তেমনি ইংগিতবাহী শ্রেণী সমাজেরও। অর্থাৎ ঋগ্বেদ হলো আদিম সাম্যবাদী সমাজের শেষ ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শুরুর সন্ধিক্ষণ। ঋগ্বেদে বারংবার বর্ণিত শব্দগুলি পরবর্তীকালের উপনিষদে বর্ণিত শব্দার্থ বহন করে না একথা যাস্ক. নিঘন্টু, নিরুক্ত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন দেবতা, ব্রহ্মণ্ ইত্যাদি শব্দ যে পদার্থবাচক তা উল্লেখ-এর দাবী রাখে না। ঋগ্বেদে উচ্চারিত ব্রহ্মণ্ শব্দ আসলে অন্ন বা ধন। অতএব সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়েই অন্ন চিন্তা বর্তমান যা মুখ্যত পার্থিব। সেখানে না আছে বিশুদ্ধচৈতন্য পরমসত্তার তত্ত্ব না আছে মোক্ষ যা আমরা দেখতে পাই উপনিষদ পর্যায়ে। উপনিষদের সমাজ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। ঋগ্বেদের গোষ্ঠী চেতনা উপনিষদে ক্রমশ শ্রেণী চেতনায় রূপান্তরিত। তার প্রকাশ সাহিত্য ও দর্শনে ঘটে। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। উপনিষদ পর্যায়ে আদি বেদ ঋগ্বেদকে তাই কটাক্ষ করা হয়েছে। কেননা বেদ সকল উপনিষদ যুগের স্বার্থবাহী নয় বরং পরিপন্থী। স্পষ্ট করে লেখা—ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র নাম সমষ্টি মাত্র শব্দ বিকার ব্যতীত অন্যকিছুই নয়। তাই ছান্দোগ্য উপ-নিষদের এক [109] জায়গায় লেখা—সোহহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ; শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশ্যেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি। এই সব শাস্ত্রই শব্দার্থসর্বস্ব, আত্মতত্ত্ব সেখানে না থাকায় শিখিনি, আপনাদের লোকমুখে শুনেছি যিনি আত্মাকে জানতে পারেন তাঁর কোন প্রকার শোকাদি কষ্ট থাকে না।

বেদ সম্পর্কে উপনিষদ সমূহে এমন কথা লেখা কেন? এর উত্তর খুবই স্পষ্ট। ঋগ্বেদে শরীরকেই আত্মন্ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঋগ্বেদের [110] দুটি সূক্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন ঋক এর উক্ত সূক্ত অবধারিত ভাবে শরীর বা দেহ অর্থেই আত্মন্ শব্দ ব্যবহৃত

হয়েছে : মেহনাৎ বনং করণাৎ লোমভ্যঃ তে নখেভ্যঃ। **যক্ষম্ সর্বস্মাৎ আত্মনঃ তম্ ইদম্ বি বৃহামি তে ॥ ১০।১৬৩।৫॥**

অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ লোম্নঃ লোম্নঃ জাতম্ পর্বণি পর্বণি।

যক্ষম্ সর্বস্মাৎ আত্মনঃ তম্ ইদম বি বৃহামি তে ১০।১৬৩।৬॥

অর্থাৎ প্রসবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হইতে লোম ও নখ হইতে, এমন কি তোমার 'সর্বাঙ্গ শরীর হইতে' (সর্ব্বস্মাৎ আত্মনঃ) আমি এই ব্যধিকে তাড়াইতেছি।

প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তথা হইতে তাহাকে তাড়াইতেছি।

এই বেদমন্ত্রে "আত্মন্" শব্দকে শরীর বা দেহ ছাড়া আর কোন অর্থে গ্রহণ করার সম্ভাবনা নেই…একথা অবশ্যই সুবিদিত যে ঋগ্বেদের সর্বত্রই আত্মন্ শব্দ এইভাবে শরীর বা দেহবোধক নয়। তবু উপরোক্ত বেদমন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবেই শরীর অর্থে আত্মন্ শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব ও উপেক্ষণীয় হতে পারে না।"

বৈদিক ঐতিহ্যেই দেখা যায়, এই আদিম ও স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের ধ্বংসস্তূপের উপরই পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব হয়েছিল। কেন না ঋগ্বেদে মোক্ষতত্ত্ব, দেহাতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব যেভাবে উপনিষদে প্রতিফলিত সেভাবে নেই, বরং বেদসমূহে কেবল পার্থিব সম্পদ কামনা, ইন্দ্রিয়াদি সর্বস্ব শরীরের গঠন, প্রকৃতি, সুখসম্পদ ভোগের প্রক্রিয়া ইত্যাদিই বর্ণিত। উপনিষদ সমূহে তাই দেখা যায় বেদাদি উক্ত আত্মরহস্যকে দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তহীন প্রচেষ্টা। উপনিষদের সর্বত্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের মত প্রকাশিত হয় দেহাত্মবাদ বনাম দেহাতিরিক্ত মতবাদের সূক্ষ্ম বিতর্কে। একদিকে দেহাত্মবাদ সর্বস্ব উক্তি[111] **ইদং মহদ্ভূতমনন্তপারং বিজ্ঞানঘন এতেভ্যঃ-ভূতেভ্যঃসমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।** অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই জগৎ, বিজ্ঞানময় সকল কিছুই ভূত পদার্থ থেকে উৎপন্ন আবার ভূতপদার্থেই বিলীন হয়, মৃত্যুর পর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এমন কি সংজ্ঞাও। অনুরূপভাবে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে[112]—**অশনায়েতি**

তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সৌম্য বিজানিহী নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। অন্নরসাদির পরিপাকেই শরীর রূপ শুঙ্গ (উৎপন্ন) হয়। অর্থাৎ শরীর কারণশূন্য নয়, অন্নই কারণ। এমন ধারা অনেক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা যায় কিন্তু তা না করে এরপর আমরা দেহাতিরিক্ত আত্মবাদের সমর্থনে উদ্ধৃতি উপস্থিত করি। [113] **আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়।** আত্মা বিজ্ঞান ময়। [114] **নেহ নানাস্তি কিঞ্চনঃ।** আত্মন্ ব্যতিরেকে কোন কিছুই নেই। এই আত্মাকে দর্শন করলে ও মনন করলে এই জাগতিক সকল পদার্থই দৃষ্ট, শ্রুত ও বিজ্ঞাত হয়। [115] **আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।** সমগ্র উপনিষদ জুড়েই এইভাবে দেহাত্মবাদ ও আত্মবাদের দ্বন্দ্ব বিকশিত হতে হতে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্য-বাদ স্পষ্ট রূপ রেখায় জনগণের হৃদয় উদ্বেলিত করে। যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে নেমে আসে প্রশাসন পুষ্ট যাজক সম্প্রদায়ের অহিংস তাণ্ডব। পুঁথিপত্র থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকদের সমাজ থেকে উৎখাত করার সকল রকম প্রয়াস শুরু হয়। আর তা কেবল অত্যাচারের মধ্য দিয়ে নয় বিকল্প জনচিত্ত আকর্ষণকারী সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। তা সত্ত্বেও লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের বিলুপ্তি ঘটানো যায় নি। তা নানাভাবে বিশেষ করে লোক কথার মাধ্যমে টিকে থাকে। সায়ণ-মাধবাচার্য এই সমস্ত লোককথাকে সূত্রাকারে সংগ্রহ করেন সর্বদর্শন সংগ্রহে। ভূতচৈতন্য বাদের সপক্ষে যে লোকগাথা তিনি সংগ্রহ করেছেন তা হলো···**অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ। চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে। কিম্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥** ভূমি, বায়ু, অনল ও অনিল এই চার ভূতপদার্থই তত্ত্ব। এই চার ভূতপদার্থের সমন্বয়েই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। যেমন কিন্ব প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে উৎপন্ন হয় মদশক্তি। অনুরূপ আর একটি সূত্র হলো...**পৃথিব্যপ্‌তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি, তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞা।** এই সকল ভূতপদার্থ থেকে যেমন শরীর উৎপন্ন হয় তেমনই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে উপবস্তু চৈতন্য ও উৎপন্ন হয়। ভূতান্যেব চেতয়ন্তে। অতএব আত্মা দেহ অতিরিক্ত কিছু নয়। শরীরই আত্মা। ···**চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ এব আত্মা।** দেহাত্মবাদ আরো স্পষ্ট করে একটা লোকগাথায় প্রকাশিত···**ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি**

কলেবরে। ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত শ্রেষ্ঠ ফল হলো কলেবর। ব্রহ্মাণ্ডে যে যে গুণের সমন্বয়, অনুরূপ গুণের সমন্বয় হলো কলেবরও।

দেহাত্মবাদ বা ভূত চৈতন্য বাদের সমর্থনে এই সকল প্রচারিত লোকগাথা পাওয়া যায়। ভূতচৈতন্যবাদের মূল তাৎপর্য হলো, আমাদের সামনে পরিদৃশ্যমান জগৎ অস্তিত্বশীল। এই জগৎ তার বৈচিত্র্যময় বস্তুরাজি সহ সত্য। সত্য কেননা দৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন জগৎ যদি অস্তিত্ববান ও সত্য হয় তো তার উদ্ভবের কারণ কি? চার্বাক দর্শন অনুযায়ী জগতের আদি কারণ হলো চার মহাভূত, যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। এই চার মহাভূতের সমন্বয়ের ফলশ্রুতি হলো এই জগৎ। গুণরত্ন তাঁর গ্রন্থ তর্করহস্যদীপিকায় স্বীকার করেছেন যে কোন কোন চার্বাক পন্থী মহাভূত হিসেবে আকাশকেও স্বীকার করেছেন। ...**কেচিৎ চার্বাকৈকদেশীয়া আকাশমপি পঞ্চমং ভূতং মন্যন্তে।** এই পঞ্চম মহাভূত ব্যোম বা আকাশ অধিকাংশ দর্শনেই স্বীকৃত। এইভাবে লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন অনুযায়ী জগতের চরম সত্তা হলো জড় বা বস্তু। জগতের যাবতীয় বস্তু এমনকি জীবদেহ এই চার উপাদান থেকেই উৎপন্ন। এখন প্রশ্ন যে জীবদেহ চতুর্ভূতাত্মক একথা না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু জীবদেহে যে চৈতন্যের প্রকাশ দেখা যায় সেই চৈতন্য কোথা থেকে আসে? তাও কি ঐ চার মহাভূত উৎপন্ন হয়। কেননা নিছক জড়বস্তুতে কখনোই চৈতন্যের প্রকাশ দেখা যায় না। এর উত্তরে চার্বাক মত হলো **'কিম্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ'।** কিণ্ব প্রভৃতি বিশেষ ধরনের উপাদান সমূহে মাদকতা লক্ষ্য করা না গেলেও অর্থাৎ মাদকতা বিহীন হলেও পরে যখন বিশেষ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সংরক্ষিত হয় তখন মাদক শক্তির উদ্ভব হয়। কেবল যে 'মদশক্তিবৎ'এর উদাহরণ লোকগাথায় বর্তমান তা নয় তাছাড়াও যে লোকগাথা পাওয়া যায় তাতে অন্য নানান উদাহরণের মধ্যে গুড়, পিষ্টক ও পানের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে ও চৈতন্যকে জড় ভূতের বিকার চিহ্নিত করে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে[116]—**তাম্বুল পূগচূর্ণানাং যোগা দ্রাগাহবোক্ষিম্।** পান, গুড়, পিষ্টক ইত্যাদি কিণ্ব দ্রব্যাদিতে যেমন আগন্তুক গুণের আবির্ভাব ঘটে ঠিক তেমনি চৈতন্যের অভাব বিশিষ্ট চতুর্মহাভূত শরীরের আকারে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপবস্তু বা আগন্তুক গুণ

হিসেবে চৈতন্যরূপ বিশেষ শক্তির উদ্ভব ঘটে। এইভাবে চার্বাক দর্শন প্রমাণ করে ভূত চতুষ্টয়ই হলো চৈতন্যভূমি। ষড়্‌দর্শন সংগ্রহে তাই বলা হয়েছে—ভূতচতুষ্টয়ং চৈতন্য ভূমিঃ। অতএব চৈতন্য কোন একটি জড় দ্রব্যের গুণ না হওয়া সত্ত্বে ও মিশ্রণের ফলশ্রুতি হিসেবে উদ্ভূত হয়, যেমন পান, সুপুরি, চুন স্বতন্ত্র রঙ ও গুণ সম্পন্ন হয়ে ও মিশ্রণে লাল রঙ উৎপন্ন করে। চৈতন্য দেহের একটি নতুন গুণ, শরীরের সর্বত্র বিরাজ করে, চৈতন্যের দেহাতিরিক্ত সত্তা, অর্থাৎ এক কথায় আত্মার পৃথক কোন সত্তা নেই। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। সাধারণ মানুষ চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই আত্মারূপে গ্রহণ করে থাকে, যেমন, আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন তাই দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ রূপে চিহ্নিত।

স্বভাববাদ

আমরা ইতিপূর্বে দেখলাম যে জাগতিক প্রাণাদি সকল কিছুই চতুর্ভূতাত্মক। এই চতুর্ভূত প্রত্যক্ষের বিষয়। অতএব এই চার মহাভূতই সত্য। পরবর্তী চার্বাকগণ লৌকিক অনুমানের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে পঞ্চ মহাভূত হিসেবে আকাশকেও স্বীকার করেছেন। এই মহাভূত সমূহের সমন্বয়ে এই জগৎ গঠিত। এখন প্রশ্ন এই মহাভূত সমূহ কিসের ভিত্তিতে সমন্বিত হয়? চার্বাক দার্শনিকগণ এর উত্তরে বলেছেন নিজেদের স্বাভাবিক ধর্ম ও ক্রিয়া অনুযায়ী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েই এই চার মহাভূত জগৎ গঠন করেছে। স্বভাবো জগতঃ কারণম্। স্বভাবই হলো এই জগতের কারণ। চার্বাক মতে বৈচিত্র্যময় জগতের বস্তুরাজি, দেশ, কাল, নিয়ম প্রভৃতিকে স্বভাববাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রতিনিয়ত শক্তিই তার স্বভাব।—স্বভাবঃ পদার্থানাং প্রতিনিয়ত শক্তি। স্বভাব নিয়ম অনুযায়ী বস্তুতে বস্তুতে অপরূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আগুন উষ্ণ, জল শীতল, বায়ু শীতল, কাঁটার তীক্ষ্নতা, মৃগ-পক্ষীর বৈচিত্র্য, আমের মিষ্টত্ব, নিমের তিক্ততা, স্বভাববশতঃ এসব সম্ভব হয়েছে। এদের কোন নিমিত্ত কারণ নেই—অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং

তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্‌ব্যবস্থিতিঃ। অথবা একই রকম আর একটি লোকগাথা …**কঃ কণ্টকানাং প্রকোরতি তৈক্ষ্ণ্য বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাঞ্চ। মাধূর্যমিক্ষো : কটুতাঞ্চ নিম্বে, স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্‌।** এইভাবে চার্বাক প্রমাণ করেছেন যে জড় উপাদান সমূহের আপন আপন স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে যেমন জগতের উদ্ভব ঠিক তেমনি স্বভাব নিয়মেই একদিন এই স্থিতবস্তুর প্রলয় ও ঘটে। অতএব সকল কিছুর কারণ হলো স্বভাবই। জগৎ জড় উপাদান সমূহের স্বাভাবিক পরিণতি বলায় চার্বাক কার্যকারণ তত্ত্ব স্বভাববাদ বলে চিহ্নিত। স্বভাববাদ অনুযায়ী স্বভাব সকল কার্যোৎপত্তির নিয়ামক হলেও স্বভাবের অন্য কোন প্রকার নিয়ামক নেই। স্বভাবে কোন প্রকার হেতুভাব নেই। স্বভাব তাই কারণ জন্য নয়…স্বতো ভাবে হ্যহেতুত্বম্‌।

এই স্বভাববাদকে কেউ কেউ যদৃচ্ছাবাদের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচার করেছেন। কিন্তু স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ এক নয়। স্বভাববাদী স্বভাবকে কারণ বলেন কিন্তু যদৃচ্ছাবাদ কোন নিয়মই মানে না। সকল কিছুই অকারণ, আকস্মিক, যদৃচ্ছাবস্তু উৎপন্ন হয়। অতএব স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ এক নয়। অথচ তত্ত্বসংগ্রহকার শান্তরক্ষিত স্বভাববাদিগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে একই স্বভাববাদের দুই প্রকার, এক প্রকার হলো যদৃচ্ছাবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। যেখান থেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন—কারণং বিনৈবং কার্যং ভবতি ইতি স্বভাববাদিনঃ। কিন্তু স্বভাববাদ অনুযায়ী সৃষ্টি মাত্র অহেতুক, অকারণ বা যাদৃচ্ছিক নয়। শান্তিরক্ষিত ইতিহাসের ভ্রান্ত উপলব্ধি থেকেই যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদকে একীভূত করেছেন দ্বৈত প্রকার চিহ্নিত করে। অথচ গীতাভাষ্যে মধুসূদন সরস্বতী[117] স্বভাববাদকেই স্বীকার করেছেন। ব্যাখ্যায় বলেছেন অদৃষ্ট-কারণ-অঙ্গীকার-বাদিগণ কিছুদূর গিয়েই জগৎ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় শেষ পর্যন্ত স্বভাববাদের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। অথচ অদৃষ্ট অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর ইত্যাদি স্বীকার না করে স্বভাববাদ অনুযায়ী এই জগতবৈচিত্র্য একথা স্বীকার করাই বাঞ্চনীয়। দৃষ্ট অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তো অদৃষ্ট কল্পনার অবকাশ কোথায়? অদৃষ্টাঙ্গীকারেহপি ক্বচিদ্ব গত্বা স্বভাবে পর্য্যবসানাৎ স্বাভাবিকমেব জগদ্বৈচিত্র্যমস্তু দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনামবকাশাৎ।

পত্যক্ষ প্রাধান্যবাদ

চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রাধান্যবাদ স্বীকৃত। চার্বাক বা লোকায়ত নামের সঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যক্ষই প্রধান প্রমাণ। প্রমাণ মানে প্রকৃষ্ট মান অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান। সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য জ্ঞান। এই সম্যক্জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারাই সম্ভব। সংস্কার-উৎপন্ন জ্ঞান স্মৃতি। স্মৃতিকে তাই প্রমাণ বলা যায় না। সংস্কার সদৃশ বস্তুর দর্শনের ফলে স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে সংশয় ও বিপর্যয় শূন্য বস্তুর সম্যক্ জ্ঞানই প্রমাণ। সেই হিসেবে প্রত্যক্ষ লব্ধ বস্তুই একমাত্র সৎ কেননা সম্যক্ অপরোক্ষ অনুভবের নামই প্রত্যক্ষ। যা প্রত্যক্ষ লব্ধ তাই বাস্তব। অনুমান সিদ্ধ পদার্থে যদিও বা কখনো সন্দেহ হতে পারে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পদার্থে তা কখনোই হয় না। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমানই একমাত্র নির্ভর যোগ্য। বিভিন্ন লোকায়ত সূত্র থেকে সংগৃহীত সূত্রগুলি হলো—**প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি চার্বাকাঃ। প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিনঃ। লোকায়তমেব শাস্ত্রং যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্।** এইভাবে চার্বাক দর্শন যে প্রত্যক্ষ প্রাধান্যবাদী তার সমর্থনে নানা উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যায়। সকল উদ্ধৃতির বক্তব্য যেহেতু একই রকম তাই আর কোন উদ্ধৃতি দিয়ে ভারাক্রান্ত করব না।

শুধু চার্বাক দর্শন যে প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে তাই নয় ভারতীয় দর্শন ইতিহাসে অন্যান্য সম্প্রদায় যারা অন্যান্য প্রমাণও স্বীকার করে তারা ও প্রত্যক্ষকে সকল প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হলো মূল প্রমাণ যাকে অবলম্বন করে অন্যান্য প্রমাণ হয়। তাহলে এই প্রত্যক্ষ কি? প্রত্যক্ষ হলো প্রতি + অক্ষ। বাহ্য বস্তুর প্রতি চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয়াদির যে সম্বন্ধ। ষড়দর্শনসমুচ্চয়ে লোকায়ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—**এতাবানেব লোকোইয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ** ঠিক অনুরূপ উদ্ধৃতি কমলশীলের : তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা থেকে ও করা যায়—**এতাবানেব পুরুষো যাবানিন্দ্রিয় গোচরঃ** অতএব চার্বাক মতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতই বিবেচ্য। এই ইন্দ্রিয় প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিত ব্যাখ্যাকল্পে লিখেছেন—**সন্নিবেশবিশেষে চ**

ক্ষিত্যাদীনাং নিবেশ্যত। দেহেন্দ্রিয়াদিসংজ্ঞেয়াং তত্ত্বং নান্য দ্বিবিদ্যত। **ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্ভূতের সন্নিবেশ** হলো এই দেহ, এই সন্নিবিষ্ট চতুর্ভূতই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। —**তৎ সমুদায়ে, বিষয়েন্দ্রিয় সংজ্ঞা।** লোকায়ত মতে তত্ত্ব হলো ভূত, তাই লোকায়ত মত ভূতবাদ নামে পরিচিত। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুরাজি চার মৌলিক পদার্থ যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ থেকে উৎপন্ন। এই চতুর্ভূতাত্মক পৃথিবী, বায়ু অগ্নি, ও জল থেকেই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উৎপত্তি। পৃথিব্যপ্স্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়সংজ্ঞা।

আমরা পূর্বেই বলেছি লোকায়ত মতে সম্যক্ অপরোক্ষ অনুভবই প্রত্যক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষ দুপ্রকার—বাহ্য ও মানস। চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বাহ্যবস্তুর যে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তা প্রত্যক্ষ। বাহ্য প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানে, জ্ঞান বাহ্য বস্তু থেকে সরাসরি আসে। আর মানস প্রত্যক্ষ হলো সুখ, দুঃখাদির যে সাক্ষাৎ অনুভূতি। এই যথার্থ প্রত্যক্ষ আবার সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ও। সংজ্ঞাদি বিশিষ্ট বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ হলো সবিকল্পক আর সংজ্ঞাদি ব্যতিরেকে কেবল বস্তুমাত্রের প্রত্যক্ষ হলো নির্বিকল্পক। এই প্রত্যক্ষ হলো সকল প্রকার প্রমাণের প্রমাণ। অনুমান, শব্দাদি জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ কেন্দ্রিক। যেমন অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত অনুমিতির জনক, তেমনই শ্রবণ প্রত্যক্ষ শব্দেরও শব্দার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হলে তবেই শব্দার্থ বোধ ঘটে। অতএব প্রত্যক্ষই একমাত্র নির্ভর যোগ্য প্রমাণ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ভ্রম প্রত্যক্ষ কি হয় না? কেননা ভ্রম প্রত্যক্ষে প্রতিভাত বিষয় নির্দিষ্ট দেশে ও কালে উপস্থিত না থাকলে ও অন্যত্র বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়াদি দোষ, দেশ কাল ব্যবধান ভ্রম প্রত্যক্ষের ভ্রান্তত্বের কারণ। যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য। অতএব ভ্রান্তপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কোন-ভাবেই বাধিত করে না।

চার্বাক মতে অনুমান সকল সময় যথার্থ ও নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানের উৎস নয়, সেই অর্থে অনুমান প্রমাণ নয়। অনুমান-উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি বলা হয়। অনুমিতির কারণ হলো ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্দোষনয়। ব্যাপ্তি হলো ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধ। হেতু অর্থে ব্যাপ্য, সাধ্য হচ্ছে ব্যাপক। অনুমান প্রমাণ-বাদী কথিত হেতু ও সাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষের পরিসীমার বাইরে

থাকায় এদের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ সকল সময় সংশয়ের বাইরে নয়, তথাকথিত ব্যাপ্তিজ্ঞান তাই সংশয়াত্মক। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে অনুমিতি তাও নিশ্চয়াত্মক নয়, সম্ভাব্য। অতীন্দ্রিয় ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কখনোই নির্দোষ হতে পারে না, কেননা তা প্রত্যক্ষগম্য কোন কালেই নয়। এইভাবে চার্বাক দর্শন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন অনুমান প্রমাণ নয়। কিন্তু তাই বলে লোকায়ত দর্শন অনুমানকে সরাসরি অস্বীকার করেছে তাই নয়। ব্যবহারিক জীবনে অনুমানের প্রয়োজনীয়তা কোনভাবেই অস্বীকার করার নয়। এই সব লৌকিক অনুমান প্রত্যক্ষ নির্ভর। লোকব্যবহারসর্বস্ব প্রত্যক্ষনির্ভর অনুমাণ যে প্রমাণ একথা লোকায়ত দর্শনে স্বীকৃত। কমলশীল তাঁর তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকায় লিখেছেন—**পুরন্দরস্ত্বাহ লোকপ্রসিদ্ধমনুমানং চার্বাকেরপীষ্যতে এব। যত্তু কৈশ্চিল্লৌকিকং মার্গমতিক্রম্যানুমানমুচ্যতে তন্নিষিধ্যত ইতি।** অর্থাৎ পুরন্দর প্রভৃতি পরবর্তী চার্বাক দার্শনিকগণ লৌকিক অনুমানকে স্বীকার করেছেন আর অলৌকিক অতীন্দ্রিয়সর্বস্ব অনুমানকে অস্বীকার করেছেন। লোকায়ত মতে অনুরূপ ভাবে শব্দ প্রমাণ নয়। কেননা শব্দ অনুমানেরই নামান্তর। অনুমানের দোষ শব্দকেও স্পর্শায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্ভর শব্দ-প্রামাণ্য চার্বাকমতে স্বীকৃত। শব্দ যখন অর্থ বোধক হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গম্য শব্দার্থ জ্ঞান যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয় সর্বস্ব শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষের অতীত, তা কখনো প্রমাণ হতে পারে না। —**ন হ্যাপ্তবাদা নিপতন্তি নভস্থলাৎ।** অতএব প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ যার উপর নির্ভর করে অন্যান্য প্রমাণাদি দাঁড়িয়ে আছে, সর্বপ্রমাণের শ্রেষ্ঠ, মূলীভূত প্রমাণই যেহেতু প্রত্যক্ষ, তখন প্রত্যক্ষের প্রাধান্যকে অস্বীকার করা যায় না। এইভাবে লোকায়ত দর্শন প্রত্যক্ষপ্রাধান্যবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন।

পরলোক-বিলোপ-বাদ

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে চতুর্ভূতাত্মক ইহলোকই একমাত্র সত্য। এই জগৎ ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় পরলোকের তত্ত্ব সম্পূর্ণতঃ অলৌকিক, কল্পনাপ্রসূত। ভূতবাদিগণ ইহলোককে সর্বস্ব বলে

মনে করে। ইহলোকসর্বস্ব ভূতবাদীদের কাছে তাই পরলোক তত্ত্ব এক উপহাসের বস্তু। সেই সুপ্রাচীন ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে ভূতবাদিগণ পরলোকতত্ত্বের বিলোপ সাধনে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত উভয় দিক থেকেই খণ্ডন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কঠ উপনিষদে আমরা পাই—অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী। ইহলোকই একমাত্র বর্তমান পরলোক বলে কিছু নেই। লোকায়ত মতে ভূতই পরমতত্ত্ব। সেখান থেকেই চৈতন্য বা আত্মার উৎপত্তি। অতএব অতীন্দ্রিয় আত্মা বলে কিছু নেই। সেই আত্মার মোক্ষ, অমরত্ব, জন্মান্তর ধর্মাচরণ ইত্যাদির প্রশ্ন অবান্তর। চার্বাক মতে—ভূতান্যেব চেতয়ন্তে। চেতনা বা আত্মা যেহেতু ভূত উদ্ভূত এবং শরীরসর্বস্ব তখন দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রশ্নই আসে না। চেতনা অতীন্দ্রিয় কোন ব্যাপার নয়—শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত এব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। শরীরেন্দ্রিয় সংঘাত বশতই চেতনা হয়। শরীর থেকে ভিন্ন অবস্থায় কখনোই চেতনা থাকে না।—**শরীরয়ো ভিন্নত্বাৎ তদ্ গতরয়োপি চিত্তয়ো নৈকঃ সন্তানঃ।** অতএব দেহ থেকে দেহে চৈতন্যের স্থানান্তর বা পুনর্জন্ম কখনোই সম্ভব নয়।—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। অতএব জন্মান্তরবাদ নেই, অতীন্দ্রিয় অমর আত্মা নেই স্বর্গ নেই, নরক নেই। **পশ্যামি শৃণোমীত্যাদি-প্রতীত্যা মরণ পর্যন্তং যাবৎ ইন্দ্রিয়ানিতিষ্ঠন্তি তানি এব আত্মা।** আমার দেখা, শোনা ও বিশ্বাসের মৃত্যু পর্যন্ত ইন্দ্রিয় সকলই হলো আত্মা।—**ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। নৈববর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।** স্বর্গ নরক, পরলোক তো দূরের কথা এমনকি মানুষে মানুষে যে সৃষ্ট ভেদাভেদ বর্ণাশ্রমধর্ম, সকলই মিথ্যা। তিনটি বেদের রচয়িতাদের ধূর্ত প্রলাপ প্রবক্তা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।—ধূর্তপ্রলাপস্ত্রয়ী। শ্রেণী-শাসনকে চিরায়ত করবার কৌশল হিসেবে বর্ণাশ্রম ধর্ম ফাঁদা হয়েছে। বেদের কর্তারা ভণ্ড ধূর্ত ও প্রবঞ্চক। **ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ। জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।** বেদের কর্তারা যে প্রতারক তার প্রমাণ বেদোক্তসূক্ত সকল। অধিকাংশই অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। একথা জানা সত্ত্বেও ধূর্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পারলৌকিক কার্যাদির বিধান দিয়েছেন। এই পারলৌকিক কার্যাদির বিধান ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ভিন্ন কিছুই নয়।—**ততশ্চ,**

জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্তিহ। মৃতানাং প্রেতকার্যাণি নত্বন্যদ্‌ বিদ্যতে ক্বচিৎ। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—**অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা।** অগ্নিহোত্র বেদপাঠ, ত্রিদণ্ড ধারণ ও ভস্মলেপন বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদের জীবিকা অর্জনের জন্য কাল্পনিক কৃৎকৌশল। আত্মার মোক্ষ বা অমরত্ব সম্পূর্ণতঃ অবান্তর। চার্বাক মতে—দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ। মোক্ষ বলতে যদি কিছুকে বোঝায় তো দেহের বিনাশেই সম্ভব। অতএব লোকায়ত মতে মরণই অপবর্গ বা মোক্ষ।—**মরণমেবাপবর্গঃ। মৃত্যুরেবাপবর্গঃ।** দেহের বিনাশই যেখানে মোক্ষ বলে চিহ্নিত তখন মৃত্যুর পর জীবের পরলোক প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব? মৃত্যুর পর যদি জীব পরলোক গমন করে তবে তার যাওয়া আসা স্বেচ্ছাধীন, তবে সে আত্মীয়স্বজনকে দেখার জন্য পরলোক থেকে ইহলোকে একবারও অবতরণ করে না কেন?—**যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ। কস্মাদ্‌ ভূয়ো না চায়াতি বন্ধুস্নেহ-সমাকুলঃ।** এসবই যজমান সম্প্রদায়ের স্বকপোল সৃষ্ট বিধান। কেননা মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখে জীব মাত্রেই মরণশীল। একবার জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত, তাকে কোনভাবে ঠেকানা যাবে না। শ্রাদ্ধ-তর্পণ, যাগ-যজ্ঞ, মূল্যবান বস্ত্র প্রদান সবেতেই যজমানের স্বার্থসিদ্ধি হয়। লোকায়ত দার্শনিকদের প্রশ্ন যদি এই সব যাগ-যজ্ঞাদি, শ্রাদ্ধতর্পণে কর্তা-ব্যক্তির, যে এসব করছে, তার পুণ্য লাভ হয় তবে যজমানগণ নিজেই নিজের পুণ্য অর্জন করে না কেন। যেমন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু বলি বা মৃত আত্মীয়ের প্রতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। লোকগাথা থেকে সংগৃহীত প্রশ্নগুলি হলো—**পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।** জ্যোতিষ্টম যজ্ঞে পশুবলি দিলে যদি পশুর স্বর্গলাভ হয় তো যজমানগণ তাদের পিতামাতাকে বলি প্রদান করে স্বর্গে পাঠান না কেন?—**স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ। প্রাসাদস্যোপরি-স্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥** অথবা, **গচ্ছতামিহজন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয়-কল্পনম্‌। গেহস্থকৃত শ্রাদ্ধেন পথিতৃপ্তিরবারিতা॥** অথবা, **মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং তেতৃপ্তিকারণম্‌। নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েচ্ছি-যাম্‌॥** শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে অন্নাদি

প্রদান করলে যদি সেই আত্মার তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে দূরদেশগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অথবা প্রাসাদের উপর বৃদ্ধপিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নাদি কেন ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাবে না ? এই সব বাস্তব সমালোচনার মাধ্যমে চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন পরলোক নেই,—**নাস্তি পরলোকঃ।** পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ।

লোকায়ত বস্তুবাদ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ ও বস্তুবাদ পাশাপাশি শ্রেণী সংগ্রামের দ্বন্দ্বমুখর পথেই অগ্রসর হয়েছে। ভাববাদ অনুযায়ী সকল কিছুর উৎস হলো চেতন, অর্থাৎ ভাববাদের মূল বক্তব্য বিষয় হলো চেতনই প্রধান, অপরপক্ষে বস্তুবাদ অনুযায়ী সকল কিছুর উৎস হলো বস্তু, অর্থাৎ বস্তুবাদের মূল বক্তব্য বিষয় হলো বস্তুই প্রধান। ভাববাদের সপক্ষে উক্তি হলো[১১৪]—**যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং, প্রাণ্ এজাতি নিঃসৃতম ॥** আর বস্তুবাদের সপক্ষে উক্তি হলো—**ভূতান্যেব চেতয়ন্তে।** এই ভাববাদ-বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[১১৫] ভারততত্ত্ববিদ রুবেনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন একদিকে যেমন যাজ্ঞবল্ক্য ভাববাদী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন অপর-দিকে তেমনি উদ্দালক পরিচয় দিয়েছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের। শুধু রুবেন কেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ চিন্তাবিদই এই মত পোষণ করেছেন। কিন্তু সঠিক প্রচার ও প্রসারের অভাবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ এ পর্যন্ত অবজ্ঞাত থেকে গেছে। অধ্যাপক দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একান্ত, অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বস্তুবাদের পরিমণ্ডলকে জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট আছেন। অবশ্য অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে জুটেছে উপেক্ষা, বঞ্চনা ইত্যাদি। কিন্তু বঞ্চনা তাঁকে বিবেকী ও প্রত্যয়নিষ্ঠ করেছে। তিনি ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের স্থান নির্ণয়ে সফলকাম হয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ধারা উপনিষদের যুগ থেকেই শুরু বিরোচন, আরুণি, উদ্দালক ঋষির ঐতিহ্য রক্ষা করেই পরবর্তীকালে কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বৃহস্পতি, চার্বাকের তীক্ষ্ণপাণ্ডিত্যে বস্তুবাদ ক্রমশ দার্শনিক

সম্প্রদায় রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু তা রাজন্যপুষ্ট পণ্ডিতদের বাধার সম্মুখীন হয়। অনিবার্য পরিণতি হিসেবে জোটে লাঞ্চনা পুঁথিপত্রের-বহ্ন্যুৎসব। তখন বস্তুবাদী প্রবক্তাগণ বেগতিক দেখে সরাসরি প্রচার ও প্রসারের পথ পরিহার করে বস্তুবাদী ধারা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ঘুরপথ বেছে নেন। বেদের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েই বস্তুবাদ পর্যালোচনায় রত ছিলেন। রাজন্যপুষ্ট পণ্ডিত সমাজ ও বিষয়টি উপলব্ধি করে ছদ্মবেশী ভাববাদীদের উক্ত দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করালেন। ফলশ্রুতি হিসেবে ভাববাদের প্রচার ও প্রসারই অব্যাহত থাকে। কারে প্রকারে বস্তুবাদী ধারায় ভাববাদী ধারার সংমিশ্রন শুরু হয়। লোকায়ত মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয়। লোক সাধারণকে গড়ে তোলা হয় সুবিধাবাদী করে। যখন দরকার বস্তু-বাদের বুলি কপচাও। আবার যখন দরকার তখন ভাববাদের নামাবলী আশ্রয় করো। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রচলিত প্রবাদ আহরণ করে বিষয়টি পরিষ্কার করব। যেমন লোকসাধারণে চারিয়ে দেওয়া প্রবাদ, দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' এবং পাশাপাশি 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। সাধারণ মানুষ নির্দ্বিধায় এই বিপরীত দ্বৈত সংস্কৃতি উচ্চারণ করে নিজেদের মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। তবু বস্তুবাদ টিকে আছে টিকে থাকবেও।

ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ প্রথম উন্মেষিত হয়েছিল লোকায়ত ভূতবাদের মধ্য দিয়ে। চতুর্ভূত থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি এমন কি চৈতন্যও। আর কেমন করে তা উৎপন্ন হয় তারও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লোকায়ত দর্শন উপস্থিত করেছে। যা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। যখন রাজন্যপুষ্ট প্রচারে, যজমানদের অপচেষ্টায় ক্রমশই কুসংস্কার লোকায়ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, অন্ধ বিশ্বাস বিচারের স্থান দখল করছিল তখন ভূতবাদী অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। লোকায়ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল-যুক্তিমদ্ বচনং গ্রাহ্যং। ঠিক তখনই রাজ্যন্যপুষ্ট ভাববাদ সদম্ভে বিশ্বাসের বেদীমূলে সকল কিছুকে সমর্পণ করতে কুহক বিস্তার করছে—**তর্কাপ্রতিষ্ঠ বা নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।** যখন ভাববাদ ঘোষণা করছে-ধর্মে মতি ভব। ধর্মে মতি দাও। তখন

ভূতবাদের ঘোষণা হলো—ন ধর্মাংশ্চরেৎ, ধর্মাচরণ করোনা। ধর্মানুষ্ঠান ধূর্ত যজমানদের সৃষ্টি, তাতে কোনপ্রকার ফললাভই হয় না। শুদ্ধ অন্তঃকরণই আসল, শুদ্ধ অন্তঃকরণ থাকলে সকল কাজে শুভ বা সকল অনুষ্ঠানই নির্মল হয়। **শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্বানুষ্ঠাননির্মলাঃ** অথচ এই লোকায়ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে অমানবিক ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ তান্ত্রিক ও কাপালিকদের যুক্ত করে লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার কতই না চেষ্টা হয়েছে। যখন ভাববাদ পারত্রিক সুখ, স্বর্গসুখের কথা বলছে তখন ভূতবাদ ঘোষণা করেছে, **সুখমেব পুরুষার্থঃ**। সুখই একমাত্র পুরুষার্থ। এই সুখ ইহজগৎ ছাড়িয়ে কোন অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয় না। তা নিছকই অলীক মিথ্যা। কেবল প্রত্যক্ষের উপলব্ধ সুখই একমাত্র সুখ। অলৌকিক অনুমান মিথ্যা। পারলৌকিক বিদ্যা বিভ্রান্ত করে। একমাত্র ঐহিক বিদ্যাই বিদ্যা। পারত্রিক মুক্তি, বলে কিছু নেই, সুখই মুক্তি। শৃঙ্খলাপূর্ণ, সংযত, নিষ্কলুষ জীবন যাপনেই সুখ। সমাজে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, স্বাধীন? —**সর্বাধাবিনির্মুক্তাঃ, নোত্তমাধমমধ্যমাঃ**। অর্থাৎ সকল প্রকার বাধামুক্ত, না উত্তম না অধম ব্যক্তিগণ। এইভাবে চার্বাকদর্শন বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষ লাভ করে যখন ঘোষণা করে ব্যক্তির মুক্তি নয় ব্যক্তির সামাজিক মুক্তিই মুক্তি। পরসুখবাদী চার্বাক দর্শন প্রতিটি মানুষকে মনুষ্যত্বের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সকল প্রকার জাতিভেদ ও বর্ণভেদ মুক্ত শুদ্ধাচার মানুষই মুক্ত মানুষ। অর্থাৎ ভূতবাদই প্রথম ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাববাদের পরলোক-কুহেলিকা থেকে মুক্ত করতে ইহলোকের দিকে লোক সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে যার পর নাই সচেষ্ট ছিলেন। এই ভাবে ভূতবাদই ব্যক্তির সার্বিক মুক্তির কথা প্রথম তত্ত্ব ও প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে উপস্থিত করেছে। সঠিক মুক্তি বলতে সামাজিক মুক্তি বোঝানো হয়েছে। যেখানে জাতি বর্ণ ভেদাভেদ, নারীপুরুষ ভেদাভেদ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদাভেদ থাকবে না। ভূতবাদই বস্তুবাদের ভিত্তি ভূমি বলা যায়। যেখান থেকেই পরবর্তী বস্তুবাদী চিন্তা ক্রম অগ্রসরমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য তার জন্য তাচ্ছিল্য উপেক্ষা, এমনকি যা ভূতবাদের বক্তব্য, বিষয় নয় তার বিকৃতরূপ পর্যন্ত

কদর্থের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। এ সবের মধ্য থেকেই ভূতবাদের মূল বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরতে হবে। সেখানে অসংযত আত্মসুখবাদ, বিতণ্ডা, নাস্তিক, পাষণ্ড, শুষ্ক-তর্ক বাবদূক ইত্যাদি যে অশালীন শব্দ সম্ভার চাপিয়ে দিয়ে ভূতবাদের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তা সচেতন ভাবে তুলে ধরে দেখাতে হবে যে এই সব ভূতবাদের মূল বক্তব্য বিষয়ের বিরোধী। অতএব সর্বৈব পরিত্যজ্য। কি জ্ঞানতত্ত্ব, কি পরাতত্ত্ব উভয় দিক থেকেই দেখা যায় লোকায়ত দর্শন বস্তুবাদ সর্বস্ব। অবশ্য এই বস্তুবাদকে বিংশশতাব্দী বিকশিত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সঙ্গে এক করে দেখা কখনোই সমীচীন নয়। খ্রীষ্টজন্মের সহস্র বর্ষ পূর্বে যখন বস্তুবাদের উন্মেষলগ্ন তখন নিশ্চয়ই আজকের পরিণত রূপ আশা করা যায় না। বরং বিস্ময়ের বিষয় এই যে পৃথিবীর বুকে ভূতবাদই প্রথম বস্তু থেকে চৈতন্যর উদ্ভবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লৌকিক উপায়ে হলেও উপস্থিত করেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে এমন কোন নজির আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু সঠিক গবেষণার অভাবে এবং বিকৃত প্রচারের ফলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের উন্মেষের বলিষ্ঠরূপ অন্তরালে থেকে গেছে। বরং গর্বের সঙ্গে একথা বলা যায় পৃথিবীর জ্ঞান গরিমা বিকাশের ইতিহাসে প্রাচ্যদর্শনের এই অগ্রসর চিন্তা কালে কালে ভবিষ্যৎ মনীষীদের আকৃষ্ট করবে। লোকায়ত দর্শন যে বস্তুবাদসর্বস্ব একথা প্রমাণিত হয়, যদি আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে মূল বক্তব্যগুলিকে উপস্থাপিত করি। ১। ভূতপদার্থই চেতন ও অচেতন সকল কিছুর সৃষ্টির উৎস। ২। প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, লৌকিক অনুমানাদিও প্রমাণ। ৩। পরলোক বিলোপের মাধ্যমে পরিদৃশ্যমান বস্তুবিশ্বই সত্য প্রমাণ করা। ৪। সার্বিক সুখবাদই মুক্তির সোপান। মহতো মহীয়ান ভেদাভেদহীন মানবতাবাদের চরম উৎকর্ষের উজ্জীবন। ৫। বিচারবাদের প্রতিষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাববাদ খণ্ডন

সূচনাতেই উল্লেখ করেছি ভাববাদ খণ্ডন, কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ পাঠকের মনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, কেননা তাঁরা এতদিন যে বদ্ধমূল ধারণা লালন করে এসেছেন তা হলো ভারতীয় দর্শনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র একটিই...ভাববাদী ঐতিহ্য, অধ্যাত্মবাদী ধারা। যদিও ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ এক নয় কিন্তু সাধারণ পাঠক তুল্য-মূল্য বিচার করতে অভ্যস্ত। কেননা অনস্বীকার্য সত্য হলো ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ সম্পূরক হিসেবে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত। প্রচলিত ধারণা যা তা হলো ভাববাদের বিশাল সম্ভার সহ বিস্তৃত ইতিহাস বর্তমান। এ পর্যন্ত আলোচিত তথ্য কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। ভাববাদের ইতিহাস কেবলমাত্র কয়েকজন উপনিষদীয় ঋষি, মহাযান ও অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই ভাববাদ বিরোধিতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তার খণ্ডনে কোন না কোন ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য যা তা হলো ভাববাদের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ভাববাদ বিরোধিতা অত্যন্ত গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। কেননা আইন সামাজিক প্রেক্ষা-পটের উপর দাঁড়িয়ে ভাববাদ রাজ-অনুগ্রহ পুষ্ট হতে পেরেছিল ঐতিহাসিক কারণেই। অপ্রতিরোধ্য প্রচারের জোরে সাধারণ্যে চারিত করতে পেরেছিল তার শেকড়। অবশ্য এর জন্য লোকায়ত ধারার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। শ্রেণী শাসনের দৌলতে শাসনে, তোষণে, উৎসবে, অশন-ব্যসনে সকলকিছুর মধ্য দিয়েই ভাববাদ চারানোর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও স্বতোৎসারিত লোকায়ত ধারাকে কোনভাবে মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞান প্রভাবিত মনন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের বিকাশের ইতিহাস চর্চায় বেশী বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছে। অনুসন্ধানী বিদ্বানমাত্রই নিজস্ব পরিসরে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনের ছত্রে ছত্রে ভাববাদ খণ্ডনের যে

উপল সদৃশ যুক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার সঞ্চয়নের প্রয়াস করে চলেছেন। ইতিমধ্যে এই প্রয়াস সাধারণ্যে ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। প্রচলিত শ্রেণীশাসনের প্রহর ঘন্টা দ্রুত বাজছে। তাই বেশী বেশী মনে পড়ছে সেই সব ঋষি-মনীষীদের কথা যাঁরা আর্থ-সামাজিক শাসন-অনুশাসন উপেক্ষা করে পরিবেশোপযোগী উপায় উদ্ভাবন করে ভাববাদ বিরোধিতার স্রোতকে বহমান করে রেখেছিলেন। গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখা যাচ্ছে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় কখনো অনুচ্চারিত রুদ্ধবাক তো ছিলেনই না বরং ভাববাদ বিরোধিতাকে রক্তমজ্জার পরিচর্যার মত সমান গুরুত্ব আরোপ করে অসীম ধৈর্য্যে সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সাধনায় রত ছিলেন। ভাববাদ বিরোধীদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় দেখেছি নানান প্রতিকূলতা কাটিয়ে নব নব উপায় উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ম বিচারশৈলী ও বুদ্ধিমত্তায় বস্তুবাদের মূল শিকড়কে শুধু যে সঞ্জীবিত রেখেছেন তাই নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে ভাববাদ খণ্ডন-রূপ শক্তি সামর্থ্যেরও পরিচয় রেখেছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের তুল্যমূল্য বিচার যুক্তিযুক্ত নয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের গতি একই রকম নয়। তাই দর্শনের অগ্রগতি বিচার সেই সেই পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী হওয়াই বাঞ্চনীয়। ভারতবর্ষে দর্শনচর্চা যত প্রাচীন ততই সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাচ্যের মানুষকে অবসর ও জ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। তেমনই সুযোগ করে দিয়েছে শাসন যন্ত্রকে। যার ফলে দর্শন চর্চা ক্রমশই কতৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। বিপরীতে শ্রেণী শাসন ও অত্যাচার এড়িয়ে বস্তুবাদ চর্চার গতি কখনোই সহজ স্বচ্ছন্দ হতে পারে নি। এই বস্তুবাদ সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। যত দিন গেছে ততই পণ্ডিত সম্প্রদায় কর্তৃপক্ষপ্রেমী হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় অধিকাংশ দর্শন সম্প্রদায়ই শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা ভাববাদের জালে যেন ধরা দিয়েছে। আসলে এ হলো শ্রেণীশাসন পুষ্ট পণ্ডিতদের কূৎ-কৌশল। আমাদের বর্তমান কর্তব্য হলো সেই সব দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তুলে ধরা ও শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়ের দর্শনচর্চার যে বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে তা দেখানো। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তা আলোচিত হয়েছে। দেখা গেছে যে শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়ের দর্শনচর্চা মূল স্রোত ধারার সঙ্গে

নিতান্তই বেমানান কষ্টকল্পিত ও সুপ্রযুক্ত নয়। সে কি বৌদ্ধদর্শন, জৈন-দর্শন, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন, সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এ ঘটনা দেখা গেছে। মূল সূত্রগুলি লোপাট হয়ে গিয়ে, না হয় ভিন্ন ব্যাখ্যায় পরবর্তী পর্যায়ে ভাষ্য-টীকায় নতুন নতুন চিন্তার আমদানি রপ্তানি ঘটিয়ে, প্রমাণ করানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ভারতীয় দর্শন কোন না কোন অর্থেই ভাববাদী। বর্তমান আলোচনার বিষয় হলো ভারতীয় দর্শনের বস্তুগত বিশ্লেষণের সাহায্যে জনমনে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার নিরসন করা।

ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় আলোচনার সময় বিশেষ করে বস্তুবাদ খণ্ডন অংশে দেখা গেছে যে প্রতিপক্ষ মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন —ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ খণ্ডনে। কেননা ভাববাদবিরোধী সম্প্রদায় কোন না কোন ভাবে এই তিনটি মতবাদকেই সমৃদ্ধ করেছে। এখানে উল্লেখের দাবী রাখে যে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি প্রচার যে এরা নাস্তিক। নাস্তিক শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে গৃহীত। তার স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। সাধারণে যা বুঝে থাকেন যে নাস্তিক কথার অর্থ হলো সকল কিছু নঙর্থক অর্থে উড়িয়ে দেওয়া ব্যাপার, আসলে তা নয়। বরং ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়গুলি যে শুধু নঙর্থক দিক থেকে ভাববাদ খণ্ডনরূপ কাজ সম্পন্ন করেছেন তাই নয় বরং বস্তুজগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব প্রতিপাদনে সদর্থক যুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে বলিষ্ঠ মতবাদ গড়ে তুলেছেন যা বস্তুবাদকেই কোন না কোন ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। অথচ ভাববাদী সম্প্রদায় যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছে ভাববাদ বিরোধীকে নাস্তিক আখ্যা দিয়ে অপাঙ্‌ক্তেয় করার সর্বৈব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। অবশ্য এতে একটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় নিজস্ব পরিধির মধ্যে থেকেও সকল সময় সচেষ্ট থেকেছে কি করে একটি সাধারণ মঞ্চ গড়ে তোলা যায় যাতে ভাববাদের জগৎ-মিথ্যা-তত্ত্বকে রোখা যায়। কিন্তু সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে এত অগোচরে অন্তর্লীনভাবে যে সাধারণ্যে সহজ উপলব্ধ হয়ে ওঠে নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়গুলিও নিজস্ব পরিধির মধ্যে আটকে থেকে দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান আলোচনা

তা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণ করেছে। অতএব বর্তমান অধ্যায়ে ভাববাদ খণ্ডন পর্যায়ে সম্প্রদায় গত বৈশিষ্ট্য দূরে সরিয়ে রেখে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ কিভাবে স্বাতন্ত্র্য ভুলে একযোগে ভাববাদ খণ্ডনে আত্ম নিয়োগ করেছেন তাই তুলে ধরব। আর এই বিচার বিশ্লেষণ থেকেই ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের সঠিক অবস্থান বেরিয়ে আসবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন ভাববাদ খণ্ডন আলোচনায় সমগ্র ভারতীয় দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা অনিবার্য কারণেই সম্ভব নয়। কি পরিসরে কি পরম্পরায়। বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ভূতবাদ ও প্রধানবাদ অংশে কোন প্রামাণ্যগ্রন্থ আজও গবেষণার বিষয়। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন সকল কিছুতেই একই সঙ্গে একজনের পক্ষে পাণ্ডিত্য অর্জন করা অকল্পনীয় ব্যাপার। এ হলো যৌথ গবেষণার বিষয়। একে অপরের দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া। এছাড়া এই উভয় সম্প্রদায়ের পরবর্তী এমন কোন দার্শনিক ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি যিনি বস্তুগত নিরিখে সাংখ্য ও লোকায়তকে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব ভূতবাদ ও প্রধানবাদের জন্য আমাদের সমগ্র কৃষ্টিকে তন্ন তন্ন করে পর্যালোচনা করতে হবে, সেখান থেকে উপলখণ্ড সংগ্রহ করতে হবে, হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। কিন্তু আজও পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে আমরা কয়েকজন প্রথিতযশা পণ্ডিতদের পাই যাঁরা তাঁদের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে ভাববাদ খণ্ডনের ধ্বজাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এঁরা হলেন শুভগুপ্ত, কুমারিল, অকলংক এবং বাৎস্যায়ন থেকে উদয়ন পর্যন্ত সত্যদ্রষ্টাগণ। এখন প্রশ্ন ভাববাদ খণ্ডন কিভাবে কোথা থেকে শুরু করা যায়। এর উত্তরে বলা যায় যে জগৎ মিথ্যা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ভাববাদী সম্প্রদায় ও দার্শনিকগণ মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন প্রমাণ খণ্ডনে। তেমনি স্বাভাবিক কারণেই ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় ও দার্শনিকগণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন প্রমাণ প্রতিষ্ঠায়। অতএব প্রমাণ প্রতিষ্ঠাই হবে ভাববাদ খণ্ডন আলোচনার প্রথম সূত্রপাত। এখনও প্রশ্ন থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠাই বা শুরু হবে কোথা থেকে। এর উত্তরে আবার আমাকে পূর্বের উল্লিখিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। ভূতবাদ বা প্রধানবাদের কোন স্বীকৃত গ্রন্থ

নেই। অতএব লোকায়ত বা সাংখ্য গ্রন্থ দিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নেই। আমাদের একমাত্র ভরসা পরমাণুবাদ। বিশেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়। বৈশেষিক সম্প্রদায় ঐতিহাসিক কারণে যতখানি জগৎ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছে, ততখানি গুরুত্ব সহকারে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করেছে ন্যায় সম্প্রদায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত। অতএব প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় আমাদের অন্যতম নির্ভর গৌতমের ন্যায়সূত্র। ন্যায়সূত্রে গৌতম প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রমাণ প্রতিষ্ঠা

সেই বেদ উপনিষদের যুগ থেকে শুরু করে ভাববাদ বিকাশের চরম স্তর পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে ভাববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সাধারণ জ্ঞানের জগৎকে যে কোন ভাবে নস্যাৎ করা। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সাধারণ জ্ঞান উদ্ভূত অভিজ্ঞতার জগতের অস্তিত্ব প্রতিপাদনকে প্রধান ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে অধিকাংশ মুহূর্তই ব্যয় করেছে। অর্থাৎ ভাববাদী সম্প্রদায় স্বীকৃত অভিজ্ঞতার জগৎকে যখন ত্যজ্য ঘোষণা করেছে তখন ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সেই স্বীকৃত অভিজ্ঞতার জগতকে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের প্রথম আহ্নিকেই প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মহর্ষির মতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ভাষ্যের আরম্ভেই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—**প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্**। প্রমাণ ব্যতীত অর্থের প্রতিপত্তি যথার্থ বোধ হয় না। আর অর্থের প্রতিপত্তি অর্থাৎ যথার্থ বোধ না হলে প্রবৃত্তির সাফল্য হয় না। জ্ঞাতার যখন যথার্থবোধ হয় তখন তাঁর বস্তুটিকে গ্রহণ বা পাওয়ার ইচ্ছা হয় এবং বর্জন কিংবা ত্যাগ করার ইচ্ছা হয়। তখনই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। অতএব প্রমাণ হলো সফল প্রবৃত্তির জনক প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ পদার্থটি যে রূপ ও

যে প্রকার যখন সেইরূপ ও সেই প্রকারেই উপস্থিত হয় তখন কোন সফল প্রবৃত্তি জন্মে। এইভাবে বাৎস্যায়ন অর্থবৎ শব্দটির সাহায্যে অর্থের নিত্য-যোগ ও অব্যভিচারিতা প্রতিপন্ন করেছেন। বস্তুটি যা সেই রূপেই যখন উপস্থিত হয়, অন্যথা হয় না, তাই অব্যভিচারিতা। অতএব অভীষ্ট লাভের ক্ষেত্রে বাৎস্যায়নের স্পষ্ট নির্দেশ পদার্থে প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধি বা তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব উপলব্ধি হলো বস্তুটি যে রূপ সেই রূপে জ্ঞায়মান হওয়া। যা প্রমাণসিদ্ধ নয় তাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না।

মহর্ষি গৌতম প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলেছেন। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব উপলব্ধিবশতঃই প্রমাতা সুখদায়ক বস্তু গ্রহণ করে এবং দুঃখদায়ক বস্তুকে বর্জন করে। অনেক সময় নানান প্রতিবন্ধকতাবশতঃ এমনও হতে পারে যে প্রমাতা সুখদায়ক বস্তু গ্রহণ করে না অর্থাৎ কাম্য জেনেও তা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বস্তুটি সুখ দান যোগ্যতা রহিত। ঠিক অনুরূপভাবে দুঃখদায়ক বস্তু প্রমাতা প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ যদি ত্যাগ নাও করতে পারে তবুও ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে দুঃখ-জনক বস্তু দুঃখ দানের যোগ্যতা রহিত। প্রমাতা তখনই কোন বস্তুকে ত্যাগ করে যখন প্রমাণের সাহায্যে তত্ত্ব উপলব্ধি করে যে বস্তুটি সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক কোনটিই নয়। সুতরাং প্রমাণ প্রমাতাকে অর্থবোধের মাধ্যমে তত্ত্ব উপলব্ধিতে পেঁছে দেয়। তার ফলে প্রমাতার গ্রহণ, বর্জন বা উপেক্ষার মাধ্যমেই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে তত্ত্ব কি? বাৎস্যায়ন এর উত্তরে বলেছেন পদার্থের প্রকৃত ধর্মই হলো তত্ত্ব। অর্থাৎ যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম তাই তার তত্ত্ব। যা প্রমাণসিদ্ধ নয় তা তত্ত্ব নয়। তাই জ্ঞায়মান পদার্থ ধর্মই তত্ত্ব। পদার্থ দুপ্রকার, যথাক্রমে সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব। সৎ-পদার্থের সদ্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অসদ্ভাবই হলো তত্ত্ব। সৎ পদার্থকে সৎ ও অসৎ পদার্থকে অসৎ এই প্রকার বুঝলেই তত্ত্ব বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন, ভাব পদার্থের প্রমাণ হয়, কিন্তু অভাবের, যা নেই তার আবার প্রমাণ থাকে কি করে? নৈয়ায়িক মতে অভাবও প্রমাণসিদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে ভাষ্য-কার বাৎস্যায়ন বলেছেন যে অন্ধকার ঘরে চোর ঢুকেছিল কিন্তু পরবর্তী-কালে সেই অন্ধকার ঘরে যদি একটি বালকও প্রদীপ নিয়ে ঢোকে তবে সেও

বলতে পারবে যে ঘরে চোর নেই। চোরের অভাব বালকটি বুঝেছে তাই বলেছে চোর নেই। অতএব অভাব প্রমাণসিদ্ধ।

শুধু নৈয়ায়িকগণই নয় সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ও দার্শনিকই প্রমাণকেই একমাত্র বৈধ জ্ঞানের উৎসরূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রমাণ হলো প্রকৃষ্ট মান। যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়কে প্রমাণ বলে। এই প্রমাণ কত প্রকার তা নিয়ে দর্শন সম্প্রদায় ও দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। যদিও দার্শনিকদের মধ্যে প্রমাণ কতপ্রকারের হবে বা হতে পারে এ নিয়ে মতভেদ বর্তমান কিন্তু সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষই হলো প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় প্রত্যক্ষকে বলা হয়েছে—**প্রমাণ জ্যেষ্ঠ**। প্রত্যক্ষের পরই আসে অনুমান। এই দ্বিবিধ প্রমাণ সম্পর্কে সকল ভাববাদ বিরোধী দর্শনই একমত। যদি ও চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে অনুমান প্রমাণ তাঁদের মতে অসিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীষণ, পুরন্দর প্রমুখ চার্বাক দার্শনিকগণ বাস্তবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুমানকে স্বীকার করেছেন। ইতি পূর্বেই এমন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি অতএব চার্বাক দর্শনে অনুমানকে নস্যাৎ করা হয়েছে তা সর্বাংশে সত্য নয়। তাই একথা বলা যায় যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দু প্রকার প্রমাণ সম্পর্কে সকল ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় একমত। ফলে প্রমাণ আলোচনা প্রত্যক্ষ দিয়েই শুরু করব।

প্রমাণেষু প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠং, প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এ কথা সকল ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়েই স্বীকৃত। প্রতিপক্ষের কটাক্ষ থেকে জানা গেছে যে লোকায়ত দর্শন সম্পূর্ণতঃই জ্ঞানতত্ত্ব নির্ভর এবং জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় সকল গুরুত্ব প্রত্যক্ষেই সীমাবদ্ধ। **প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্।** প্রত্যক্ষ হলো মূল প্রমাণ। সকল প্রমাণের প্রামাণ্যের জনক। পৃথিবীর সকল বস্তুই দুভাগে বিভক্ত, প্রমাণ ও প্রমেয়। এছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগই প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষই হলো বৈধ, নির্ভুল ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। পরবর্তী চার্বাকগণ বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুমানাদি প্রমাণ ও স্বীকার করেছেন। যেহেতু শরীরেন্দ্রিয় বিষয়ই সংজ্ঞা তাই অতীন্দ্রিয় কোন কিছুই চার্বাক দর্শনের স্বীকৃত নয়। অনুরূপভাবে সাংখ্য দর্শনের মূল গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও প্রাপ্ত তথ্য থেকে

জানা যায় প্রত্যক্ষকে, '**প্রমাণেষু জ্যেষ্ঠত্বাৎ**'—বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে সাংখ্যদর্শনেও স্বীকার করা হয়েছে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জনিত নিশ্চয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন[1]—**প্রতি বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং**। কেবল চার্বাক বা সাংখ্য দর্শন নয়, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা, প্রমাণ কয় প্রকার এই নিয়ে বিতর্ক করলেও প্রত্যক্ষ যে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ আর সবই পরোক্ষ এ বিষয়ে একমত। আর প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ নিশ্চয় জ্ঞান রূপে প্রত্যক্ষ ঘটে সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ই স্বীকার করেছেন। এদের সকলের যদি একটি একটি করে শ্লোক উদ্ধৃত করা যায় তো পরিসরই বৃদ্ধি পাবে। তার প্রয়োজনও নেই। বরং যা আশু প্রয়োজন তা হলো ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় কোন্ পদ্ধতিতে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই পদ্ধতিকে তুলে ধরা। অবশ্য তা তুলে ধরার পূর্বে উভয় পক্ষের মূল তাৎপর্য বিষয়কে সূত্রাকারে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ভাববাদী দার্শনিক সম্প্রদায় যখন প্রমাণ ও প্রমাণের উৎসগুলিকে সরাসরি অস্বীকার ও নস্যাৎ করেছেন ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় প্রমাণ ও প্রমাণের উৎসগুলিকে যথার্থ বলে স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় যখন প্রমাণ ও প্রমাণের উৎসগুলির অযথার্থতা বা অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য কূৎ-কৌশল অবলম্বন করেছে তখন ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়গণ প্রমাণ ও প্রমাণের উৎসগুলিকে শুধুমাত্র স্বীকার করেই ক্ষান্ত হন নি তার ভিত্তিতে বাহ্য বস্তু জগতের উপর তার প্রতিফলন ঘটিয়ে যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ আত্মিক প্রয়াস করেছেন। এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা নিয়েই প্রমাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যোগে প্রচেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো ভাববাদ বিরোধী এই সকল সম্প্রদায় কিভাবে তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, কিভাবেই বা প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের মধ্য দিয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছে তার চিত্র তুলে ধরা।

এখন প্রশ্ন কোন্ ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রমাণ প্রতিষ্ঠার রীতি

অবলম্বন করে শুরু করব। এই প্রশ্ন ইতিপূর্বেই আলোচিত। ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদের সপক্ষে আলোচনা কালে পরমাণুবাদীদের গ্রন্থই বিশ্লেষণ করার সুযোগ বর্তমান। কেননা উক্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়। পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন চিহ্নিত। আর জ্ঞানতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় ন্যায় দর্শন অগ্রগণ্য। কারণ ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অধিক গুরুত্ব সন্নিবেশিত। তাই ন্যায়সূত্রে গৌতম কৃত রীতি দিয়েই প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর্যালোচনা শুরু করব। আধুনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ন্যায়সূত্রের প্রমাণ প্রতিষ্ঠার রীতিকে সপ্রশংস ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য এখানে তুলে ধরলাম। [৪]"ন্যায়সূত্রে প্রমাণ ইত্যাদি পদার্থগুলির আলোচনায় একটি বিশিষ্ট রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে তিনটি ধাপ আছে বলা যেতে পারে: যেমন উদ্দেশ্য, লক্ষণ এবং পরীক্ষা। প্রথমতঃ পদার্থগুলির শুধুমাত্র নাম করে করে বলে দেওয়া হলো উদ্দেশ্য। যেমন প্রথম সূত্রেই ষোলটি পদার্থের উদ্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ একটি পদার্থের অসাধারণ ধর্মটি—যে ধর্মটি অন্য কোন ধর্মে থাকে না এবং পদার্থটিকে চিনে নিতে সাহায্য করে-বলে দেওয়া হলো লক্ষণ। যেমন পরবর্তী চতুর্থসূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত একটি পদার্থ নিয়ে যুক্তি-তর্ক দিয়ে আলোচনা, ঐ বিষয়ে বিরুদ্ধমত খণ্ডন ইত্যাদির নাম হলো পরীক্ষা।" প্রমাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হব। প্রথমে বলি ভূতবাদ ও প্রধানবাদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষই প্রমাণ জ্যেষ্ঠ বা প্রধান প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও প্রত্যক্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলা হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের সত্তা ছাড়া কোন প্রমাণেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। কোন প্রমাণ বলতে এখানে পরোক্ষ প্রমাণের কথাই বলা হয়েছে। অতএব ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুযায়ী প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হলে জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যার অধিকাংশই মিটে যায়। এখন ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ কি? প্রত্যক্ষ হলো প্রতি+অক্ষ। অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ তাই তিনটি বিষয়কে সূচিত করছে।[৫] —ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় ও প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশত-

নিশ্চিত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। প্রত্যক্ষ হলো বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ। যেমন আমার সামনে অবস্থিত ঘটের সঙ্গে যখন আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে ঘটের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার যে সুনিশ্চিত ধারণা গঠিত হলো তাই প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের সময়, বিষয়, ইন্দ্রিয় মন, বাহ্য সহকারী কারণ ও আত্মার উপস্থিতি অনিবার্য। এদের মধ্যে কোন একটির যখন অনুপস্থিতি ঘটে তখন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়। মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনিও স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন বস্তুবিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে প্রমাতা পুরুষের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা প্রত্যক্ষ[4]—**সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ।** অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনেও ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। এইভাবে আমরা দেখতে পাই সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ই কোন না কোন ভাবে সমগ্র জগতকে প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে প্রমাণ ও প্রমেয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট তাঁর মানমেয়োদয় গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন যে—মানমেয়বিভাগেন বস্তূনাং দ্বিবিধা স্থিতিঃ। মান অর্থাৎ প্রমাণ, আর মেয় অর্থাৎ প্রমেয়। জগতের সকল কিছু প্রমাণ প্রমেয়ের অন্তর্গত। ভাববাদী দার্শনিকগণ যখন সরাসরি এই বস্তুজগতকে অস্বীকার করেন ভাববাদ বিরোধীগণ সেই বস্তুজগতকে স্বীকার করে প্রমাণ প্রমেয় এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। আর সম্পূর্ণতই প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন। ভাববাদীগণ তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে সেই প্রমাণকে নস্যাৎ করেছেন। এই মূল দ্বন্দ্ব ভাববাদ ও ভাববাদ বিরোধীদের মধ্যে শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ভারত দর্শন সম্ভার গড়ে তুলেছে।

প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় মহর্ষি গৌতম প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ করে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐ সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পদার্থের লক্ষণ ও তার পরীক্ষায় আবশ্যকতা ব্যক্ত করেছেন। পদার্থ সমূহের নামোল্লেখে যে শুধু উদ্দেশ হয় তাই নয় তার প্রকারভেদ অর্থাৎ বিভাগও চিহ্নিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, মহর্ষি গৌতমও পদার্থ সমূহের মূল দুই ভাগে প্রমাণ ও প্রমেয় স্বীকার করেছেন।

জগতের সকল কিছুই প্রমাণ ও প্রমেয়ের অন্তর্ভূক্ত, এখন উদ্দিষ্ট বস্তুটিকে বুঝতে হলে তার লক্ষণ জানা প্রয়োজন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অতত্ত্ব-ব্যবচ্ছেদক ধর্মকে লক্ষণ বুঝিয়েছেন। অতত্ত্ব বলতে বোঝায় তদভিন্নত্ব। উদ্দিষ্ট পদার্থটি অর্থাৎ সেই পদার্থটি অন্য সমস্ত পদার্থ থেকে ভিন্ন। এক কথায় পদার্থ বোধক অসাধারণ ধর্মই তার লক্ষণ। আর পদার্থটির যেরূপ লক্ষণ বলা হয় সেই পদার্থটি সেই রূপ উপস্থিত কিনা তার প্রমাণ সহ বিচারই হলো পরীক্ষা। সমগ্র ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় প্রমাণকে আবার মূল দুই ভাগে বিভাগ করেছেন—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষই প্রমাণের প্রধান উৎস। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সরাসরি সংযোগ জনিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ নির্ভর অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে অনুসরণ করেই হয়। অতএব প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চয়ই প্রমাণ প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ উৎপন্ন জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগবশতঃ যে জ্ঞান হয় তাই প্রত্যক্ষ। জৈমিনির মতে সৎ সম্প্রয়োগে সন্নিকর্ষবশতঃ পুরুষের যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ মাত্রই সৎ, আর সৎ-প্রত্যক্ষ মাত্রই যথার্থ। অনিমিত্ত এই প্রত্যক্ষ কখনোই ভ্রান্ত হয় না। কারণ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সংযোগ ঘটে। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিস্থাপন করে প্রত্যক্ষ নির্ভর পরোক্ষ প্রমাণ সমূহের প্রামাণ্য নিশ্চয়কে স্বীকার করেছেন, ভাববাদী দার্শনিক সম্প্রদায় প্রমাণ সমূহের সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করেছেন।

মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষের বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন এই ভাবে যে তাঁদের মতে—[৮]প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ। প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণ সমূহের কোন প্রামাণ্য নেই। কারণ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোন কালেই তাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। প্রমাণ প্রমেয়কে প্রকাশ করে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে প্রমাণ কি প্রমেয়ের পূর্ববর্তী, পরবর্তী, না সমকালীন? যদি পূর্বেই সিদ্ধ হয় তো ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগ থেকে প্রত্যক্ষ হয় একথা বলা যায় না। যদি প্রমাণ পরে সিদ্ধ হয় তো প্রমেয়ত্ব প্রমাণের অধীন একথা বলা যায় না, আর প্রমাণ-প্রমেয় যদি সমকালীন হয় তো একের পর এক

জ্ঞান হয় একথা বলা যায় না। পূর্ব পক্ষীদের উত্তর হিসেবে মহর্ষি গৌতম বলেন প্রমাণ খণ্ডনের মধ্যেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বর্তমান। তাঁদের মতে প্রমাণের প্রামাণ্য তিনটি কালের কোন কালেই সিদ্ধ হয় না। তাহলে প্রশ্ন হয়, এই প্রতিষেধ বাক্যটি কি প্রমাণ? অনুরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় এই প্রতিষেধ বাক্যটি প্রতিষেধের পূর্ববর্তী, পরবর্তী, নাকি সমকালীন? পূর্ব-পক্ষীর নিজের জালের মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়। প্রতিষেধ বাক্যটি তাৎপর্য হারায়। তাছাড়া প্রশ্ন জাগে পূর্বপক্ষী প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন কি প্রমাণের ভিত্তিতে করেছেন? এককথায় প্রমাণের প্রামাণ্য নেই, এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি? যদি বলেন প্রমাণ নেই, তাহলে তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না, যদি বলেন প্রমাণ আছে তাহলে প্রমাণের প্রামাণ্যই বা অস্বীকার করেন কি করে? সুতরাং প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন হয় না। আর ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ও প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ প্রমেয়র পূর্ববর্তী, পরবর্তী ও সমকালীন তিন রকমই হতে পারে। আসলে প্রমাণ প্রমেয় হলো আপেক্ষিক। বর্তমানে যা প্রমাণ পরে তাই প্রমেয় হয়ে যায়। চিরকালের জন্য কোন বস্তুকে প্রমাণ প্রমেয় চিহ্নিত করে দেওয়া যায় না। বিচার অনুযায়ী প্রমাণ প্রমেয় ভাব পরিবর্তিত হয়। ঘট প্রত্যক্ষে চোখ দিয়ে যখন ঘট দেখি তখন চোখ প্রমাণ, কিন্তু চোখের বৈশিষ্ট্য বিচারের সময় চোখ হয়ে যায় প্রমেয়। এই ভাবে ভাববাদ বিরোধীগণ ভাববাদের প্রমাণ খণ্ডন বিচার করে প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রত্যক্ষ বিচারে বিষয়টি আরও প্রতিষ্ঠিত হবে।

পূর্বপক্ষী প্রত্যক্ষের লক্ষণ ব্যাখ্যায় অসম্পূর্ণতার কথা তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষের লক্ষণে ইন্দ্রিয়-বিষয় সংযোগ উল্লেখিত হয়েছে 'আত্ম মন সংযোগ' ও যে কারণ তার উল্লেখ নেই। ফলে প্রত্যক্ষের লক্ষণ সম্পূর্ণ নয়। ভাববাদীদের এই যুক্তির উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলেন প্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী হলেই যদি কারণ বলতে হয় তো অনেক কিছুকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শুধু আত্ম-মন-সংযোগ কেন দিক, দেশ, কাল, আকাশকে ও কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। এইভাবে মহর্ষি গৌতম বলেছেন কেবল মাত্র, অন্বয়বশতঃ কারণ চিহ্নিত হয় না। অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ের সাহায্যে কারণ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় বিষয় সন্নিকর্ষে অন্বয় ও ব্যতিরেক

উভয়ই বর্তমান। দিক, কাল, দেশ, আকাশ ইত্যাদিতে ব্যতিরেক না থাকায় কারণ হয় না। অবশ্য ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে ও ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ অন্বয় ও ব্যতিরেক বশতঃ সিদ্ধ কারণ। এখন প্রশ্ন উভয়েই যেহেতু কারণ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের উল্লেখ করা হলো কেন? এর উত্তরে মহর্ষি বলেন যে আত্মা মনঃ সংযোগ সকল প্রকার জ্ঞানের কারণ কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে কেবল প্রত্যক্ষের কারণ। এমনকি ইন্দ্রিয় মনঃ সংযোগ সকল রকম প্রত্যক্ষের কারণ ও নয় যেমন মানস প্রত্যক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষের কারণ হিসেবে আত্ম মনঃ সংযোগ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ প্রধান। কেন না প্রধান ও অপ্রধানের মধ্যে প্রধানের দ্বারাই জ্ঞান বিশেষিত হয়ে থাকে যেমন রসজ্ঞান, রূপজ্ঞান ইত্যাদি। তাই প্রত্যক্ষের লক্ষণে অনিবার্য অসাধারন কারণ হিসেবে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে উল্লেখিত হয়েছে, অসম্পূর্ণতার প্রশ্নই আসে না। পরস্পর বিরোধিতা অবান্তর।

ভাববাদীরা প্রত্যক্ষ খণ্ডনে এবার আর একটি যুক্তি উপস্থিত করেছেন যে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ বশতঃ যে প্রত্যক্ষ জন্মে তা কিন্তু আসলে অনুমানই। যেমন বৃক্ষ-প্রত্যক্ষে বৃক্ষের যে জ্ঞান হয়, এ বস্তুত: অনুমান কেননা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে সমগ্র বৃক্ষ বিষয় হয় না, বৃক্ষের একাংশ অর্থাৎ সামনের অংশ দেখেই বৃক্ষ বলে বুঝে থাকে, বৃক্ষের সর্বাংশ কেউ দেখে না, দেখা সম্ভব নয়। সামনের অংশ তো আর বৃক্ষ নয়, অতএব বৃক্ষজ্ঞান বলা যায় না, অথচ বৃক্ষ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত' অথচ প্রত্যক্ষ এখানে অলীক। প্রত্যক্ষ নামে অতিরিক্ত পৃথক কোন প্রমাণ নেই। মহর্ষি গৌতম ভাববাদীদের এই প্রকার যুক্তির মধ্যে কোন প্রকার সারবত্তা খুঁজে পাননি। সমগ্র বৃক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ কিনা এ নিয়ে বিতর্ক থাকলে থাকুক কিন্তু বৃক্ষের সামনের অংশের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তা তো পূর্বপক্ষীগণ স্বীকার করেছেন তাহলে প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণ নাই একথা বলেছেন কি করে? আর প্রত্যক্ষ কখনোই অনুমান হতে পারে না, কারণ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্য, কিন্তু অনুমান এমন নয়। অনুমানে হেতু সাধ্য ও পক্ষ আবশ্যক, প্রত্যক্ষে তা নেই। অতএব প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। শুধু মহর্ষি গৌতম নয় সকল ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়ই সকল প্রকার জ্ঞানের প্রধান উৎস রূপে প্রত্যক্ষকেই তাই চিহ্নিত করেছেন।

ভাববাদী দার্শনিকগণ শুধু যে প্রত্যক্ষকে নস্যাৎ করার সকল রকম প্রয়াস করেছেন তাই নয়, প্রত্যক্ষের বিষয়কে ও নস্যাৎ করেছেন। প্রত্যক্ষ ও বিষয় উভয়ই মিথ্যা। কেননা উভয়ই বঞ্চনা করে। যেমন প্রত্যক্ষের বেদনায় রজ্জু-সর্প-দর্শন ও শুক্তি-রজত-দর্শন। দড়িকে সাপ দেখা ও ঝিনুকে রজত দেখা তো প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয় বলতে সর্প ও রজত অথচ বস্তুতঃ সেখানে সর্প ও নেই, রজত ও নেই। অতএব প্রত্যক্ষ মাত্রেই বঞ্চনা। এর উত্তরে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ এই সকল প্রত্যক্ষ আসলে প্রত্যক্ষ নয়। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্যই প্রত্যক্ষ। এখানে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের স্বরূপতঃ কোন সংযোগ হয় না। যেমন সর্প অথবা রজতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না। অতএব ভ্রম-প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের প্রকার হলে ও প্রত্যক্ষ নয়। কারণ রজ্জু-সর্পদর্শনে ও শুক্তি-রজত-দর্শনে দ্রষ্টার প্রাথমিক ভাবে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সঠিক সংযোগ হয়েছে মনে হলে ও পরমুহূর্তে বাধ প্রত্যয়ের সাহায্যে দ্রষ্টা উপলব্ধি করে যে বিষয়টি ভুল। বাধ প্রত্যয় বলতে পরবর্তী উপলব্ধি যা পূর্বের জ্ঞানকে বাধিত করে, প্রতিবাদ করে। রজ্জু-দর্শন ও শুক্তি-দর্শনের দ্বারা। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ ভ্রান্ত ও অসৎ প্রত্যক্ষ যে আসলে প্রত্যক্ষই নয় তার প্রমাণ করলেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে যদি প্রত্যক্ষই না হয় তবে অসৎ প্রত্যক্ষ কি? সেখানে কোনভাবে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয় না? এর উত্তরে অধিকাংশ দার্শনিক বলেন যে 'করণ দোষে'র ফলেই এমন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এখানে 'করণ দোষ' বলতে জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে সমগ্র কারণ সামগ্রীর কোথাও না কোথাও ত্রুটিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, মন বিষয় ইত্যাদি সমগ্র কারণের কোথাও কোন যদি দোষ ঘটে তো ভ্রান্ত বা অসৎ প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়। যেমন অন্ধকারবশতঃ দড়িতে সাপের বিভ্রম ইত্যাদি। অতএব অসৎ প্রত্যক্ষ কেবল 'করণ দোষের' জন্য। এতে ইন্দ্রিয় মন, বিষয় ইত্যাদি অসৎ প্রতিপন্ন হয় না। যেমন শুক্তি-রজত, রজ্জু-সর্প কোনটিই মিথ্যা নয়। ইন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হিসেবে সত্য। শুধু রজ্জুর স্থলে সর্প এবং শুক্তির স্থলে রজত মিথ্যা, তাও কারণ সামগ্রীর কোন একটির ত্রুটির জন্য। আসলে রজ্জু ও সর্প, শুক্তি ও রজত উভয়ই সত্য।

তবে সেই স্থলে নয়, অন্য কোথাও যেমন বনে, চিড়িয়াখানায়, গহনার দোকানে, সর্প বা রজত সেই সময়েই বর্তমান। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষের বিষয় উভয়কেই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বাহ্য বিষয় উভয়কেই সত্য ও বাস্তব প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় ও দার্শনিকগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন জ্ঞান মাত্রেই নির্বস্তু। জ্ঞান মাত্রেই যদি বস্তু স্বরূপ হত তাহলে যে বস্তু বা বিষয়কে সূচিত করে তাকে সপ্রমাণ করত। কিন্তু সত্য যা তা হলো জ্ঞান বা বুদ্ধি কখনোই বস্তুকে প্রমাণ করে না। তাই জ্ঞান বা বুদ্ধি মাত্রেই মিথ্যা-বুদ্ধি। বহির্জগতে বস্তুর আপাত সত্যতা চূড়ান্ত পরীক্ষায় যে নির্বস্তু বা সর্বশূন্য তা প্রমাণিত হয়। যে কোন বাহ্যবস্তুকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তো দেখা যাবে বহির্জগতের আপাত সত্য বস্তু আসলে সর্বশূন্য বা নির্বস্তু। আমরা এখানে একটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে তার বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন সাধারণের বিশ্বাসের বিষয় বস্ত্র, কেন না বস্ত্র জ্ঞানের বিষয় হয়। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেন **'বুদ্ধ্যা বিবেচনাৎ'** এই উপায়ের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় তো চরম পর্যায়ে দেখা যাবে বস্ত্রই মূলতঃ নেই, তার উপলব্ধি তো দূরের কথা। অতএব বাহ্যবস্তু হিসেবে বস্ত্র মিথ্যা, তার কোন রূপ অস্তিত্বই নেই। ভাববাদীদের মতে একটি বস্ত্র নাও, তাকে বিশ্লেষণ করতে শুরু কর। যেমন এই হয় সুতো, এই হয় সুতো ইত্যাদি, শেষে দেখা যাবে সুতো ছাড়া বস্ত্র কোথাও নেই। অতএব এতক্ষণ যে বস্ত্র, বস্ত্র বলে বস্ত্রের অস্তিত্বের কথা প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণ বলে থাকেন সেই বস্ত্র এখন উপলব্ধির বাইরে মিথ্যাবুদ্ধি, নিছক বঞ্চনা মাত্র। এরপর বস্ত্রকে বিশ্লেষণ করতে করতে যে সুতো 'এই হয় সুতো', 'এই হয় সুতো' পাওয়া গেল সেই সুতোকে ও যদি আবার বিশ্লেষণ করা যায় তো দেখা যাবে সুতো কোথাও নেই, ভাববাদ অনুযায়ী এই বস্ত্রের মত বস্তুজগতের যে অস্তিত্বের কথা বলা হয় তা আসলে মিথ্যাবুদ্ধিপ্রসূত। বাহ্য বস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই। কোন বিষয়েরই প্রকৃতি কোন ভাবেই জানা যায় না। যে বস্তুর ধারণা সাধারণের বিশ্বাসে ধরা পড়ে তা হলো ভাববাদের পরিভাষায় মিথ্যাবুদ্ধি। এই মিথ্যা- বুদ্ধি প্রতিনিয়ত অজ্ঞান বা অবিদ্যাপ্রভাবিত সাধারণ

মানুষকে বঞ্চনা করে। আর যে প্রমাণ প্রতিপক্ষ দার্শনিকগণ তুলে ধরেন তা প্রমাণ নয় প্রমাণের আভাস মাত্র।

ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় ভাববাদের এই যুক্তি যে পরস্পর বিরুদ্ধ স্ববিরোধিতাগ্রস্ত এবং অযৌক্তিক একথা প্রমাণ করেছেন। তাঁদের মতে যে যুক্তি দিয়ে ভাববাদিগণ বাহ্যবস্তু নির্বস্তু প্রমাণ করেছেন সেই যুক্তি দিয়েই বিচার করলে দেখা যাবে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয়? মহর্ষি গৌতমের মতে যদি বস্তুর কোন অস্বিত্বই না থেকে থাকে তো ভাববাদী দার্শনিকগণ তার বিশ্লেষণ বা বিভাজন করেন কি ভাবে? বস্তু বিশ্লেষণই প্রমাণ করে যে বস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান। যা আদৌ কোন কালে ছিল না বা নেই তার আবার বিভাজন বা বিশ্লেষণ কিভাবে হয়। যেমন আকাশ কুসুম বা শশশৃঙ্গ ইত্যাদি। শশকের কোন কালেই কোন শৃঙ্গ নেই। অতএব যুক্তি দিয়ে স্বরূপের বিশ্লেষণ বা বিভাজন কখনোই সম্ভব নয়। ফলে বস্তুর অনস্তিত্ব ও তার প্রকৃতির অনুপলব্ধির যে তত্ত্ব ভাববাদী দার্শনিকগণ উপস্থিত করেছেন তা যেমন স্ববিরোধী তেমনি বিভ্রান্তিকরও বটে।

ভাববাদ বিরোধীরা ভাববাদের যুক্তি **'বুদ্ধ্যা বিবেচনাৎ'** বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে উক্ত যুক্তি দিয়ে বিচার করলে যে শুধু বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি প্রমাণিত হয় তা নয় এমনকি প্রমাণের বৈধতাও স্বীকৃত হয়। বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা অর্থাৎ বিশ্লেষণ তখনই সম্ভব হয় যখন প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। ভাববাদীরা বস্তুর জ্ঞানকে নস্যাৎ করেছেন আর এক জ্ঞান দিয়েই। যা কখনোই কোন জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসে না তার আবার বিশ্লেষণ কিভাবে সম্ভব। অতএব ভাববাদীদের জ্ঞান বিশ্লেষণই প্রমাণ করে জ্ঞান বা প্রমাণ বর্তমান। জগতে যে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তাতো প্রমাণের উপর নির্ভর করেই প্রমাণ করেন। অতএব ভাববাদীদের যুক্তিই প্রমাণের প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকে যথার্থতা দেয়। মহর্ষি গৌতম বলেছেন[6]—**প্রমাণতশ্চার্থ প্রতিপত্তেঃ**। কেননা পরীক্ষক ব্যক্তি যখন বলেন 'এটি আছে' 'এটি নেই' তখন বুদ্ধির দ্বারাই নিশ্চিত হয়ে বলেন। আর এটাই প্রমাণ করে যে বুদ্ধির দ্বারাই বিবেচন প্রযুক্ত পদার্থ সমূহের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। অতএব পূর্বপক্ষবাদীর হেতু অহেতু।[7] —ব্যাহতত্বাদহেতুঃ। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় প্রমাণ করলেন ভাববাদীদের হয় স্বীকার করতে হবে যে

প্রমাণ বর্তমান, নয় তাঁদের সমস্ত উক্তিই স্ববিরোধিতা দুষ্ট হয়ে উপহাসের পর্যায়ে পর্যবসিত হবে।

কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকগণ ভাববাদ বিরোধী গণের প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় বিচলিত হন নি তাঁরা পুনরায় যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁদের মতে বুদ্ধি বা জ্ঞান অবশ্যই বর্তমান কিন্তু আসলে তা মিথ্যা। এই ভাবে ভাববাদী দার্শনিকগণ মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান ও সৎবুদ্ধির পার্থক্য তুলে ধরেছেন। ভাববাদ অনুযায়ী জগতে দুপ্রকার সত্য বর্তমান– সম্বৃতি ও পারমার্থিক। সম্বৃতি সত্য হলো মিথ্যাজ্ঞান এবং পারমার্থিক সত্য হলো জ্ঞান। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ মানুষ মিথ্যাবুদ্ধি চালিত হয়ে জগতকে ও জাগতিক পদার্থ সমূহকে সত্য বলে মনে করে। যেমন সত্য মনে করে ভ্রম, স্বপ্ন, মায়া গন্ধর্বনগর ও মরীচিকার ক্ষেত্রে। আসলে সকলই মিথ্যাজ্ঞান। এই ভ্রম ও স্বপ্ন ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভাববাদীরা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন প্রমাণ প্রমেয়ভাব সম্পূর্ণতঃ মিথ্যা। ভ্রম ও স্বপ্ন প্রত্যয় যেমন মিথ্যা তেমনি মিথ্যা জাগ্রৎ প্রত্যয়ও।

ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় যেমন জাগ্রৎ প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট তেমনি এবার তাঁরা ভ্রম ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের কাজে সন্নিবিষ্ট হয়েছেন। এই ভ্রম ও স্বপ্ন বিশ্লেষণ চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকেই সিদ্ধ করবে।

ভ্রম, স্বপ্ন ইত্যাদি বিশ্লেষণ

ভাববাদের গোড়ার কথা হলো সরাসরি অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণের ধারণার যে বাহ্য জগৎ তা যে সর্বৈব মিথ্যা ও অলীক তা প্রমাণ করা। সাধারণের চলিত বিশ্বাস হলো সরাসরি অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় তাই সত্য ও বাস্তব। ভাববাদ অনুযায়ী এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা, কেন না ভ্রম, স্বপ্ন ও অলীক দর্শনে দেখা গেছে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের কোন প্রকার বাস্তব অস্তিত্ব তো নেইই, বরং মিথ্যা। ভ্রমে, স্বপ্নে ও অলীক দর্শনে বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও যেমন মনে হয় আমাদের জ্ঞান হয় তেমনি জাগ্রত অবস্থায় প্রমাণ-প্রমেয়ভাব উপলব্ধি ও মিথ্যা। সংক্ষেপে সকল প্রকার জ্ঞানই নির্বস্তু, নিরালম্বন ও

মিথ্যাবুদ্ধি প্রসূত। সরাসরি অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় তা মানসিক নির্মাণ ভিন্ন কিছুন য়।

ভাববাদের এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি গুরুত্ব-পূর্ণ যুক্তি পাই। প্রথমতঃ ভ্রম, স্বপ্ন ও অলীক দর্শনে যা জানা যায় তা নির্বস্তু, নিরালম্বন কেননা বাস্তব জগতে কোন ভাবে কোনকালে কখনোই এ সবের কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই। দ্বিতীয়তঃ ভ্রম, স্বপ্ন ও অলীক প্রত্যয় যে মিথ্যা প্রত্যয় তা জাগ্রৎ প্রত্যয়ে সরাসরি অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। অনুরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে সরাসরি জ্ঞান হয় অর্থাৎ বহির্বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় তাও সমান মিথ্যা। অতএব জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানও মিথ্যা, নির্বস্তু ও নিরালম্বন।

ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় এই দুই মূল যুক্তিকে বিচারের বিষয় করে তার অহেতু প্রমাণ করেছেন। ভাববাদী দার্শনিকগণ প্রমাণ প্রমেয়ভাব যে ভ্রমাত্মক, মিথ্যা, তা প্রমাণ করার জন্য ভ্রম ও স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যমান বস্তুর জ্ঞানকে হেতু করেছেন। প্রত্যয় পরীক্ষায় 'ভ্রম কিছুটা আলোচিত হয়েছে। তবু ও আমরা এখানে পূর্বের উদাহরণের পুনরাবৃত্তি করব। যেমন রজ্জু-সর্প-ভ্রম, এখানে একখণ্ড রজ্জুকে দেখে সর্পের যে বিভ্রম বশতঃ দ্রষ্টা আতঙ্ক-গ্রস্ত হন তা তো অবিদ্যমান বস্তুর জ্ঞানবশতঃই হয়। ভাববাদীদের মতে রজ্জু-সর্প-দর্শন যদি ভ্রম না হয় অর্থাৎ মিথ্যা না হয় তবে যে মুহূর্তে ভ্রম অপসারিত হয় তখন কেন দ্রষ্টার মন থেকে ভীতির ভাব চলে যায়? স্বপ্না-বস্থার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যেমন স্বপ্নে দেখা পর্বতারোহণ যদি মিথ্যা না হত তবে স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার আশাভঙ্গের অনুভূতি কেন হয়? অতএব কি জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান, কি স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান উভয় দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত নির্বস্তু, নিরালম্বন।

ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ পূর্বপক্ষীদের একটি প্রশ্ন বিশেষ করে রাখছেন তা হলো স্বপ্ন আসলে জ্ঞান কিনা। অর্থাৎ স্বপ্নকে সঠিক অর্থে জ্ঞান বলে চিহ্নিত করা যায় কিনা? জ্ঞান হলেই তো তার মিথ্যা হওয়ার প্রশ্ন। অথচ স্বপ্নজ্ঞানকে মাধ্যম বা হেতু করে জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান, প্রমাণ প্রমেয়ের জ্ঞান মিথ্যা ও অলীক বলে প্রমাণ করানোর চেষ্টা করেছেন। তবে একথা সর্বসম্মত যে স্বপ্ন জ্ঞান ভ্রম। স্বপ্ন দেখার সময় দ্রষ্টা যে সকল বিষয়

চোখের সামনে বর্তমান দেখেন, তখন কিন্তু সেই সেই বস্তুগুলি চোখের সামনে থাকে না। অতএব স্বপ্ন সকল সময়ই নির্বস্তু নিরালম্বন ও অসদ্ বিষয়ক। স্বপ্নে দেখা বিষয়গুলি সেই মুহূর্তে স্বপ্ন দ্রষ্টার সম্মুখে না থাকলেও বস্তুগুলি যে অলীক এমন সিদ্ধান্ত যুক্তি যুক্ত নয়। এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হত যদি জাগ্রত অবস্থায়ও ঐ সকল বিষয়ের কোনরূপ উপলব্ধি না হত। অর্থাৎ স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু অলীক প্রতিপন্ন হত যদি জাগ্রত অবস্থায় এই সকল বস্তুর কোন-রকম প্রত্যয় না জন্মাত। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিক সম্প্রদায় স্বপ্ন জ্ঞান মিথ্যা ও অলীক প্রতিপন্ন করতে জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানকে বাধ প্রত্যয় বলে স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ জাগ্রত অবস্থায় বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি যে হয় তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অতএব জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান স্বপ্ন জ্ঞানকে বাধিত করে বলেই স্বপ্ন জ্ঞান মিথ্যা। জ্ঞান হিসেবে স্বপ্ন কতখানি বিবেচিত হবে এনিয়েই যখন প্রশ্ন বর্তমান তখন উচিত স্বপ্ন আসলে কি তার বিশ্লেষণ করা। এক কথায় স্বপ্ন হলো, পূর্বানুভূত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। জাগ্রত অবস্থায় যে পদার্থ সমূহ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় এবং আমাদের উপলব্ধিতে আসে সেই সকল অনুভূত পদার্থই স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব স্বপ্নজ্ঞানের বিষয় কখনোই অলীক বা অসদ্ বিষয়ক হতে পারে না। অবশ্য এক্ষেত্রে ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় বলবেন যে স্বপ্ন জ্ঞান পূর্বানুভূত বিষয়ক হলেই যে তার বিষয়ের মিথ্যাত্ব দূরীভূত হয় একথা ঠিক নয়। কারণ ভাববাদ অনুযায়ী সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। আর বাহ্যবস্তু মাত্রই মিথ্যা ও অলীক। জাগ্রত অবস্থায় ঐ অলীক বিষয়ের যে জ্ঞান হয় সেই বিষয়ের সংস্কার জন্মে। স্বপ্ন জগতে সংস্কারবশত পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়। ফলে স্বপ্ন জ্ঞানের বাধ প্রত্যয় জাগ্রত জ্ঞানের বিষয়ের সত্তা স্বীকার করতেই হবে এমন কোন যুক্তি নিরর্থক। কিন্তু ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় এর উত্তরে বলেন যে যথার্থ জ্ঞান ছাড়া ভ্রম জ্ঞান কখনোই জন্মাতে পারে না। ভাববাদ অনুযায়ী যথার্থ জ্ঞান নেই। তাহলে তো স্বপ্নজ্ঞানও অসম্ভব। অবশ্য ভাববাদের সপক্ষে এমনও দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যে এমন সব স্বপ্ন প্রত্যয় হয় যা কোন-ভাবেই পূর্বোপলব্ধ বিষয়ক নয়। যেমন এমন অনেক স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হয় যেখানে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেই নিজের মাথা কাটছে, কিংবা নিজেই নিজের মাথা খাচ্ছে। আবার এমন স্বপ্নও কেউ কেউ দেখে যেন স্বপ্নদ্রষ্টা হাতের মুঠোয় সূর্য ধরছে

বা সূর্যকে চিবিয়ে খাচ্ছে ইত্যাদি কিম্ভূত কিমাকার অননুভূত বিষয়ের ও জ্ঞান হয়। এমন ধারা নানান স্বপ্নের প্রমাণ লোক সমাজে প্রচলিত। অতএব স্বপ্ন প্রত্যক্ষ মাত্রেই পূর্বোপালব্ধ বিষয়ক একথা খাটে না। ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ এই রকম স্বপ্নেরও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ অননুভূত বিষয় প্রত্যক্ষ ও পূর্বোপলব্ধ বিষয়ের বাইরে নয়। নিজের মাথা খাওয়া বা সূর্য ভক্ষণ প্রভৃতি স্বপ্ন জ্ঞানের বিষয়ও কোন না কোন ভাবে স্বপ্ন দ্রষ্টার পূর্বানুভূত। অর্থাৎ নিজের মাথা নিজেই কাটছে এমন স্বপ্নপ্রত্যক্ষ স্বপ্নদ্রষ্টা যা দেখেছে বহির্জগতে সেই ঘটনাই না দেখলে ও অনুরূপ মস্তক-ছেদন রূপ ঘটনা সে ঘটতে দেখেছে। যেমন স্বপ্ন দ্রষ্টা কোন না কোন ভাবে পশুহত্যার ঘটনা দেখতে পারে। অতএব স্বপ্নজ্ঞানে স্বপ্নদ্রষ্টার কোন কিছুই কোন ভাবে অজ্ঞাত নয়। যে ব্যক্তি কখনোই কোন ভাবে কোন ছেদন-ক্রিয়া রূপ কার্য যদি না দেখে থাকে তার কখনোই এইরূপ স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হতে পারে না। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে স্বপ্ন প্রত্যক্ষের সকল কিছুই কোন না কোনভাবে পৃথক পৃথক ঘটনায় স্বপ্নদ্রষ্টার পূর্বানুভূত। তা না হলে সেই বিষয়ে স্বপ্ন জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকতেই পারে না।

এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় বিশেষ করে যে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন তা হলো স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রমজ্ঞান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাববাদী সম্প্রদায় যে অর্থে স্বপ্নজ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলতে চান সে অর্থে স্বপ্নজ্ঞান কখনোই ভ্রমজ্ঞান নয়। ভাববাদ অনুযায়ী স্বপ্নজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান বহির্বিষয়শূন্য। কিন্তু ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের মতে স্বপ্নজ্ঞান সকল সময়ই বহির্বিষয়কই। একই বিষয় অন্য সময় অন্য কোনখানে বহির্জগতে প্রত্যক্ষ হয়। স্বপ্নজ্ঞান তাই নির্বস্তু, নিরালম্বন কখনোই নয়। অথচ ভাববাদী সম্প্রদায় এই স্বপ্নজ্ঞানকেই ভিত্তি করে সকল প্রকার জ্ঞানকেই নির্বস্তু, নিরালম্বন মিথ্যা বা অলীক বলে সাব্যস্ত করেছেন। মীমাংসক কুমারিলের মতে ভাববাদী সম্প্রদায় যদি জাগ্রতজ্ঞানকে সত্য বলে স্বীকার না করেন তাহলে নিজেরই জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা স্বপ্নাদিবৎ দৃষ্টান্তটাই তাহলে পরিবর্জিত হয়ে যায়। স্বপ্নপ্রত্যক্ষ ও জাগ্রত প্রত্যক্ষে উভয়ের মধ্যে যদি কোন প্রকার

ভেদ না থাকে এবং উভয় প্রকার জ্ঞানই যদি ভ্রম হয় তাহলে ভাববাদী দৃষ্টান্ত স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎই অযৌক্তিক হয়ে যায়।

ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ স্বপ্ন ও ভ্রম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথমতঃ সুপরিনিশ্চিত অর্থাৎ জাগ্রত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের স্পষ্টতা ও প্রাণবত্তা। দ্বিতীয়তঃ অবাধিতত্ব অর্থাৎ যার কোন বাধক প্রত্যয় বা প্রতিবন্ধকতা নেই, এক কথায় অবিসম্বাদী। জাগ্রত প্রত্যক্ষ ও স্বপ্ন প্রত্যক্ষকে একই সঙ্গে দেখা কখনোই ঠিক নয়। এই প্রকার ভাববাদী সিদ্ধান্ত যে সঠিক নয় তার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাবে যদি জাগ্রত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ভ্রমজ্ঞান নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থিত করা যায়।

ভাববাবী দার্শনিকগণ যে কেবল স্বপ্নজ্ঞানকেই দৃষ্টান্ত করে সকল প্রকার জ্ঞান নির্বস্তু বলে সিদ্ধান্ত করেছেন তা নয় এমনকি জাগ্রত অবস্থায় যে ভ্রমজ্ঞান হয় তাকেও দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন। ভাববাদী দার্শনিক প্রথমে স্বপ্নজ্ঞান যে মিথ্যা তা প্রমাণ করার জন্য জাগ্রতজ্ঞানকে বাধ প্রত্যয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম তা প্রমাণিত হয় জাগ্রত জ্ঞানের সাহায্যে। তারপর প্রমাণ করেছেন যে শুধু স্বপ্নজ্ঞান যে ভ্রম বা মিথ্যা তাই নয় জাগ্রতজ্ঞানও ভ্রমবিষয়ক, মিথ্যা। ভ্রম প্রত্যক্ষের উদাহরণ হিসেবে তাঁরা স্তম্ভাদি প্রত্যয়, রজ্জু-সর্প-ভ্রম, শুক্তি-রজত-ভ্রম, আকাশে গন্ধর্ব-নগর-ভ্রম, মরীচিকা ভ্রম ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো জাগ্রত জ্ঞানও নির্বস্তু। জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্ন জ্ঞানের মত বস্তুর অনুপস্থিতি-সত্ত্বেও বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। যেমন দূর থেকে দেখা কোন স্তম্ভ বা খুঁটি অবিকল মানুষের মত প্রতীতি জন্মায়, অথচ সেখানে মানুষ নেই, এইভাবে অবস্তুতে বস্তুর প্রতীতি হিসেবে স্তম্ভাদি প্রত্যয় মিথ্যা। ভাববাদী সম্প্রদায় চাতুরী দিয়ে বিষয়টিকে প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন। স্বপ্ন-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে জাগ্রত প্রত্যক্ষের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এমনভাবে অনুমানটি সাজানো যে আপাতদৃষ্টিতে তার বৈধতা সম্পর্কে সংশয় জাগে না। কেননা স্বপ্ন প্রত্যক্ষ যে ভ্রমযুক্ত বা মিথ্যা তা ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। অতএব ভাববাদী প্রমাণ

তত্ত্ব, সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র মত নিরুচ্চারে আংশিক ভাবে হলেও ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় এর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়ে যায়। এই প্রকার চাতুরী ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় "সিদ্ধসাধন" দোষ হিসেবে স্বীকৃত। তাছাড়া স্বপ্ন প্রত্যক্ষকে দৃষ্টান্ত করে যেমন ভাবে জাগ্রত প্রত্যক্ষের জ্ঞানকে মিথ্যা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাও দোষমুক্ত নয়। এই দোষের নাম হলো দৃষ্টান্তাভাস দোষ। জাগ্রত প্রত্যক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত স্বপ্ন প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হলেও স্বপ্ন প্রত্যক্ষ কখনোই অত্যন্ত অসৎ নয়, পূর্বানুভূত বিষয়ই স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হিসেবে ধরা দেয়। সেই সময় স্বপ্নদ্রষ্টার সামনে উপস্থিত না থাকলেও বহির্জগতে উক্ত বিষয়ের উপস্থিতি বর্তমান। ফলে যে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সকল প্রত্যয় মিথ্যা ও অলীক বলে প্রমাণ করা হচ্ছে তা কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে কখনোই মিথ্যা নয়। তাই দৃষ্টান্তাভাস দোষের সাহায্যে যেভাবে বাহ্যবস্তু বিষয়ক জাগ্রত প্রত্যয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন তা দোষদুষ্টই।

ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ভ্রমও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে জাগ্রত প্রত্যক্ষ সকল সময় বাহ্যবস্তু বিষয়ক এবং তা সত্যও হতে পারে। করণ দোষের জন্য ভ্রম জ্ঞান জন্মায়। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের নির্দিষ্ট কারণ আমরা জানতে পারি। তাছাড়া ভ্রমজ্ঞানের পরমুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে পূর্বের জ্ঞানটি ভ্রান্ত ছিল। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন যে ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয়ের যেমন অস্তিত্ব বর্তমান তেমনি ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব ও উপলব্ধির বিষয়। মহর্ষি গৌতম বলেছেন[৪]— **মিথ্যোপলব্ধের্বিনাশস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ**। ভ্রম প্রত্যক্ষে যে মিথ্যাজ্ঞান হয় তা যথার্থজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়ে মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন ভ্রম জ্ঞান হয় কেন? ভ্রম প্রত্যক্ষ আসলে কি? এর উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলেছেন[৫]— **তত্ত্বপ্রধানভেদাচ্চ মিথ্যাবুদ্ধের্দ্বৈবিধ্যোপপত্তিঃ**। তত্ত্ব ও প্রধানের ভেদবশতঃই ভ্রম জ্ঞান হয়ে থাকে। এখানে আমরা অত্যন্ত সহজ করে লেখা অধ্যাপক মৃণাল কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারি। তিনি লিখেছেন—[10]"ধরা যাক মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাছকে কেউ মানুষ বলে ভুল করল, তার ভ্রমজ্ঞান হলো এটি মানুষ।" এখানে 'এটি' বলতে বোঝাচ্ছে সামনে দাঁড়ানো একটি বস্তুবিশেষ বা ধর্মী এবং তার

ওপর আরোপ বা ভ্রম হচ্ছে অন্য একটি পদার্থের অর্থাৎ মানুষের। যে ধর্মীর ওপর আরোপ হয় তাকে বলা হচ্ছে তত্ত্ব (যেমন গাছটি) এবং অন্য যে পদার্থটির আরোপ করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে প্রধান (যেমন মানুষ)। তত্ত্বের দিক থেকে ভ্রমজ্ঞানটি কিন্তু ভ্রম নয়। কেননা ওটি যে সম্মুখে অবস্থিত একটি পদার্থ বিশেষ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধানের দিক থেকে জ্ঞানটি ভ্রান্ত। কেননা অন্য পদার্থের আরোপ ঘটেছে। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানে দ্বৈতরূপ দাঁড়াচ্ছে, আংশিক অভ্রান্ত এবং আংশিক ভ্রান্ত।"

শুধু মহর্ষি গৌতমই নন মীমাংসক কুমারিল ও অনুরূপভাবে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন[11] যে প্রত্যক্ষের জ্ঞান সুপরিনিশ্চিত। স্বপ্ন প্রত্যক্ষ জাগ্রত প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত হয় কিন্তু জাগ্রত প্রত্যক্ষ অপর কোন প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত হয় না। তাই জাগ্রত প্রত্যক্ষের প্রমাণাভাস হয় না। এই জাগ্রত প্রত্যক্ষই প্রমাণ জ্যেষ্ঠ। তাছাড়া ভাববাদীদের যুক্তিতেই ভাববাদী সম্প্রদায় নাচার। স্বপ্নপ্রত্যয়ের বাধ প্রত্যয় হিসেবে জাগ্রত প্রত্যক্ষকে যথার্থ হিসেবে স্বীকার না করা ছাড়া উপায় নেই। না হলে দৃষ্টান্তাভাস দোষে দুষ্ট হয়ে ভাববাদী সম্প্রদায়ের উদ্দিষ্ট মূল অনুমানটিই পরিত্যক্ত হবে। এখানে ভাববাদী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি উত্তর আসতে পারে যে জাগ্রত জ্ঞানেরও বাধ-জ্ঞান সম্ভব। ভাববাদ অনুযায়ী জাগ্রত প্রত্যক্ষ যোগ প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত হয়। মীমাংসক কুমারিল এই জাতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ সহ বলেছেন কোন যোগীর পক্ষেই কি ইহজন্মে এবম্বিধ উপলব্ধি সম্ভব? এমন কোন নজির আছে কি? যদি যুক্তির জন্য যুক্তি ভাববাদী সম্প্রদায় দেখায় তো তার বিপরীত যুক্তি ভাববাদী বিরোধী সম্প্রদায় ও উপস্থিত করতে পারে। এখানে কুমারিলের শ্লোকটি হলো—[12]**যোগিনাং চাস্মদীয়ানাং ত্বদুক্তপ্রতিযোগিনী ॥ ত্বদুক্তিবিপরীতা বা বাধবুদ্ধির্ভবিষ্যতি।** আমাদের সম্প্রদায়ের যোগীগণের যুক্তি আমরাও তুলে ধরতে পারি যেখানে তাঁদের বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়। এ জাতীয় যুক্তিতে আত্মরতি হতে পারে কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জাগ্রত প্রত্যক্ষের কোন বাধ প্রত্যক্ষ হতে পারে না। যোগ প্রত্যক্ষর কোন সাধারণ্যে স্বীকৃত নজির নেই, কিন্তু জাগ্রত প্রত্যক্ষের বিষয় যে সদ্‌বিষয়ক এই অভিজ্ঞতার নজির সাধারণ্যে স্বীকৃত। কুমারিলের মতে—[13]**বাহ্যার্থালম্বনা**

বুদ্ধিঃ ইতি সম্যক্ চ ধীঃ ইয়ম্। জ্ঞান বা বুদ্ধিমাত্রেই যে বাহ্যার্থ বিষয়ক এবং সত্য তা সম্যক্ স্বীকৃত। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ও দার্শনিকগণ ভ্রম ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন তা হলো প্রথমতঃ সুপরিনিশ্চিয়ত্ব অর্থাৎ জাগ্রত জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ের স্পষ্টতা ও প্রাণবত্তা। দ্বিতীয়তঃ অবাধিতত্ব অর্থাৎ যার কোন বাধপ্রত্যয় বা প্রতিবন্ধকতা নেই। এককথায় অবিসম্বাদী।

ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় ভ্রমপ্রত্যক্ষ ব্যাখ্যায় মোটামুটি দুটি মতের প্রাধান্য দিয়েছেন—অখ্যাতিবাদ ও অন্যথাখ্যাতিবাদ বা বিপরীত খ্যাতিবাদ। অবশ্য এই দুপ্রকার ব্যাখ্যাই ভ্রমজ্ঞান সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসনে যথেষ্ট। ভাববাদ অনুযায়ী স্বপ্ন প্রত্যক্ষ বাধিত হয় জাগ্রত প্রত্যক্ষের দ্বারা, তাই স্বপ্ন প্রত্যক্ষ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তেমন জাগ্রত প্রত্যক্ষও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যেমন স্তম্ভাদি প্রত্যয় রজ্জু-সর্প-ভ্রম, শুক্তি-রজত-ভ্রম, গন্ধর্বনগর-ভ্রম, মায়া-মরীচিকাভ্রম ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে অবস্তুই জ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব জাগ্রতজ্ঞানও মিথ্যা প্রমাণিত। এর উত্তরে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় বিশেষ করে প্রভাকর মীমাংসকের মতে ভ্রমজ্ঞান বলে কিছু নেই। ভাববাদী সম্প্রদায় যাকে ভ্রমজ্ঞান বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো ভেদমূলক জ্ঞানের অভাব। শুক্তি-রজত-ভ্রমের দৃষ্টান্তে অখ্যাতিবাদ অনুযায়ী আসলে দুটি জ্ঞান রয়েছে, একটি শুক্তির জ্ঞান, অপরটি রজতের জ্ঞান। এই দুটি জ্ঞানের কোনটিই কিন্তু নির্বস্তু নয়। বহির্জগতে শুক্তির যেমন উপস্থিতি বর্তমান, রজতের ও অনুরূপ উপস্থিতি বর্তমান। দুটিই স্বতন্ত্র জ্ঞান। একটি ইদং অর্থাৎ গ্রহণাত্মক জ্ঞান, অপরটি গয়নার দোকানের রজত অর্থাৎ স্মরণাত্মক জ্ঞান। উভয়ের জ্ঞানই বাহ্যবস্তুবিষয়ক। ভ্রম হলো দ্বিবিধ জ্ঞানের ভেদগ্রহের অভাব।

ভ্রম সম্পর্কে আর একটি মতবাদ হলো ন্যায়-বৈশেষিক ও ভট্ট মীমাংসকদের অন্যথাখ্যাতিবাদ। অন্যথাখ্যাতিবাদ অনুযায়ী ভ্রম বর্তমান কিন্তু এই ভ্রম কখনোই বাহ্যবস্তু শূন্য নয়। ভ্রমও অনুরূপভাবে দেশান্তরে বা কালান্তরে পূর্বানুভূত বাহ্যবস্তু বিশেষ করে, যেমন রজ্জু-সর্প-ভ্রমে বাহ্য জগতে দুটিরই উপস্থিতি বর্তমান, হয়ত একথা ঠিক দ্রষ্টার সামনে সর্প নেই কিন্তু রজ্জু রয়েছে। রজ্জুটি তো আর মিথ্যা নয়। মিথ্যা বা ভ্রম যেটুকু

তা হলো রজ্জুতে সর্পের আরোপ। এখন প্রশ্ন 'সর্পই' কি ভ্রম বা মিথ্যা? তা কখনোই নয়। সর্প ও বহির্জগতে বর্তমান। হয়ত দ্রষ্টার সামনে নেই, কিন্তু চিড়িয়াখানায় বর্তমান। অতএব ভ্রমের বিষয়ও পূর্বোপলব্ধ বাহ্যবস্তু-বিষয়ক। ভ্রম কখনোই নির্বস্তু নয় বহির্জগতের কোথাও না কোথাও রয়েছে। এইভাবে মরীচিকায় জল দেখা বা আকাশে গন্ধর্বনগর দেখা কোনটাই কিন্তু নির্বস্তু নয়। পূর্বোপলব্ধ মেঘ ও গৃহই হলো গন্ধর্বনগর, আর পূর্বোপলব্ধ জলই মরীচিকায় জল-দর্শন। স্তম্ভাদিপ্রত্যয়, স্থাণুতে পুরুষ বুদ্ধিও অনুরূপ বাহ্যবস্তুবিষয়ক, নিরালম্বন নয়। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞান মাত্রেই বাহ্যবস্তুবিষয়ক। যে ব্যক্তি কখনোই বাস্তব পুরুষ, সর্প, জল ইত্যাদি কখনোই দেখে নি তার এমন প্রকার ভ্রম হয় না, হতে পারে না। এই ভ্রম প্রত্যক্ষের বাধ প্রত্যয় হলো তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ প্রত্যয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মালেই ভ্রমজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ সতর্কীকরণও করেছেন এই বলে যে যথার্থজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী বাধ প্রত্যয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যথার্থ জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের বিরোধী। যথার্থজ্ঞান আসলে ভ্রমজ্ঞানের নিবর্তক, ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের নিবর্তক নয়। এইভাবে যে প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয় তা হলো স্বপ্নতত্ত্ব ও ভ্রমতত্ত্ব। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের সবিশেষ উপলব্ধি হলো একমাত্র ভ্রম এবং স্বপ্ন সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারাই ভাববাদী ভ্রম ও স্বপ্নতত্ত্ব খণ্ডন সম্ভব।

ভ্রম ও স্বপ্ন সম্পর্কিত তত্ত্ব

ভ্রম ও স্বপ্ন ইত্যাদিকে দৃষ্টান্ত করে যেহেতু সমগ্র জ্ঞানকেই মিথ্যা বা অলীক প্রতিপন্ন করতে চান, ভাববাদী সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভ্রম ও স্বপ্ন সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায়। তত্ত্বগত ভিত্তি যদি সুদৃঢ় করা যায় তো ভাববাদই সমৃদ্ধ হবে। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈত-বেদান্ত তিন ভাববাদী সম্প্রদায় পরিভাষাভেদে তিন প্রকার ভ্রমতত্ত্ব উপস্থিত করেছেন, যথাক্রমে অসৎখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও অনির্বচনীয় খ্যাতি। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় যে প্রতিবাদী ভ্রমতত্ত্ব উপস্থিত

করেছেন তা হলো প্রভাকরের অখ্যাতি ও ন্যায়বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতি। মীমাংসক কুমারিল সহ সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ও দার্শনিকই কোন না কোন ভাবে এই দুটো ভ্রমতত্ত্বকেই ভাববাদী ভ্রমতত্ত্ব খণ্ডনে গ্রহণ করেছেন।

ভ্রম বিচারকে কেন্দ্র করেই খ্যাতি কথাটির খ্যাতি হলেও 'খ্যাতি' শব্দটিকে নিয়ে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিতর্ক বর্তমান। ভাববাদ অনুযায়ী 'খ্যাতি' কথার অর্থ ভ্রান্তি বা ভ্রম। আর ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় খ্যাতি কথাটিকে জ্ঞান অর্থেই গ্রহণ করেছেন। আধুনিক চিন্তাবিদ[14] ফণিভূষণ তর্কবাগীশ খ্যাতি শব্দটিকে ঘিরে যে এই বিতর্ক তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ন্যায়দর্শন গ্রন্থে। এই ভিন্ন অর্থ থেকেই ভ্রম-বিচার সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখিত ভাববাদী দার্শনিকগণ যেখানে ভ্রমতত্ত্ব আলোচনা করেছেন বস্তুজগতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে সেখানে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিকগণ ভ্রমতত্ত্বকেই বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের মানদণ্ড করেছেন।

উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই পরিষ্কার। ভাববাদ অনুযায়ী ভ্রমতত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো ভ্রম-বিচারের মধ্য দিয়ে যদি সকল রকম জ্ঞানকে বাতিল করা যায়, প্রমাণ করা যায় যে এই বস্তুজগত অত্যন্ত অসৎ তো ভাববাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। আর ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় অনুযায়ী ভ্রম বিচারের মাধ্যমে যদি বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় তো ভাববাদ সৃষ্ট দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। জনসাধারণ খোলা চোখে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বিচার করতে পারবে। আর কোনভাবে মোহাচ্ছন্ন হবে না। শ্রেণী পীড়নের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।

ভ্রম বিচারের ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত উদাহরণ হলো রজ্জু-সর্প-ভ্রম ও শুক্তি-রজত-ভ্রম। রজ্জু-সর্প-ভ্রমই সর্বাধিক প্রচারিত। অতএব আমরা এই উদাহরণটিকেই সর্বাংশে ব্যবহার করব। ভাববাদী ভ্রমতত্ত্বে অসৎখ্যাতিই সুপ্রাচীন[15] একথা সর্বজন স্বীকৃত। বৌদ্ধ শূন্যবাদী সম্প্রদায়ই অসৎখ্যাতি-বাদের প্রবক্তা। অসৎখ্যাতিবাদ অনুযায়ী জগতের সকল কিছুই অসৎ। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে, যদি প্রশ্ন করা হয় সর্পের আসল অবস্থান কি? শূন্যবাদী বলবেন, অত্যন্ত অসৎ। সর্পের কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই। আসলে সর্প

বলে কোন বস্তু কোন কালে কোথাও ছিল না। অবশ্য যুক্তিটিকে বিশ্বাস-যোগ্য করে তোলার জন্য শূন্যবাদী সম্প্রদায় বলেন যে তাঁরা কোন সাধারণ সাপের কথা বলছেন না। এই মুহূর্তে বিশেষ করে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম-রূপ যে বিশেষ ধরণের সর্পের উপলব্ধি ঘটেছে সেই সর্পের কথাই এখানে বলেছেন। ভ্রম দৃষ্ট সর্প কোথাও না কোথাও কোনভাবে থাকতে পারে। এমনকি সাধারণের বিশ্বাসের সর্প ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও আছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সাধারণের কল্পিত বিশ্বাসকে কি কোনভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। বরং এটুকুই বলা যায় এই কল্পিত সর্পের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ শূন্য ছাড়া কিছুই নয়।

তবে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে সাপের কথা না হয় থাক, কিন্তু যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হলো সেই রজ্জুই বা কি? সাধারণের বিশ্বাসে সেই রজ্জুও সমানভাবে সত্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শূন্যবাদী প্রশ্ন করবেন, সাধারণের এই বিশ্বাসের পেছনেও কোনরূপ ভিত্তি আছে কি? সাধারণ ধারণার পক্ষ থেকে একটি উত্তরই হতে পারে যে সত্যি সত্যি কিন্তু দড়িকে দেখা যায়। অর্থাৎ রজ্জু দৃষ্টবস্তু। তখন শূন্যবাদী সম্প্রদায়ের প্রশ্ন, সর্পকেও কি সত্যি সত্যি প্রত্যক্ষ করা হয় নি। কথাটিতো সত্যি, যতক্ষণ আমরা ভ্রমের মধ্যে থাকি সর্প কি সমানভাবে প্রত্যক্ষ গোচর হয় না যেমনটি রজ্জু হয়। ফলে রজ্জুকে রজ্জু হিসেবে দেখাটার নিশ্চয়তা কোথায়? যেখান থেকে প্রমাণিত হবে রজ্জুর সত্যিকারের অস্তিত্ব বর্তমান। তাছাড়া ইতিপূর্বেই প্রমাণিত যে প্রত্যক্ষ প্রায়শই বঞ্চিত করে। ফলে রজ্জুর প্রত্যক্ষও সমান-ভাবে ভ্রমপূর্ণ যেমনটি সর্পভ্রম হয়। অতএব রজ্জুও সর্পের মত জগতের সকল কিছুই ভ্রমপূর্ণ অসৎ। তাই শূন্যবাদী সম্প্রদায় ভ্রমতত্ত্বের নাম দিয়েছেন অসৎখ্যাতি। ভ্রম পর্যায়ে আমরা এক অনস্তিত্বকে অপর অনস্তিত্বে দেখি। অর্থাৎ রজ্জুও সমপরিমাণ অসৎ যেমনটি সর্প হয়। এবম্বিধ যুক্তির দুর্বলতা শূন্যবাদী সম্প্রদায়কে সতর্ক করে। কেননা প্রশ্ন উঠতে পারে, রজ্জুও সর্প কি একই ধরণের ভ্রম। এর উত্তরে শূন্যবাদী বলবেন, এখানে রজ্জু ও সর্পের প্রত্যক্ষের যদি কোন প্রকার পার্থক্য থেকে থাকে তাকে এই ভাবেই চিহ্নিত করা যায় যে ব্যবহারিক দিক থেকে রজ্জুর অস্তিত্ব সর্পের অস্তিত্বের থেকে ভিন্ন। ব্যবহারিক জীবনে রজ্জুকে সৎ বলেই মনে হয়।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে সর্প রজ্জুর থেকে বেশী সত্য। বরং এটুকু বলা যায় যে সর্প রজ্জুর থেকে অধিক অসত্য। শূন্যবাদী পরিভাষায় রজ্জু ও সর্পের মধ্যে সর্প হলো অত্যন্ত অসৎ। ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে রজ্জুর যেটুকু অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, চরম সত্তার দিক থেকে রজ্জু সম্পূর্ণ অসত্য। এক কথায় দার্শনিক তাৎপর্য বা পারমার্থিক দিক থেকে রজ্জু ও সর্প উভয়েই মূল্যহীন, তবু ব্যবহারিক সত্যের স্বীকৃতির প্রয়োজন বর্তমান। তাই শূন্যবাদী সম্প্রদায় ব্যবহারিক সত্যের নাম দিয়েছেন সম্বৃতি সত্য।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই আত্মখ্যাতিবাদের প্রবক্তা। তাঁরা শূন্যবাদী সম্প্রদায়ের থেকে কিছুটা ভিন্ন, কেননা তাঁদের মতে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের সর্প কখনোই কল্পাশ্রয়ী অত্যন্ত অসৎ হতে পারে না। ঘটনা হলো এই যে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের সর্প জ্ঞানে সর্পের একটা ধারণা সত্যি বর্তমান। তাছাড়া সত্যি সত্যি প্রত্যক্ষের বিষয় হলো সর্প, বন্ধ্যাপুত্রের মত কখনো কোন কালে বা দেশে অপ্রত্যক্ষের ব্যাপার নয়। তবে সর্প এখানে যেমন অত্যন্ত অসৎ নয় তেমনি সর্প যে অস্তিত্বশীল একথাও ঠিক নয়। কারণ ভ্রম পর্যায়ের পর উপলব্ধি হয় যে আমাদের সামনে সর্পের কোন প্রকার অস্তিত্বের উপস্থিতিই নেই। এতৎ সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে সর্পের অস্তিত্ব না থাকলেও সর্পের একটা ভাবনা বা ধারণা ছিল যতক্ষণ ভ্রম পর্যায় ছিল। এমন কি ভ্রম পর্যায়ের পরও সর্পের ধারণা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ভ্রম পর্যায়ের পরও যখন রজ্জুতে জ্ঞান হয় তখন সর্প জ্ঞান বর্তমান থাকে। ভ্রমাত্মক বস্তু ও তেমনি কেবল ধারণামাত্র। ফলে রজ্জু সর্প ভ্রমে কি সর্প, কি রজ্জু উভয়েই সম্পূর্ণ মনসিজ অস্তিত্ব। ধারণা ছাড়া কোন বিষয়ের কোন প্রকার সত্তা নেই, বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী কেউই তার নিজের ধারণার বাইরে বেরোতে পারে না। বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় এর নাম হলো সহোপলম্ভ নিয়ম। অতএব অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্য পদার্থের জ্ঞান মাত্রই ধারণা। ধারণা আসলে আত্মাই। অতএব বাহ্যপদার্থে আত্মারই ভ্রম হয়। এই জন্য বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় ভ্রমতত্ত্বের নাম দিয়েছেন আত্মখ্যাতি। আত্মখ্যাতিবাদ অনুযায়ী রজ্জু-সর্প দর্শন তাহলে কি? কল্পিত সর্পের অভিজ্ঞতা কল্পিত রজ্জুতে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়, রজ্জুও কি সর্পের মত মনসিজ? কেননা যদি রজ্জুকে সর্পের মত মনসিজ বলে ধরে নিই তবে

সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী দুটী বস্তুর পার্থক্য কি করে নিরূপিত হবে। এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ের উত্তর শূন্যবাদী সম্প্রদায়ের মতই। বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ও একমত যে ব্যবহারিক দিক থেকে রজ্জু সত্য। এই ব্যবহারিক সত্যের নাম সংবৃতি সত্য। আর পারমার্থিক সত্যের দিক থেকে সম্বৃতি সত্যের আপাত সত্যতা থাকে না, মিথ্যায় পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প দর্শন ও রজ্জুতে রজ্জু দর্শন উভয়ই মিথ্যা।

অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ই অনির্বচনীয় খ্যাতির প্রতিষ্ঠাতা। অদ্বৈত বেদান্ত মতে উল্লিখিত দুটো ভ্রমতত্ত্বই ভুল জায়গা থেকে শুরু হয়েছে। রজ্জু সর্প ভ্রমে ঘটনা যা তা হলো আমরা সত্যি সত্যি দড়িতে সাপ দেখি। সাপ কখনোই সম্পূর্ণতঃ কাল্পনিক নয়। কেননা যা সম্পূর্ণতঃ কাল্পনিক তা কখনোই প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। আবার কি রজ্জু কি সর্প কেবল মাত্র ভাবনা বা ধারণা বলে চিহ্নিত করাও ঠিক নয়। কার্যতঃ আমরা কোন সর্পের ধারণাকে দেখি না, দেখি সাপকে। আর ভ্রম বাতিল হলে ধারণা বাতিল হয়ে যায় না। এ ক্ষেত্রে যা বাতিল হয় তা কেবল সর্পের সরাসরি অভিজ্ঞতাই। এইভাবে অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সে অনুযায়ী যেমন একথা বলা ঠিক নয় যে সাপ হলো ধারণামাত্র তেমনি ঠিক নয় সাপটিকে অত্যন্ত অসৎ বলা। এখন প্রশ্ন জাগে তাহলে কি রজ্জু-সর্প দর্শনের সর্প কি সৎ? অদ্বৈত বেদান্তবাদী বলবেন, না কেউই দড়িতে সত্যি সাপ দেখে না, সাপের ভ্রম হয়। অতএব সাপটি না সত্যি না মিথ্যা অর্থাৎ না সৎ, না অসৎ, না অস্তিত্বশীল না অনস্তিত্বশীল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সেই দিকেই চালিত করে। সাধারণের অভিজ্ঞতা হলো এই যে সাপ কোন কিছু না কিছুকে ইংগিত করে। কিন্তু রজ্জু-সর্প দর্শনে সাপের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে এখানেও সাপ বলে কোন কিছু নেই। ফলে সাপ সম্পর্কে কোন কিছুই যখন সঠিকভাবে বলা যায় না তখন একটা কথাই নির্দ্ধিধায় বলা যায়, তা হলো অনির্বচনীয়। অদ্বৈত মতে ভ্রম পর্যায়ে কেবল সৃষ্ট অনির্বচনীয় কোন সত্তাকে আমরা চোখের সামনে দেখি। এখন প্রশ্ন: রহস্যজনক সত্তাটির সৃষ্টি কিভাবে হয়? সকল রকম সৃষ্টির মূলে কি আছে? অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ের স্পষ্ট উত্তর হলো, এই রহস্যজনক সত্তার উদ্ভব অবিদ্যা থেকে। অবিদ্যার দ্বৈত ভূমিকা

বর্তমান-আবরণ ও বিক্ষেপ। রজ্জু সর্প-ভ্রমে রজ্জু আবরণ, আর সর্পারোপ হলো বিক্ষেপ। যখন এই অবিদ্যা দূরীভূত হয় তখন আমরা আর সাপ দেখি না। শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্মন্। অবিদ্যা এই শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্মণ্‌কে আবরিত করে এবং পরবর্তীকালে বস্তুজগতের আরোপ ঘটায়। এখান থেকেই রজ্জুতে সর্প-ভ্রম-রূপ ঘটনা ঘটে। তবে অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ও রজ্জু ও সর্পের পার্থক্য স্বীকার করেন। যদিও চরম সত্তার দিক থেকে উভয়েই অসৎ। আবার অসতের তারতম্য অনুযায়ী রজ্জু সর্পের থেকে অধিকতর অস্তিত্বশীল। এই যে সাপের অধিকতর অসৎ হওয়া বেদান্ত পরিভাষায় তা প্রাতিভাসিক সত্য, আর অধিকতর সৎ দড়ি এখানে ব্যবহারিক সত্য। অবশ্য চরম সত্যের দিক থেকে উভয়েই অসৎ। অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় কোন সত্তারই সঠিক ব্যাখ্যা দেন নি। কেননা তাঁদের মতে কোন প্রকার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সকলই অনির্বচনীয়। তাই বেদান্ত মতে সকল প্রকার ভ্রমের নাম হলো অনির্বচনীয় খ্যাতি।

অনির্বচনীয়খ্যাতির যে তাৎপর্যই থাকুক না কেন ভ্রমতত্ত্ব অনুসারে তা শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতি ও বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী আত্মখ্যাতির থেকে ভিন্ন কিছু নয়। অনির্বচনীয়খ্যাতি আসলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই বক্তব্য তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অথচ আমরা কার্যত বেদান্ত দার্শনিকদের দেখি শূন্যবাদী ভ্রমতত্ত্ব অসৎখ্যাতিবাদের যথেষ্ট পরিমাণে সমালোচনা করেছেন। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে দ্রষ্টা সত্যি সত্যিই সাপের অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সাপের সত্যিকারের অবস্থান কি? মিথ্যা না হয় স্বীকার করা গেল কিন্তু অত্যন্ত অসৎ বলা যায় কি? অত্যন্ত অসৎ এর উদাহরণ হতে পারে যেমন বন্ধ্যাপুত্র, তেমন কোন অসৎ নিশ্চয়ই সাপ নয়। অবশ্য যেমন সাপ অসৎ নয় তেমনি তার বিপরীত সৎও বলা যায় না। কারণ সাপের সত্যি-কারের অস্তিত্বের সঙ্গে সর্প-ভ্রমের সাপের অস্তিত্বের আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা সর্প-ভ্রমে সাপের অস্তিত্ব কোন কালে, কোন দেশে, কোন অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাবে না। অতএব এই সর্প-ভ্রম সাপের অস্তিত্বকে সৎও বলা যাচ্ছে না। এই সাপ না সৎ, না অসৎ। কিন্তু না সৎ না অসৎ হলেও এই সাপের তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমেই মূল সাপের প্রকৃতির উপলব্ধি করা যায়। এই ভাবে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদার

পার্থক্য করেছেন। ব্রহ্মে জগৎভ্রম মূলাবিদ্যা আর শুক্তিতে রজতভ্রম তুলাবিদ্যা। মূলাবিদ্যা অনাদি, তুলাবিদ্যা সাদি। মূল্যবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান বা পারমার্থিক উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিনষ্ট হয় না, কিন্তু তুলাবিদ্যা সৃষ্টি বিনাশ চলমান সংসারেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু উভয়ই মূলত অবিদ্যা। অবিদ্যা উৎপন্ন মাত্রই অনির্বচনীয়। কিন্তু রজ্জু-সর্প-ভ্রমে সাপের অস্তিত্ব যত ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক না কেন শূন্যবাদীদের মত অত্যন্ত অসৎ নয়, যেমন বন্ধ্যা-পুত্র। সর্প-ভ্রমে সাপের অস্তিত্ব শুধু তুলনার দিক থেকে সত্য। ভ্রমের অস্তিত্ব আসলে কোন দেশে কোন কালে থাকতে পারে না। তা মূলতঃ অসৎ কিন্তু অলীকের সঙ্গে তুলনায় সত্যি প্রতিভাত হয়। এই হলো অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভাববাদী সম্প্রদায় মাত্রই সত্যতা মিথ্যাত্বের ক্ষেত্রে ডিগ্রীর তারতম্য স্বীকার করেছেন। কেননা শূন্যবাদী সম্বৃতি সত্যই বেদান্ত দর্শনে দু ভাগে বিভক্ত হয়েছে, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যে। কিন্তু শূন্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা দিয়ে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত বেদান্ত ভ্রমতত্ত্ব নাগার্জুনকৃত শূন্যবাদের ভ্রমতত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে যায় রজ্জু ও সর্প উভয়কেই অসৎ আখ্যা দিয়ে। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ তাঁর ন্যায়দর্শন গ্রন্থে[16] বিস্তৃত ব্যাখ্যায় উক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। এই ভাবে তিনটি ভ্রমতত্ত্বই শেষ পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে একই মতবাদকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় তৎপর দেখা যায়। সেই মতবাদ ভাববাদ। এদের মধ্যে যে নামমাত্র পার্থক্য তা কেবল সম্প্রদায়গত পরিভাষা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মূলত এই ভ্রমবিচার সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বাহ্যবস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই গুরুত্ব সহ গৃহীত হয়েছে। আর এই নিরিখকে কেন্দ্র করেই দর্শনের দ্বন্দ্ব উন্মেষিত হয়েছে ভাববাদ ও বাহ্যবস্তুবাদকে ঘিরে। ভাববাদ যেখানে ভ্রমতত্ত্বের মাধ্যমে বাহ্যবস্তু জগতের অস্তিত্বকে পুরোপুরি নস্যাৎ করেছেন, বাহ্যবস্তুবাদ সেখানে ভাববাদী ভ্রমতত্ত্বের ভিত্তিমূল ধরেই টান দিয়েছে। এখন আমরা উক্ত বিষয়ই আলোচনা করব।

যে ভ্রমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভাববাদী সম্প্রদায় জগতের সকল কিছুকে নস্যাৎ করেছেন ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সেই ভ্রমের সূত্র ধরেই বাহ্যবস্তু সহ জগতের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়

অত্যন্ত দৃঢ়তায় প্রমাণ করেছে যে ভ্রমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কখনোই বলা যায় না সব কিছুই অসৎ। ভ্রম কথাটির মধ্যেই ক্রিয়া বর্তমান। ক্রিয়া সকল সময় বাস্তবতাকে সূচিত করে। বাস্তবতা সূচিত করে সত্যতাকে। রজ্জু-সর্প-ভ্রমের ক্ষেত্রেই তাই রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয় সেখানে না সর্প না রজ্জু কোনটাই কিন্তু অসৎ নয়। উভয়ই বাস্তব, বস্তুগত সত্তার অধিকারী। এখন প্রশ্ন তা হলে ভ্রমের ব্যাখ্যা কি? ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় দু প্রকার মত ব্যক্ত করেছে। ইতিপূর্বেই আলোচিত একটি অখ্যাতি এবং আর একটি অন্যথাখ্যাতি বা বিপরীত খ্যাতি।

প্রভাকর মীমাংসকদের মতে খ্যাতি কথার অর্থ জ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান। ভাববাদী বক্তব্য খ্যাতি মানে ভ্রমজ্ঞান, প্রভাকর মীমাংসকদের মতে সম্পূর্ণতঃ অপব্যাখ্যা প্রসূত। খ্যাতি মানেই যথার্থ জ্ঞান। তাই অখ্যাতিবাদ অনুসারে ভ্রম বলে কিছু নেই। তথাকথিত ভ্রমজ্ঞান কখনোই মিথ্যা নয়, বাহ্যবস্তু বিষয়ক ও সত্য। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে রজ্জু ও সর্প উভয়ই বাহ্যবস্তু উভয়েই বাস্তব সত্য। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে ভ্রমজ্ঞান স্থলে 'এই হয় সাপ' এইরূপ জ্ঞান হয় বলে সকলেই মনে করি। বস্তুতঃ এখানে কোনপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানই হয় না। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে আসলে দুটি স্বতন্ত্র জ্ঞান হয়—গ্রহণাত্মক ও স্মরণাত্মক। 'এই হয় সাপ' জ্ঞানে 'এই হয়' রূপে জ্ঞাতার সামনে বর্তমান রজ্জুর ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষবশতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তা গ্রহণাত্মক আর অন্যটি সাপ এর স্মরণাত্মক জ্ঞান। স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়, কেননা এখানে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের ফলে রজ্জু ও তার সঙ্গে রজ্জুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়। আর এই প্রত্যক্ষের ফলে পূর্বানুভব জনিত সংস্কারের উদ্ভব হয়, তখনই এই স্মরণাত্মক জ্ঞান জন্মায়। ফলে রজ্জু-সর্প-ভ্রম মূলতঃ দুটি জ্ঞানের সমাহার, একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অন্যটি স্মৃতি জ্ঞান। এই দুটি জ্ঞানই স্বতন্ত্রভাবে যথার্থ। পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বরং অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ রজ্জুর রজ্জু হিসেবে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ নয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম কখনোই হতো না যদি দুটি জ্ঞানের ও তাদের সৎ বিষয়ের স্বাতন্ত্র চিহ্নিত হতো। অতএব দুটি জ্ঞানের ও তাদের সৎ বিষয়ের ভেদ চিহ্নিত না করতে পারার ফলই হলো রজ্জু-সর্প-ভ্রমের উৎপত্তি। আসলে দুটো জ্ঞানকে একত্রে গুলিয়ে ফেলি বলেই তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের উদ্ভব বা

ভ্রান্ত ব্যবহার হয়ে থাকে। এই দুটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের ভেদের খ্যাতির অভাবই অখ্যাতি। তাই প্রভাকর ভ্রমের নাম দিয়েছেন অখ্যাতি।

কিন্তু অখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে একটি কথা বিশেষভাবে উঠতে পারে তা হলো দুটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের ভেদের অভাব অর্থাৎ অজ্ঞান কি করে প্রবৃত্তির সৃষ্টি করতে পারে। কেননা ভ্রান্ত ব্যক্তিটি সর্পজ্ঞানে শিহরিত হয় বা শুক্তি-রজত-ভ্রমে, রজত গ্রহণে তৎপর হয়। একমাত্র বিশিষ্ট জ্ঞানই প্রবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারে। অতএব ভ্রমজ্ঞান স্থলে ব্যক্তির বিশিষ্ট জ্ঞান হয় একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ প্রভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় এই ভুলটি করেছেন। এখানে ভাববাদী সম্প্রদায় যে অর্থে ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করে সকল প্রকার জ্ঞানকেই ভ্রম বা মিথ্যা বলে চিহ্নিত করে যে প্রকার দোষ কুড়িয়েছেন অনুরূপ দোষের শিকার হয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে যদি ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ও লোকব্যবহারমূলক প্রমাণ ভ্রমজ্ঞানের পার্থক্য স্বীকার না করে জ্ঞানমাত্রকেই যথার্থজ্ঞান বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। অতএব ভ্রমজ্ঞানকে অস্বীকার করা মানে এক ভুলকে চিহ্নিত করতে গিয়ে অন্য ভুলের ফাঁদে পা দেওয়া। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় কখনো লোক-ব্যবহারকে খাটো করতে পারে না, কারণ লোকব্যবহারই ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি। ভাববাদী সম্প্রদায় এই পরমার্থ উপলব্ধি করেই লোকব্যবহার যুক্ত অভিজ্ঞতাকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় বিশেষ করে কুমারিল প্রভাকরের উক্ত দুর্বলতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই অন্যথাখ্যাতিবাদকেই সমৃদ্ধ করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সাথে অন্যথাখ্যাতিবাদ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। অন্যথাখ্যাতির অর্থ অন্যথাসিদ্ধ। যার অর্থ কোন কিছুতে কোন কিছুর ভ্রমজ্ঞান। ভ্রমজ্ঞান কখনোই অসদ্‌বিষয়ক নয়। প্রাভাকর মীমাংসকদের মত ন্যায়-বৈশেষিকগণ প্রথমেই সম্পূর্ণরূপে ভ্রমজ্ঞান উড়িয়ে না দিয়ে তার যে তাৎক্ষণিক তাৎপর্য বিদ্যমান একথা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ লোক সমাজে লোকব্যবহারমূলক ভ্রমজ্ঞান হয় একথা স্বীকার করেছেন। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে যখন আমাদের রজ্জুতে সর্পের ভ্রমজ্ঞান হয় তখন আমরা সত্যি সত্যিই কল্পিত আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি। প্রাভাকর মীমাংসকদের মত অনুযায়ী তা কি শুধু দুটি জ্ঞানের

মধ্যে ভেদ চিহ্নিত করতে না পারার জন্যই। তাহলে যে বাস্তব প্রতিক্রিয়া যেভাবে ঘটে তা কি আদৌ সম্ভব হত। অতএব প্রাভাকরদের মত শুধু নঙর্থক দিক থেকেই বিষয়ের ব্যাখ্যা দিলে ভাববাদ সৃষ্ট যে সূক্ষ্ম অদৃশ্য জাল তাতে যে কোন সময় জড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে সম্ভাবনা যে আদৌ দেখা দেয় নি তা নয়, প্রাভাকরকে কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন বৈদান্তিক বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তির চরম বিরোধিতা হলো প্রাভাকর মীমাংসকদের অখ্যাতিবাদ। প্রাভাকর সকল প্রকার জ্ঞানই সদ্‌বিষক, যথার্থ একথা স্পষ্টভাবে শুধু স্বীকারই করেন নি, তার যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে সন্নিষ্ঠ প্রয়াসী হয়েছেন। সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে অবস্থান করে প্রভাকর কি করে বৈদান্তিক হবেন? তবে প্রাভাকর মীমাংসকদের দুর্বলতা উপেক্ষণীয় নয়। প্রাভাকর মীমাংসকদের ভ্রমজ্ঞান ব্যাখ্যা ভাববাদের প্রভাবের যে অদম্যতা তাকে রোখা যাবে না। এই যে দুটি জ্ঞানের মধ্যে ভেদ চিহ্নিত করতে না পারা, এইটুকুই ভাববাদী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে সোরগোল তুলবেন, এই ভেদ চিহ্নিত না করতে পারাটাই অজ্ঞান বা অবিদ্যাপ্রসূত। আর এই অবিদ্যাই জগতের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে।

অতএব ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিক সম্প্রদায় বস্তুত: ভ্রমজ্ঞান যে ঘটে এবং তা যে বিশিষ্টজ্ঞান একথা স্বীকার করেছেন। আমরা কার্যত রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে থাকি। কিন্তু সদৃশ বস্তুভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে, যেমন শুক্তিতে কখনোই সর্পভ্রম হয় না। ফলে যে কোন প্রকার ভ্রম জ্ঞানের স্থলে বাহ্যবস্তু জগতের কোন না কোন বস্তুই উপস্থিত থাকে। যদি এই বস্তুগুলি বস্তুরূপে চোখের সামনে উপস্থিত না ও হয় প্রাভাকর মীমাংসক-দের মত অনুযায়ী, আকার বা স্বরূপটা এইরূপে স্মরণাত্মক জ্ঞান হলেও তা বাহ্যবস্তুবিষয়কই।

এমন কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দিক থেকেও যদি ধরা যায় তাহলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটা প্রত্যক্ষ, যদিও এই প্রত্যক্ষ অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ। আর এই যে অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ তা এই জন্য নয় যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বর্তমান। অবিদ্যার প্রশ্নই নেই। কেননা ভ্রমে সাধারণতঃ একটির স্থলে অন্যটির প্রত্যক্ষ হয়। আর একটির জায়গায়

অন্যটির প্রত্যক্ষ হয় এর মানে এই নয় যে যার জায়গায় যে বস্তুটির প্রত্যক্ষ হচ্ছে সেই বিষয়টি কোন কালে বা কোন স্থানে নেই। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে যদিও জ্ঞাতার সামনে সর্পের উপস্থিতি নেই, কিন্তু সর্পের অবস্থান অবশ্যই অন্য কোন জায়গায়, অন্য কোন সময়ে উপস্থিত আছেই। যেমন বনে বা চিড়িয়াখানায় সাপ বর্তমান। জ্ঞাতা যদি কোনদিনই কোনকালেই সত্যি-কারের কোন বাস্তব সাপকে কখনোই না দেখে থাকে তাহলে তার পক্ষে রজ্জুর ক্ষেত্রে সর্পভ্রম হওয়া সম্ভব নয়। ফলে রজ্জুর মত সর্পও সমানভাবে বস্তুগতদিক দিয়েই সত্যি। যদিও জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের সময় জ্ঞাতার সামনে উপস্থিত নেই সেই সাপ, অন্যত্র বা অন্য কোথাও উপস্থিত আছে। অন্যত্র বলতে অন্যথা বোঝান হয়েছে। তাই ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের খ্যাতি বাদকে অন্যথাখ্যাতিবাদ রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই অন্যথাখ্যাতি বাদ বিপরীতখ্যাতিবাদ নামেও পরিচিত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে একথা না হয় সত্যি একটির ক্ষেত্রে অন্যটির অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে। যদি সত্যি সত্যিই সাপের বাস্তব অস্তিত্ব থেকে থাকে তো তা জঙ্গলে বা চিড়িয়াখানায় আছে কিন্তু জ্ঞাতা কি করে সেই অন্যত্রর সাপকে রজ্জুতে দেখে? কারণ যে কোন প্রকার প্রত্যক্ষেই বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে। যখন রজ্জুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয় তখন রজ্জুর প্রত্যক্ষই তো ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা না হয়ে অন্যথা অর্থাৎ অন্যত্র, অন্য সময়ের অন্য একটি-বস্তু কি করে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের বিষয় হয় বা হতে পারে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষই বা ঘটে কি করে?

ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মনোবিদ্যাগত দিক থেকে। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে রজ্জুর প্রত্যক্ষের সময় রজ্জুর প্রকৃতি কখনো কখনো অনুরূপ সাধারণ প্রকৃতির স্মৃতির উদ্রেক করে। এই স্মৃতিই অসাধারণ সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে। একেই ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে চিহ্নিত করেছেন।

মীমাংসক কুমারিল কিন্তু এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান উপস্থিত করেছেন। কুমারিলের মতে ভ্রম প্রত্যক্ষ কখনোই সরাসরি প্রত্যক্ষ নয়। ভ্রম প্রত্যক্ষ আসলে একপ্রকার স্মৃতিবিভ্রাট। প্রত্যক্ষ 'এই'র

সঙ্গে অতীত প্রত্যক্ষের যে স্মৃতি তার সঙ্গে গুলিয়ে যায় বলেই ভ্রমজ্ঞান হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় এই সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নন। যদি প্রত্যক্ষ ও স্মৃতিজ্ঞানের বিভ্রাটের ফলেই ভ্রমজ্ঞান হয়ে থাকে তো জ্ঞাতা কেন বলে না আমার সাপের স্মরণ হয়েছিল? বরং জ্ঞাতা বলে 'আমি সাপ দেখলাম'। ফলে ভ্রমজ্ঞান স্পষ্টই যে প্রত্যক্ষ সম্ভূত একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে অসাধারণ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষই এই ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ঘটায়। ন্যায় সম্প্রদায় এখানে সুগন্ধি চন্দন কাঠের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এখানে সরাসরি সন্নিকর্ষ হয় দৃশ্য চন্দনকাঠের আকারের সঙ্গে এবং পূর্বদৃষ্ট সুঘ্রাণের জ্ঞানই এই সন্নিকর্ষ ঘটাতে যথেষ্ট। এইভাবে পরবর্তী মীমাংসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নব্য নৈয়ায়িকদের বাকদ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন চলে আসছে। আমরা নিশ্চয়ই দ্বন্দ্বের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করব না। কারণ এই দ্বন্দ্বের নিরসন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বরং একথা বলা যায় যে ভাববাদী ভ্রমতত্ত্ব নিরসনে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় যে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তা ভাববাদী ভ্রমতত্ত্ব খণ্ডনে যথেষ্ট। এই প্রমাণ এমন বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য যে ভাববাদের দার্শনিক ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন তাহলে ভ্রমজ্ঞানের উৎস কি? এর উত্তরে মহর্ষি গৌতম স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন[17]—**'তত্ত্বপ্রধানভেদাচ্চ'**। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় ভ্রমজ্ঞানের দুটি বিশিষ্ট উপাদানকে স্বীকার করেছেন। এক কথায় ভ্রমজ্ঞানের বিষয় দ্বিবিধ—'তত্ত্ব' ও 'প্রধান'। এই তত্ত্ব ও প্রধানের ভেদ বশতঃই ভ্রমজ্ঞান হয়। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে রজ্জু হলো তত্ত্ব এবং রজ্জু বস্তুতঃ রজ্জুই, সর্প নয়। রজ্জুতে সর্প আরোপ হয়। এই সর্প হলো প্রধান। এখানে রজ্জু-সর্প-ভ্রমে সর্পই প্রধান। অতএব রজ্জু অংশে রজ্জু যথার্থজ্ঞানই, তাই তত্ত্ব। আর সর্প অংশেই যেহেতু ভ্রম হয় তাই প্রধানাংশেই ভ্রম হয়। মহর্ষি গৌতমের মতে এই তত্ত্ব ও প্রধানের ভেদবশতঃই ভ্রমজ্ঞান হয়ে থাকে। তবে উল্লেখের বিষয় হলো মহর্ষি গৌতম ভ্রমজ্ঞানে তত্ত্ব ও প্রধানের ভেদ-জ্ঞানের অভাবের কথা উল্লেখ করে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো প্রমাজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান পরস্পর একই জ্ঞানে অংশবিশেষ হিসেবে বর্তমান

থাকে। তত্ত্ব ও প্রধান উভয়ই বাহ্যবস্তুবিষয়ক। উভয়ের ভেদজ্ঞানের অভাব বশতঃই ভ্রম জন্মে। রজ্জু-সর্প-ভ্রমে রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্য বশতঃ ভেদজ্ঞান লোপ পায়। তাই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ভ্রমের অন্যতম কারণ। সাদৃশ্যবশতঃ পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণাত্মক জ্ঞান হয় আর তাই ভ্রমজ্ঞানের সহায়ক হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে এই প্রকার সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে চিহ্নিত। ভ্রমজ্ঞান তাই কখনোই অসদ্‌বিষয়ক নয়। ফলে ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করে জগৎমিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করার যে ভাববাদী প্রয়াস তা বস্তুবাদী ভ্রমবিচারের ফলে সংঘর্ষের সম্মুখীন। এই সংঘর্ষ সংকটের রূপ নেবে যখন দুপ্রকার সত্যের তত্ত্ব আলোচনায় ভাববাদ বিরোধী দার্শনিক-সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব দেখিয়ে বাহ্যবস্তুর সত্যতা প্রতিপাদন করবে। এখন আমরা দুপ্রকার ভাববাদী সত্যতার তত্ত্ব আলোচনা করব।

দুপ্রকার সত্যের তত্ত্ব

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ মূলতঃ দুপ্রকার সত্যের তত্ত্ব হাজির করে তারই উপর সমস্ত দার্শনিক ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। ইতিপূর্বেই আলোচিত এই দুই প্রকার তত্ত্ব যথাক্রমে পারমার্থিক সত্য ও সম্বৃতি সত্য বা ব্যবহারিক সত্য। এই দুই প্রকার সত্যের তত্ত্ব ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারেন নি। কেননা ভাববাদ অনুযায়ী পারমার্থিক সত্যই যদি চূড়ান্ত সত্য হয় তবে আর এক প্রকার সত্যের কথা আসে কি করে? পারমার্থিক সত্যই তো ভাববাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগতিপূর্ণ। তবে আর একটি সত্য স্বীকার কি স্ববিরোধিতা নয়? সত্যের কি প্রকার হয়? অর্থাৎ সত্যের কি ডিগ্রী হয়? তাহলে যে দ্বিতীয় প্রকার সত্য অর্থাৎ সম্বৃতি বা ব্যবহারিক সত্য একথা বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের মতে এর একটাই তাৎপর্য যেন তেন প্রকারে লোক সাধারণের মনে একটা ধাঁধার সৃষ্টি করা যাতে নিজেদের দুর্বোধ্য উদ্ভট দার্শনিক তত্ত্বকে কোন মতে আবৃত করা যায়। অথচ ভাববাদী দার্শনিক সম্প্রদায়

দৃঢ় ধারণায় আবদ্ধ যে চূড়ান্ত সত্য বলতে একটাই, তা হলো পারমার্থিক সত্য। তা যে গোপন করেছেন তাও নয়। তবুও এর পাশাপাশি যা তাঁদের মতে মিথ্যাই তাকে আপাত সত্যের নামাবলী পরাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় নানা প্রসঙ্গে নানান মন্তব্যে ভাববাদী সম্প্রদায়ের এই স্ববিরোধিতা তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা কুমারিলের একটি উদ্ধৃতি[১৪] এখানে তুলে ধরব যা স্পষ্ট করে ভাববাদের প্রচ্ছন্ন বঞ্চনাকারী প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে। **সংবৃত্তের্ন তু সত্যত্বং সত্যভেদঃ কুতোহন্বয়ম্। সত্যং চেৎ সংবৃতিঃ কেয়ং মৃষা চেৎ সত্যতা কথম্।**

ভাববাদী দর্শন ও দার্শনিকগণ ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যে প্রতীয়মান বা আভাসিক সত্যের কথা তুলে ধরেছেন, তাঁদের পরিভাষায় যা সম্বৃতি সত্য কুমারিলের মতে, সত্যি সত্যি প্রতীয়মান সত্য হিসেবে তেমন কোন সত্যতা নেই, তাহলে এই বিশেষ ধরণের সত্যতার কথা বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে? আর যদি সত্যতাই হয় তাহলে তাকে মিথ্যাই বা কেন বলা? আর যদি মিথ্যাই হয় তবে কেন সত্য বলা? তিনি আরো[১৭] স্পষ্ট করে বলেছেন—**সত্যত্বং ন চ সামান্যং মৃষার্থ পরমার্থয়োঃ। বিরোধাৎ ন হি বৃক্ষত্বং সামান্যং বৃক্ষসিংহয়োঃ।**

সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব পরস্পর বিরোধী হয়ে কি করে একে অপরকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। বৃক্ষত্বকে কি একই সঙ্গে বৃক্ষ এবং সিংহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে, যা সম্পূর্ণতঃ পরস্পর বিরোধী।

একথা তো ভাববাদী সম্প্রদায়ের নিজেদেরই কথা, প্রতীয়মান সত্য হলো মিথ্যারই নামান্তর। তাহলে কেনই বা সত্য ব্যাখ্যা দেওয়া? কারণ তা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্য হলো একটি বাচনিক ধোঁকা দেওয়া মাত্র। মিথ্যাকেই শুধুমাত্র পণ্ডিতিয়ানার বহর দেখিয়ে একটু পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখানো। এটা ওঁদের একটা সর্বজনবিদিত উপর চালাকি। যেমন পণ্ডিতিয়ানা জাহির করার জন্য থুতুকে 'বক্ত্রাসব' বলা, সহজ সাধারণ ভাষায় 'লালা' বলার পরিবর্তে যেমন বলা 'মুখ নিঃসৃত রস'। এখানে শ্লোকটির উল্লেখ করছি।[২০] **তুল্যার্থত্বেহপি তেনৈষাং মিথ্যা সংবৃতি শব্দয়োঃ। বঞ্চনার্থ উপন্যাসো লালা-বক্ত্রাসবাদিবৎ।**

কিন্তু এখন প্রশ্ন, কেন এই পণ্ডিতিয়ানা, কেনই বা সহজ সাধারণ ভাষায় সরাসরি মিথ্যা না বলে প্রতীয়মান সত্য বা সম্বৃতি সত্য বলা। এর উত্তর পূর্বেই উল্লেখিত। আসলে মূল উদ্দেশ্য হলো সম্বৃতি কথার মধ্য দিয়ে উদ্ভট তত্ত্ব জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে সরাসরি সম্পূর্ণ অসৎ বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাতে করে বোঝানো যায় যে দৃষ্ট বস্তুজগৎ নিছকই কল্পনাপ্রসূত, সাধারণে যা বিশ্বাস করে তা নয়। এইভাবে বাচনিক ধোঁকার পরিবর্তে তো সততার সঙ্গে বলা উচিৎ ছিল। যার অস্তিত্ব নেই, তা অস্তিত্বহীন আর যার অস্তিত্ব বর্তমান, তা সম্পূর্ণতঃই অস্তিত্বশীল। দ্বিতীয়টিই একমাত্র সত্য। প্রথমোক্তটি মিথ্যা। কিন্তু ভাববাদী সম্প্রদায় তার পরিবর্তে দু প্রকার সত্যের তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন, যার কোন প্রকার অর্থই হয় না। তবুও এইভাবে কুমারিল, পরবর্তীযুগে যত সুস্পষ্ট করে দুই প্রকার সত্যের তত্ত্বকে দার্শনিক উৎকর্ষে ব্যাখ্যা করেছেন ততখানি তাৎপর্যমণ্ডিত করে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আলোচিত হয় নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় এ নিয়ে উদাসীন ছিলেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বরং জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ভাববাদ প্রতিরোধে এমন উল্লেখযোগ্য প্রতিস্থানীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা ব্যবহারিক জীবনের প্রামাণ্য সত্যতাকে মিথ্যায় পর্যবসিত করার ঐকান্তিক ভাববাদী প্রয়াসকে প্রতিহত করেছে। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন ব্যবহারিক জীবনকেই সত্যতা বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তা করতে গিয়ে ব্যবহারিক জীবনকে কল্পিত প্রতীয়মান সত্যে প্রতিপন্ন করার ভাববাদী চেষ্টা যে কৌশলপ্রসূত তা প্রমাণ করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত, ব্যবহারিক জীবনই সত্যতা বিচারের মানদণ্ড হলো ভাববাদী সিদ্ধান্ত প্রমাণ বিধ্বংসের চূড়ান্ত উত্তর। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি নাগার্জুনের প্রমাণ বিধ্বংসতত্ত্ব অনুযায়ী মূল কথা হলো কোন প্রমাণই বৈধ নয়। এই সিদ্ধান্তর সমর্থনে কি তার যুক্তি? তার যুক্তি হলো প্রমাণকে বৈধ হতে হলে তার বৈধতার জন্য অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়, আবার সেই অন্য কোন কিছুকে বৈধ হতে হবে। আর তার বৈধতার জন্য তাকে পুনরায় অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়। এই ভাবে এক অন্তহীন অনবস্থা দোষ ঘটে। ফলে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত না হয়ে উপায় নেই যে প্রমাণের কোন প্রকার বৈধতাই সম্ভব নয়। কারণ প্রমাণের তত্ত্ব যে প্রামাণ্য তার নিশ্চয়তা অসম্ভব।

বাৎস্যায়ন গৌতম সূত্রের ভাষ্যে এই প্রকার যুক্তির যে খণ্ডন উপস্থিত করেছেন তা ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বাৎস্যায়নের এই যুক্তি খণ্ডন একই সঙ্গে ভাববাদী দুই প্রকার সত্যের তত্ত্বকে ও খণ্ডিত বা বর্জন করে।

ন্যায়সূত্রের প্রথম সূত্রেই মহর্ষি গৌতম বলেছেন প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যথার্থ অনুভূতির সাধনই প্রমাণ। গৌতমের এই অভিমতের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মালেই যে সেই জ্ঞান যথার্থ হবে তার নিশ্চিতি কোথায়? বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে তারই উত্তর অত্যন্ত সুপ্রযুক্তভাবেই উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয়ই সম্ভব। আর তা সম্ভব অনুমান প্রমাণের দ্বারাই। তাঁর মূলকথা হলো এই যে—[২১]**প্রমাণম্ অর্থবৎ প্রবৃত্তি-সামর্থ্যাৎ**। প্রমাণ ভিন্ন অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। আর অর্থের যথার্থ বোধেই সফল প্রবৃত্তি ঘটে।

এই মূল বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের প্রমাণ কথার অর্থ উপলব্ধি প্রয়োজন। তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে—প্রকৃষ্ট মান বা জ্ঞানই প্রমাণ। জ্ঞান সকল সময়ই কোন না কোন কিছুর সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। তথ্য সকল সময়ই বস্তুগত। কেননা তথ্য তখনই সঠিক হয় যখন কোন বস্তুকে সূচিত করে। ফলে জ্ঞান মাত্রই কোন কিছুর সফল উপলব্ধি। আর যে জ্ঞান সফল উপলব্ধি দেয় না। সেই জ্ঞান প্রমাণ নয়, প্রমাণাভাস। যেমন মরীচিকায় জল সূচিত হয় অথচ সেখানে জল নেই, ভ্রমে সর্প সূচিত হয় অথচ সেখানে রজ্জু বর্তমান। এখন প্রশ্ন, তাহলে প্রমাণের বৈধতা বলতে কি বোঝায়? বাৎস্যায়নের মতে প্রমাণ আমাদের বৈধ জ্ঞান দেয়। বৈধ জ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য অর্থ পরিস্ফুট করা। তার মানে বৈধ জ্ঞান নির্দিষ্ট বস্তুকে সূচিত করে। এক কথায় প্রমাণের বৈধতা নিরূপিত হয় তখন, যখন জ্ঞান উদ্দিষ্ট বস্তুকে সূচিত করে অর্থাৎ অর্থ উপলব্ধিতে সাহায্য করে। অতএব প্রমাণের বৈধতা বলতে বোঝায় জ্ঞান এবং জ্ঞান উদ্দিষ্ট বস্তুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। জ্ঞান এবং জ্ঞান উদ্দিষ্ট বস্তু

যে অবিচ্ছিন্ন তা কিভাবে নির্ণীত হবে? বাৎস্যায়ন এর উত্তরেই বলেছেন—প্রমাণম্ অর্থবৎ। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থের যে বোধ বা যথার্থ অনুভূতি তাকেই বোঝানো হয়েছে। প্রমাণই অর্থের যথার্থ বোধ দেয়, আর অর্থের যথার্থ বোধই সফল প্রবৃত্তি দেয়। জ্ঞাতা যখন প্রমাণের দ্বারা অর্থ উপলব্ধি-বশতঃ সেই অর্থ গ্রহণে বা বর্জনে ইচ্ছে প্রকাশ করে তখন তার সফল প্রবৃত্তি হয়। আর এটা তখনই সম্ভব হয় যখন প্রমাণ যে পদার্থকে যে রূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে সেই পদার্থটি অন্যথা না হয়ে সেই রূপে ও সেই প্রকারের হয়। অতএব প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলতে প্রবৃত্তির সাফল্যকে বোঝায়। প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থের বোধ হলেই সেখানে সেই বিষয়ের প্রবৃত্তি সফল হয়। এখানে অর্থবৎ বলতে অর্থের অব্যভিচারিতা বোঝায়। অনুমান প্রমাণই এ ক্ষেত্রে অর্থের অব্যভিচারিতা প্রমাণ করল। কারণ এখানে সফল প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত থেকেই অনুমান করা হলো যে প্রমাণটি বৈধ।

এখানে বিরুদ্ধবাদী পুনরায় প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রমাণের বৈধতা ন হয় নির্ণীত হলো অনুমানের সাহায্যে, কিন্তু অনুমানের বৈধতা কিরূপে নিরূপিত হবে?

ন্যায়-বৈশেষিক মতে উক্ত ভাববাদী প্রশ্নই আর এক পণ্ডিতিয়ানা সর্বস্ব বাচনিক ধাঁধা মাত্র। কারণ অনুমানের বৈধতা নিরূপণও অনুরূপ সফল প্রবৃত্তির ব্যাপার। যেমন প্রমাণের ক্ষেত্রে তেমনই অনুমানের ক্ষেত্রে, সর্বত্রই যে প্রামাণ্য সংশয় হয় এমন কথা নয়। সফল প্রবৃত্তির পরও কি কখনো প্রামাণ্য সংশয় হয়? যেমন ঘড়ি দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সময়মত ট্রেন ধরবার পরও কি প্রামাণ্য-সংশয় হতে পারে। অনুরূপভাবে জলপানের পর তৃষ্ণা বিদূরিত হলেও কি অনুমানের প্রামাণ্য সংশয় করা যায়? গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী কত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের অনুমানের উপরই আজ চাঁদ কিংবা মঙ্গল-বিজয় সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে। এখানেও কি অনুমানের প্রামাণ্যসংশয় রূপ, প্রশ্ন তোলা যায়? অতএব অনুমান প্রমাণের বৈধতাও যথারীতি সফল প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অনুমান তখনই সত্য যখন ব্যবহারিক দিক থেকে সন্দেহাতীত সাফল্য এনে দেয়। অতএব প্রমাণিত প্রমাণের পুনর্বার বৈধতার প্রশ্ন আসেই না কখনো। তাছাড়া 'সংশয়' 'সংশয়' বার বার বললেই সংশয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। সংশয়কে প্রমাণসিদ্ধ হতে

গেলে অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করতে হয়। অনুমান মাত্রেই সংশয়মুলক এমন কথা ঠিক নয়, লোক ব্যবহারমূলক অনুমান, সংশয়ের উর্ধ্বে।

তবুও প্রশ্ন জাগতে পারে যে প্রমাণের ক্ষেত্রেও যা প্রমাণাভাসের ক্ষেত্রেও তা কখনো কখনো জ্ঞাতাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে সফল প্রবৃত্তির আশায়। এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি করেই বা নিরূপিত হবে। এখানে কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন প্রমাণাভাসের দ্বারাই ভ্রমাত্মক প্রতিপত্তি হয়, কিন্তু তা কখনোই সফল প্রবৃত্তির জনক হয় না। জয়ন্ত ভট্ট এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সফল প্রবৃত্তির আশায় যখন জ্ঞাতা কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখনই কিন্তু সফল প্রবৃত্তি হয়ে যায় না। অর্থাৎ প্রমাণের বৈধতা নিরূপিত হয়ে যায় না। জলের আভাস যেমন সূর্য্যকিরণই, কিন্তু সফল প্রবৃত্তিতে পেঁাছে দেয় না। ফলে প্রমাণের বৈধতা প্রবৃত্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। তখনই প্রশ্ন উঠতে পারে প্রবৃত্তি সামর্থ্যের নিশ্চয়তা কিভাবে নিরূপিত হবে? জয়ন্ত ভট্ট তার উত্তরে বলেছেন, তা নির্ভর করে জ্ঞানের সত্যতার উপর। বাৎস্যায়ন তাই প্রবৃত্তি সামর্থ্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রবৃত্তি কথার অর্থ মনোযোগ পূর্ণ ব্যবহার, আর সামর্থ্য কথার অর্থ সেই কর্মের সাফল্যলাভ। ভাববাদী তবুও প্রশ্ন করতে পারেন যে জ্ঞানের সত্যতাই বা কিভাবে নির্ণীত হবে? এইভাবে তো সেই অনবস্থা দোষই এতে বর্তে যায়। ন্যায়-বৈশেষিকের মতে এই ধরণের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কেননা এই ধরণের প্রশ্ন পুনরায় প্রমাণের বৈধতাই অস্বীকার করে। সফল প্রবৃত্তির তো পুনরায় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যা প্রমাণিত, তার আবার প্রমাণ কিসের? সফল প্রবৃত্তি উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিচায়ক। এখানে অনবস্থা দোষ আসে কি করে? একটি উদাহরণের সাহায্যে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় বিষয়টি সমাধা করেছেন। যেমন একই জল বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। যেমন তৃষ্ণা বিদূরণের, পরিশুদ্ধি করণের, স্নানের, তাপ দূরীকরণের ইত্যাদি কিন্তু কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না যদি জল না হয়ে জলের আভাস, মরীচিকা বা সূর্যকিরণ হয়। এখন যদি জ্ঞাতার সফল প্রবৃত্তি উৎপাদনে সমর্থ হয় লৌকিক ব্যবহারের মাধ্যমে তবেই তার বৈধতা নিশ্চিত হয়ে যায়।

তবুও ভাববাদী প্রশ্ন তুলবেন কেন স্বপ্নের ক্ষেত্রে তো তাই হয়। স্বপ্নে

জটিলতর দ্বন্দ্বে মুখর হয়েছে। কুমারিলের ক্ষুরধার যুক্তি বিন্যাসে ভাববাদী সম্প্রদায় যখন তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন, যখন দুই প্রকার সত্যের তত্ত্ব খণ্ডিত, তখন সমতুল মেধা ও পাণ্ডিত্য নিয়ে আবির্ভূত হন ধর্মকীর্তি। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী ধর্মকীর্তি কুমারিলের ভাগিনেয়। কিন্তু যেভাবে কুমারিলের বিরুদ্ধে তিনি অঙ্কুশ ব্যবহার করেছেন তা থেকেই তৎকালীন ভাববাদ ও ভাববাদ বিরোধিতার তীব্র দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়[২৪]।

মহর্ষি গৌতম যখন প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় বাহ্যবস্তুবাদকে সুদৃঢ় করেছেন, মীমাংসক কুমারিল তাকে আরও অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন ভাববাদ খণ্ডনের মধ্য দিয়ে দুই প্রকার সত্যের তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে।[২৫] এইভাবে বাহ্যবস্তুবাদ বা ভূতবাদ যেমন থেমে থাকেনি তেমনি ভাববাদও স্থাণু হয়ে থাকে নি। পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পরবর্তী ভাববাদী চিন্তানায়কগণ নিত্য নতুন যুক্তি বলয় তৈরী করেছেন। কুমারিল পরবর্তী দার্শনিক ধর্মকীর্তি তাই ভাববাদের মূল তত্ত্বকে পুনরায় নতুন আলোক দেওয়ার চেষ্টা করেন। তার জন্য স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ ও তিনি রচনা করেন, সন্তানান্তরসিদ্ধি।

ধর্মকীর্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কেউই কখনো নিজস্ব ধারণার জগতের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এক কথায় কখনোই কেউ কোনভাবে সরাসরি বস্তুতে পেঁছাতে পারে না। অতএব কেবলমাত্র বিষয়ের ধারণার উপর নির্ভর করে সত্যতা যাচাই হয়ে যায় না। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান বাহ্যবস্তুর উপর নয় নিজেরই উপর নির্ভরশীল। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলতে বুদ্ধি বা ধারণাকেই বোঝায়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একই অধিকরণে অবস্থান করে। সহোপলম্ভ নিয়মই এর মূল ভিত্তি।

সহোপলম্ভ কথার অর্থ সহ উপলম্ভ বা সহ উপলব্ধি। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্ন উপলব্ধিই সহ-উপলব্ধি। যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় তখন বস্তুটির আকারেরই উপলব্ধি হয়, বস্তুর কোন অস্তিত্বই নেই। কেন না জ্ঞেয় বিষয় হিসেবে বস্তুর পৃথক উপলব্ধি কখনোই হয় না। তাই নীল জ্ঞানে নীলাকার জ্ঞান বিশেষই নীল। নীলের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। নীলাকার জ্ঞানবিশেষ যেহেতু অনুভূত, জ্ঞান নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তু নীলের অননুভূত সত্তা

অসম্ভব। জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর সত্তা যখন অসম্ভব তখন একথা অস্বীকার করার কোন হেতু নেই যে জ্ঞানই জ্ঞানের বিষয়।

সাধারণ ধারণায় বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব বর্তমান। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন নীল জ্ঞানে নীল বিষয়ক বস্তু বাহ্য-জগতে বর্তমান। সেই বাহ্যবস্তুর সংবেদন ধারণার আকারে ধরা দেয়। ধর্মকীর্ত্তি এই সাধারণের ধারণাকে বলেছেন সংস্কার মাত্র। আসলে বাহ্যবস্তু বলে কিছুই নেই। যা সাধারণের ভাষায় সংবেদন, তা সম্পূর্ণত মানসিক। সকল জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানের আকার মাত্র। এই জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয়র কোন পার্থক্য নেই। জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক, অভিন্ন।

কিন্তু ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ধর্মকীর্ত্তির এই জ্ঞাতা, জ্ঞানও জ্ঞেয় একীকরণ তত্ত্ব মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা নানান যুক্তির সাহায্যে সহোপলম্ভ নিয়ম যে দোষদুষ্ট তা প্রমাণ করেছেন। সহ-উপলম্ভ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমেই প্রশ্ন করা যায় যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি অভিন্ন হয় তবে সহ-উপলব্ধি বলার কি দরকার। সহ শব্দটি যা প্রকাশ করে তা হলো এক নয়, একের অধিক। বৈভাষিক আচার্য শুভগুপ্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে তার বাহ্যার্থ সিদ্ধি গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন-[২৫] **জ্ঞান-জ্ঞেয়স্বভাবশ্চ নিয়ামৎ সহ বিদ্যতে** : স্বভাব নিয়মেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সহাবস্থান। সহাব-স্থান সকল সময়ই ভিন্নকেই সূচিত করে। ভিন্ন পদার্থেই সহাবস্থান সম্ভব। যদি জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন না হয় তো সহাবস্থান কথাটি বলার কোন তাৎপর্যই নেই। যদি 'ক' ও 'খ' এর ভিন্ন অস্তিত্ব ও তদ্রূপ পার্থক্য স্বীকার না করা যায় তো 'ক' ও 'খ' এর সহ উপলব্ধি কথাটি বলা বৃথা। সেইভাবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিন্নত্ব স্বীকার করলেই কেবল জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের একটা অর্থ পরিস্ফুট হয় নচেৎ নয়। প্রত্যক্ষ কখনোই সম্ভব নয় যদি বাহ্য বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে।[২৬]

আচার্য শুভগুপ্তের এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে ভাববাদী সম্প্রদায় বলতে পারেন যে এখানে সহ শব্দটিকে একার্থে ধরতে হবে, সমন্বয় অর্থে ধরলে ভুল করা হবে। শুভগুপ্তের মতে এই প্রকার যুক্তির কোন অর্থই হয় না। সহ শব্দটিকে যদি একার্থ অভিন্ন বা একরূপ অর্থে ধরা ও যায় তাহলে সমস্যার লাঘব হয় না। নতুন করে সমস্যার উদ্ভব হয়, যেমন জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়

যদি অভিন্ন হয় তবে বিভিন্ন জন একই ঘটনা একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় একই রকম দেখতো। যেমন কোন প্রদর্শনী ফুটবল প্রতিযোগিতা যদি কোন একজনের এ রকম নিছক ধারণাই হতো তবে বিভিন্ন দর্শকের একই অভিজ্ঞতা হয় কি করে? নিজস্ব একক ধারণা তো কখনোই সঠিক ধারণা হতে পারে না। এই যুক্তি ধর্মকীর্ত্তি প্রদর্শিত নীলের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য। অতএব শুভগুপ্তের মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় কখনোই অভিন্ন হতে পারে না। ভিন্নই। সহোপলম্ভ নিয়মই প্রমাণ করে দুটি ভিন্ন পদার্থের সমন্বিত উপলব্ধি।

জৈন পণ্ডিত অকলঙ্ক ও শুভগুপ্তের যুক্তিকে সমর্থন করে নীলজ্ঞানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন নীল ও নীলের জ্ঞান যদি অভিন্ন হত, অর্থাৎ নীলাকার জ্ঞান বিশেষই নীল হতো তো জ্ঞাতা অন্যের যে নীলজ্ঞান তাও সমানভাবে দেখতে পারতো। কিন্তু ধর্মকীর্তি প্রদর্শিত যুক্তি হলো জ্ঞাতা কখনোই নিজস্ব ধারণার জগতের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই যুক্তি স্ববিরোধিতাপূর্ণ।

আচার্য শুভগুপ্ত, অকলঙ্কর থেকে ও অধিক মুন্সিয়ানায় মীমাংসক কুমারিল সহোপলম্ভনিয়ম খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় কখনোই অভিন্ন হতে পারে না। কারণ উভয়েরই প্রকৃতিগত ব্যবধান বিরাট। একটি গ্রাহক অপরটি গ্রাহ্য। যিনি গ্রহণ করেন তিনি গ্রাহক, আর যা গৃহীত হয় তা গ্রাহ্য। কুমারিল বলেন, এমন কোন দৃষ্টান্তই কখনো দেখানো যাবে না যেখানে গ্রাহক ও গ্রাহ্য ভাব একই সঙ্গে বিদ্যমান। জ্ঞেয় হলো বিষয়, সেই বিষয় উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি করে একই সময়ে জ্ঞানের উপলব্ধি সম্ভব হয়। নীল রঙের আকার যখন উপলব্ধি হয় তখন তা জ্ঞানের আকার হিসেবে উপলব্ধি হয় না, বরং বিষয়ের আকার হিসেবেই উপলব্ধি হয়। তাই নীল জ্ঞান যখন বলা হয় তখন নীল বিষয়ের সম্পর্কে জ্ঞান বোঝায়, আর তা হয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় যদি অভিন্ন হতো তো জ্ঞানের ধারণা ছাড়াই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি সম্ভব হতো না, আবার তেমনি জ্ঞেয় বিষয় ছাড়া জ্ঞানের ধারণা সম্ভব হতো না, যেমন স্মৃতি বা স্মরণ ক্রিয়ার সময় জ্ঞানে ধারণাই মনে আসে

জ্ঞেয় বিষয় ব্যতিরেকেই। জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন হলে উভয়ের একই সঙ্গে স্মরণ হতো।

এবার কুমারিল আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন ভাববাদীদের নিজের, বক্তব্যই প্রমাণ করে যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন। কেননা উভয়ে যদি অভিন্ন হতো তাহলে দুভাবে ব্যাখ্যারই বা কি প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় না বলে যে কোন একটি নামই যথেষ্ট হতো। আর জ্ঞান ও জ্ঞেয় যদি ভিন্নই হয় তাহলে উভয়কে অভিন্ন বলার কারণ কি? এমন যুক্তি অদ্ভুত নয় কি যে একই জ্ঞান ক্ষেত্র বিশেষে কখনো জ্ঞাতা কখনো জ্ঞেয় হয়। যদি তাদের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য না থাকত অভিন্ন নাম যেমন জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় শব্দ ব্যবহারের তবে প্রয়োজনটাই বা কি?

এখানে ভাববাদী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উত্তর হিসেবে আসতে পারে যে স্মৃতি ও স্বপ্নের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান হয় তা বাহ্য বস্তুর আকার হিসেবে ধরা দেয়, বাহ্যবস্তু হিসেবে নয়। কিন্তু ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই এমন যুক্তি খণ্ডন করেছেন। তবুও এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। মীমাংসক কুমারিল ও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে স্মৃতি ও স্বপ্নে উভয়-ক্ষেত্রেই যে আকার প্রতীত হয়, তা বাহ্য বস্তুরই, যদিও বর্তমানে বাহ্যবস্তু সামনে নেই, পূর্বানুভূতিই আকার হিসেবে ধরা দিয়েছে, কিন্তু সেই বাহ্যবস্তু সেই সময়ে অন্য কোথাও অবশ্যই থাকে। অতএব ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় অনুযায়ী স্বপ্ন ও স্মৃতি কখনোই নির্বস্তু নয়। আর ভ্রমজ্ঞানের প্রশ্ন তো পূর্বেই বিষদভাবে আলোচিত। ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ও অন্য কোথাও না কোথাও উপস্থিত থাকেই। তা না হলে ভ্রমজ্ঞানই বা সম্ভব হতো কি করে? ভ্রম তো তখনই হয় যখন পূর্বানুভূত বিষয়কে ভিন্ন ভাবে দেখে।

ভাববাদী সম্প্রদায় এখানে আরও একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন, যে একই জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় হওয়ার ক্ষেত্রে তো কোন বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ার কথা নয়। কারণ বাহ্যবস্তুর ক্ষেত্রেও তো দেখা যায় একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার প্রতীতি হয়। ভাববাদী সম্প্রদায় উদাহরণ হিসেবে সুন্দরী রমণীর শবদেহের তুলনা করেছেন। উক্ত শবদেহ সাধুর কাছে যেমন, লম্পটের কাছে তা নয়,

আর কুকুরের কাছে তো ভিন্নই। তাহলে একই বাহ্যবস্তু ভিন্ন ভিন্ন ধারণার উদ্রেক করে কেন? কুমারিল এর উত্তরে বলেছেন এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারণার উদ্রেক হওয়ার তো কোন বাধা নেই। কেননা উক্ত তিন প্রকার ধারণাই রমণীর শবদেহে বর্তমান। তাই তিনটি ভিন্ন ধারণার উদ্রেক হয়। আসলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করেছে। একজন যখন এক প্রকার ধারণা গ্রহণ করে তখন অন্যপ্রকার ধারণাও বর্তমান থাকে যেহেতু দ্রষ্টা সেই একটি বিশেষ আকার গ্রহণ করতে উদগ্রীব থাকে তখন অন্য আকারের প্রতি সাময়িক ভাবে উদাসীন থাকে। আর বস্তুর বিভিন্ন আকারের প্রতীতির কথা যদি ভাববাদীরা তোলেন তো তার উত্তরে বলা যায় একই বস্তু অন্যান্য বস্তুর তুলনায় কখনো বড় কখনো ছোট ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের প্রতীতি হতে পারে।

এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় প্রমাণ করেছেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় কখনোই অভিন্ন নয়। জ্ঞান সকল সময়ই বস্তুর জ্ঞান। অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আকারের প্রতীতি হয় তা জ্ঞানের আকার নয় বস্তুরই আকার। জ্ঞান বলতে জ্ঞানেরই জ্ঞান নয় তা যদি হয় তো ভাববাদী সম্প্রদায় যে দোষ প্রতিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে চাপান সেই দোষেই দুষ্ট হয়ে যাবেন। কেননা জ্ঞান হতে গেলেই বাহ্যবস্তুর উপস্থিতি ও জ্ঞাতা উভয়েরই উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়, যাকে ভাববাদী সম্প্রদায় দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে প্রমাণ বিধ্বংসে রত হয়েছেন সেই স্বপ্ন, স্মৃতি, ও ভ্রমজ্ঞান কখনই নির্বস্তু নয়। যদিও বাহ্য বস্তু সে সময় অন্যত্র অবস্থিত।

আমরা এই অধ্যায় শেষ করার পূর্বে অকলঙ্ক ও শুভগুপ্তের দুটি তির্যক পূর্ণ যুক্তির উল্লেখ করব। তাঁদের মতে যদি ধারণাই সব হত তাহলে জীবনধারণের জন্য বস্তুতঃ খাদ্যের প্রয়োজন হত না। খিদে পেলে খাদ্যের ধারণাই খিদে উপশম করতো। তা তো হয় না। যাঁরাই অন্নকে মিথ্যা প্রবঞ্চনাময় বলেন তাঁরাই কিন্তু জীবন ধারণ করেন অন্ন গলাধঃকরণ করেই। অকলঙ্ক বলেন, যদি ধারণাই সব হতো তো শুধুমাত্র বিষ জ্ঞানই মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পারত, তাহলে বস্তুতঃ বিষের প্রয়োজন হতো না। কেবল-মাত্র সত্যিকারের লোকব্যবহারমূলক বিষই মৃত্যু ঘটাতে পারে, বিষের

ধারণা কখনোই নয়। তাহলে তো জীবন ত্যাগে ইচ্ছুক ব্যক্তি ধারণার কথা চিন্তা করেই জীবন ত্যাগ করত।

শুভগুপ্ত অনুরূপ ভাবে বলেন ভাববাদী সম্প্রদায় যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে সেবা শুশ্রূষার ধারণার সঙ্গে লোকব্যবহারমূলক সেবাশুশ্রূষার কোন তফাৎ নেই তাহলে নিজের শুশ্রূষার জন্য বাস্তবিক শুশ্রূষাকারিণীর খোঁজ করতেন না। ভাববাদী কেবল সেবাশুশ্রূষার ধারণার কথা চিন্তা করে স্বপ্নে দেখলেই তাঁর যাতনা মিটে যেতো। এ সবই প্রমাণ করে ভাববাদীদের নিছক ভণ্ডামী। আসলে তত্ত্বের খাতিরে যা বলেন নিজের জীবনে আচরণে তা মানেন না। তখন কিন্তু জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের অভিন্নতা কোথায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই ধরনের কপটাচার ভাববাদী সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব। আসলে শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাই উদ্দেশ্য। তারই জন্য জনমানুষকে বিপথে চালিত করা প্রয়োজন। তাই এই অবাস্তব ভাববাদী তত্ত্ব তৈরী করা হয়েছে। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় এইভাবে বাহ্যবস্তুবাদ সপ্রমাণ করেছেন সহোপলম্ভ নিয়ম খণ্ডনের মধ্য দিয়ে। অতএব নিছক ধারণা কখনোই সত্যতার মাপকাঠি হতে পারে না। লোকব্যবহার সর্বস্ব বাস্তব জীবনই এই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করে।

এইভাবে ধর্মকীর্তির ভাববাদ সংরক্ষণ প্রয়াসও ব্যাহত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায়ে ও অনুরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে তা স্তিমিত হতে হতে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মের মাধ্যমে ভাববাদ টিকে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতি ক্রমশই সেই সূত্রকে ও সঙ্কুচিত করছে দিনের পর দিন।

কার্যকারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা

ভাববাদ মূলতঃ দুটি যুক্তির ভিত্তিতে তার তত্ত্ব গড়ে তুলেছে—প্রমাণ অংশে, প্রমাণ পরীক্ষণ ও প্রমেয় অংশে, পদার্থ পরীক্ষণ। মীমাংসক কুমারিল, এই দ্বিবিধ যুক্তিকে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে অর্থপরীক্ষণমূলক ও প্রমাণাশ্রিত নামে। প্রমাণকাণ্ডে আমরা দেখেছি ভাববাদী সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রমাণ বিধ্বংস। নানান যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিটি

ভাববাদীই নিষ্ঠার সঙ্গে গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রমাণ নস্যাৎ করেছেন। আমরা তার সূত্ররূপ ইতিপূর্বেই জেনেছি। এমনকি কিভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় সেই সব জটিল যুক্তি পদ্ধতির সন্নিষ্ঠ খণ্ডন করেছেন তাও বিশেষভাবে আলোচিত। আমরা এবার প্রমেয়কাণ্ডে ভাববাদী পদার্থপরীক্ষণ পর্যালোচনা করব।

প্রমেয়কাণ্ডে ভাববাদী সম্প্রদায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পদার্থ পরীক্ষণের সাহায্যে কার্যকারণ তত্ত্বই খণ্ডন করেছেন। ভাববাদী দর্শনের মূল দুটি সম্প্রদায় বিশেষ করে শূন্যবাদ ও মায়াবাদ কার্যকারণ তত্ত্ব বর্জন করে স্বতন্ত্র জগৎ তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। শূন্যবাদ ও মায়াবাদ অনুযায়ী কার্য-কারণতত্ত্বের যতটুকু যা প্রয়োজনীয়তা তা কেবল ব্যবহারিক সত্যের ক্ষেত্রে, যা চূড়ান্ত বিচারে, বিশেষ করে পারমার্থিক সত্যের কাছে মূলতঃ মিথ্যাই। মাধ্যমিক পণ্ডিত নাগার্জুন, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে আলোচিত কার্যকারণ বিধিকে কূটতর্কের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিচারে যে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সমূহের কার্য-কারণ বিধিকে মূলতঃ চারটি সম্ভাব্য যুক্তিতে সংগ্রথিত করে দেখিয়েছেন প্রত্যেকটিই কোন না কোনভাবে অন্তর্বিরোধিতায় দুষ্ট। এইভাবে নাগার্জুন কার্যকারণ বিধি নস্যাৎ করে যে সৃষ্টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, এই জগতের উদ্ভব কখনোই হয় নি। যার কোনরূপ অস্তিত্বই নেই তার আবার উদ্ভব কি করে হয়। একমাত্র অতীন্দ্রিয় সত্তা, মাধ্যমিক মতে তথতা বা শূন্যতা অদ্বৈতবেদান্ত মতে ব্রহ্মনেরই অস্তিত্ব বর্তমান। অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ রজ্জু-সর্প-ভ্রমজ্ঞানের মত জগতের সকল কিছু প্রকাশিত হয়। প্রমাণ পরীক্ষণ অংশে এই জগতের মিথ্যা প্রতীতি বিশেষভাবে আলোচিত। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নিছক ধারণা মাত্র, কার্যত কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই। ভাববাদীরা এও জানতেন শুধু প্রমাণ বিধ্বংসে সাধারণের বিশ্বাস টলানো যাবে না। কেননা সাধারণের বিশ্বাসে কার্যকারণ তত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। অতএব কার্য-কারণতত্ত্বের দিক থেকেও এই জগৎ যে মিথ্যা, কোন প্রকার অস্তিত্ব নেই তা প্রমাণ করা প্রয়োজন। এইভাবে ভাববাদী সম্প্রদায় কার্যকারণ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে ভাববাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেছেন।

ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় ততোধিক দৃঢ়তায় কার্যকারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রতিপক্ষ যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে। ভাববাদ বিরোধী দর্শনে কার্যকারণ সম্বন্ধে সাধারণত দু প্রকার মতবাদ আছে, সংকার্যবাদ এবং অসংকার্যবাদ। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী কার্যকারণ তত্ত্ব হলো সংকার্য-বাদ। আর ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুযায়ী কার্য-কারণতত্ত্ব হলো অসং কার্যবাদ। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি কি সাংখ্য দর্শন কি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন তাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বস্তুবাদ। অর্থাৎ সকল কিছুর আদি কারণ বস্তুই। ফলে উভয় কার্য-কারণতত্ত্বই বাস্তব পর্যালোচনা থেকেই শুরু হয়েছে। সংকার্যবাদ অনুযায়ী সৎ কার্য কারণে নিহিত। সৎ কথার অর্থ হলো বর্তমান থাকা অর্থাৎ অস্তিত্বশীল, কার্য হলো ফলাফল যা পূর্বে কারণে নিহিত ছিল। সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী কারণের মধ্যে কার্য বিদ্যমান। যেমন সরিষার তেল কার্য। সরিষার থেকে তেল এসেছে। তেল পূর্বে কোথায় ছিল? সাংখ্য মতে তেল সরিষার মধ্যেই বর্তমান ছিল। সরিষাই কারণ, সেই কারণ থেকেই কার্য নির্গত হয়েছে। কারণের মধ্যে কার্য গুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে কার্যে প্রকাশিত হয়। একেই বলে সংকার্যবাদ।

সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু থেকে বাস্তব বিশ্লেষণ করতে করতে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে জগতটাই একটি কার্য। এখন প্রশ্ন, জগৎ যদি কার্য হয়, আদি কারণ কি? সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ হলো প্রধান বা প্রকৃতি। জাগতিক সকল বস্তুর অব্যক্ত অবস্থাই হলো প্রধান। প্রকৃতি। প্রতিটি বস্তুই যা কার্য সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত ও অপ্রকট থাকে। পরে কার্যে ব্যক্ত হয়। অতএব সাংখ্য কার্য-কারণতত্ত্ব অনুযায়ী কোথাও কোন প্রকার শূন্যতা নেই। এক বিদ্যমান বস্তু থেকে আর এক বিদ্যম্যান বস্তু উৎপন্ন হয়। শূন্য থেকে কোন জিনিসেরই উদ্ভব হয় না। অবস্তু থেকে বস্তুর সিদ্ধি সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যেক জিনিসেরই পূর্বাবস্থা বর্তমান। এই পূর্বাবস্থাই কারণ। এইভাবে কার্যও কারণের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বর্তমান, কোথাও কোনপ্রকার শূন্যতা নেই।

অপরপক্ষে অসৎ কার্যবাদ অনুযায়ী কার্য কখনোই কারণে নিহিত থাকে না। প্রতিটি কার্যই অসৎ। পূর্বে কারণে নিহিত ছিল না। কার্যমাত্রেই নতুন সূচনা বা আরম্ভ। তাই অ-সৎ কথার অর্থ অবিদ্যমান। কার্য তার

উৎপত্তির পূর্বে কারণে অবিদ্যমান অর্থাৎ অনুপস্থিত ছিল। তবে কারণ থেকেই যে কার্যের উৎপত্তি হয় একথা সত্য। কিন্তু কারণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যও বর্তমান থাকে একথা ঠিক নয়। কারণ, কার্য যদি কারণেই নিহিত তা নতুন করে উৎপন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কুঁড়ি ও ফুল কখনোই এক জিনিস নয়। একই সঙ্গে থাকে না পর পর আসে অর্থাৎ কারণ ও কার্যের মধ্যে পরম্পর্য বর্তমান। এরই নাম অসৎ কার্যবাদ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনও অনুরূপ ভাবে বস্তু জগতের বাস্তব বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কার্য-কারণ তত্ত্ব অসৎকার্য বাদ গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি বস্তুর বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে এসেছেন এই বস্তু জগতের আদি কারণ কিন্তু বস্তুই। অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জই, সমষ্টিই হলো এই জগৎ। পরমাণু সমূহের ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলেই এই বিশ্বজগৎ উদ্ভূত। সৃষ্টি ধ্বংস হলো একটা ধারাবাহিক পরিবর্তন চক্র।

আমরা দেখলাম উভয় দর্শন সম্প্রদায়ই কার্যকারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যায় আদি কারণ হিসেবে বস্তুকেই চিহ্নিত করেছেন[২৭]। অথচ দুটি সম্প্রদায়ই ভিন্ন কার্য-কারণতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি মতবাদ। আসলে দুটি সম্প্রদায়ই অভিন্ন জায়গা থেকে অর্থাৎ বাস্তব জগৎ থেকেই তাদের নিরীক্ষণ শুরু করলেও দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীই কার্য-কারণ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মত পোষণ করতে সাহায্য করেছে। অথচ দুটি কার্য-কারণতত্ত্ব বাস্তবানুগ, একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু পারস্পরিক অনৈক্য বিরুদ্ধবাদীদের ধাঁধা সৃষ্টিতে প্রভূত সাহায্য করেছে। পরবর্তী আলোচনায় তা প্রমাণিত হবে।

এখন এই দুটি কার্যকারণ তত্ত্বের সম্পর্কে একটু বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী কার্যের প্রকৃতি কারণের প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব থেকেই নিহিত। কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হওয়ার অর্থ কারণের কার্য হিসেবে রূপান্তর। যেমন বিশেষ ধরণের বীজই কেবল বিশেষ ধরণের বৃক্ষ জন্ম দিতে সক্ষম। সালি ধানের বীজ কেবল সালি ধানের গাছই জন্ম দিতে পারে, আর ব্রীহি ধানের বীজ ব্রীহি ধানের গাছের। কিন্তু সালি বীজ কখনোই ব্রীহি ধান বা ব্রীহি বীজ কখনোই সালিধান উৎপন্ন করতে পারে

না। এখান থেকে এটাই প্রমাণিত যে কার্য কারণের মধ্যেই নিহিত। এই কার্য-কারণ তত্ত্বই সাংখ্য দার্শনিকদের অনুপ্রাণিত করেছে বস্তুই জগতের আদি কারণ হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। জ্ঞাত মাত্রেই যা মূলতঃ বস্তু-সর্বস্ব অবশ্যই কোন না কোনভাবে বস্তু থেকেই উৎপন্ন হতে পারে। তাই সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী অব্যক্ত বস্তু সাংখ্য দর্শনের পরিভাষায় 'প্রধান' বা 'প্রকৃতিই' সকল সৃষ্টির উৎস।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় আদি কারণ হিসেবে বস্তুর কথা বললেও কিন্তু তাঁরা একই পরিভাষায় সেই বস্তুকে চিহ্নিত করেন নি। তাঁদের মতে অদৃশ্য পরমাণুই এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টি করেছে যা সম্পূর্ণতঃই পরমাণু থেকে ভিন্ন। জগৎ সম্পর্কে এবম্বিধ ধারণাই ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়কে অসৎ কার্যবাদ গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। তাই কার্য হলো আরম্ভ, কখনোই কারণের পুনরাবৃত্তি নয়। কার্য কারণ থেকে পৃথক একটি নতুন ঘটনা। কার্যমাত্রেই নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ বলে অসৎ কার্যবাদকে আরম্ভবাদও বলা হয়ে থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় উদাহরণ হিসেবে বলেন একই বস্তু বিভিন্ন বস্তুকে সৃষ্টি করে তার প্রমাণ হলো মৃত্তিকা। একই মৃত্তিকা থেকে বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র প্রস্তুত হয়। অতএব সকল কিছুর উৎস সেই পরমাণুই।

সৎকার্য ও অসৎ কার্যবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দুটি সম্প্রদায়ের কার্য-কারণ তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত হলেও সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ই কোন না কোনভাবে ভাববাদ বিরোধিতায় এই দুই কার্যকারণ তত্ত্বকেই গ্রহণ করেছেন।[২৪] বস্তুকে চিহ্নিত করেছেন আদি কারণ হিসেবে। অথচ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে স্বমত প্রতিষ্ঠায় পরস্পর বিরোধী যুক্তির অবতারণা করেছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস নানান আঁকা বাঁকা পথে এগিয়েছে। ফলে সম্প্রদায়গুলিকে সেই নিরিখেই বিচার করতে হবে।

কিন্তু তা হলে কি হবে ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় তো আর নিশ্চেষ্ট থাকবে না। ফলে ভাববাদী দার্শনিকগণ সেই পরস্পর বিরোধী যুক্তিকে মূলধন করেই কার্যকারণ তত্ত্ব খণ্ডনের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। নাগার্জুনই ভাববাদী দর্শনের ইতিহাসে পুরোধা যিনি কার্যকারণ তত্ত্ব খণ্ডনে এই

পরস্পর বিরোধী যুক্তিকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে মূলধন করে কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। শঙ্করাচার্য সেই পথকে প্রশস্ত করেছেন তাঁর শারীরকভাষ্যে। শঙ্করাচার্য সাংখ্য দার্শনিকদের ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের সাংখ্যের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নাগার্জুন ও শঙ্কর কিভাবে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করেছেন আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অন্যত্র, ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় কি নিজেরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন না করে কোন সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে পারতো না। অবশ্য অত্যন্ত সুপ্ত আকারে হলেও এই প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসেই রয়েছে। বৌদ্ধ-দর্শনই এই কাজ সফলভাবে গ্রহণ করেছিল কিন্তু কালের নিয়মেই পরিপূর্ণভাবে প্রচেষ্টাটি রূপায়িত হতে পারেনি। স্বয়ং বুদ্ধদেবই তাঁর প্রচারিত বাণীতে এই কার্যকারণতত্ত্বের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পরস্পর বিরোধী এই কার্য কারণতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করে তৃতীয় স্তরের উল্লেখ করেছিলেন। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব পদ্ধতির কথা তুলে ধরেছেন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধ-দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব। বুদ্ধদেব প্রতীত্যসমুৎপাদকে ধর্ম বা ধম্ম বলে উল্লেখ করেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী যে কোন ধর্মের উৎপত্তিই কারণ নির্ভর। ধর্ম কথাটির অর্থ এখানে পদার্থ, দ্রব্য, বস্তু, কার্য ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। ফলে ধর্মের বিশিষ্ট অর্থ যা আজ সর্বাধিক প্রচারিত সেই অর্থ গ্রহণ করলে ভুল করা হবে।

এই প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়মই কার্য-কারণ শৃঙ্খল। জগতের কোন ঘটনাই, সে কি বাহ্য কি আন্তর, কারণ ছাড়া ঘটেনা। প্রতিটি ঘটনাই তার উৎপত্তির জন্য তার পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভরশীল। আর ঘটনাটির যখন উৎপত্তি হয় তখন তার পূর্ববর্তী ঘটনাটি আর থাকে না। আসলে সৃষ্টি-লয় একই সঙ্গে চলে। অন্তর্লীন স্ববিরোধই এই সৃষ্টির কারণ। এরই নাম দ্বন্দ্ব। বুদ্ধদেবের মতে 'ভব' মানে 'হওয়া'। ভব হলো পরস্পর দুটি দ্বন্দ্বের সমন্বয় মাত্র। পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, 'ইহা হয়', 'ইহা নয়'। বুদ্ধদেব এইভাবে সামান্য ও ক্ষণিকবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন। অধ্যাপক হিরিয়ানা তাঁর[২০] গ্রন্থে বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথা

সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যা আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও পরিগণিত।

বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুযায়ীই অর্থাৎ হয়ও নয় এই দ্বান্দ্বিক নিয়মেই বৈচিত্রময় জগৎ বিকশিত হচ্ছে। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই বুদ্ধদেব উপনিষদীয় ভাববাদ অর্থাৎ চিরন্তণ আত্মা বা সনাতন আত্মার তত্ত্বের ঘোর বিরোধিতা শুরু করেন। বিরোধিতা শুধু দর্শনে নয়, ব্যবহারিক জগতে শূদ্র সমাজের অভ্যুত্থানে বুদ্ধদেব পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতার কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সার কথা হলো জীবন ও দর্শন অভিন্ন।

বৌদ্ধ দর্শনে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সেই সুপ্রাচীন কালে গৃহীত হলে ও নানা বাঁক বিপাকে এক সময় হারিয়ে যায়। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই এই ঘটনার শুরু। তারপর তা সুপ্রকট হয় শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায়। বুদ্ধদেবের নিজের উপলব্ধিতেই এই স্খলন ধরা পড়েছিল। কিন্তু যত ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক না কেন, ভাববাদ বিরোধিতার ইতিহাসে এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ঐতিহাসিক মূল্য কখনোই হারিয়ে যায় নি।

পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের মত নাগার্জুন সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ভাববাদী পরিমণ্ডলে জারক রসে জারিয়ে বস্তুবাদ বিরোধিতার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে এতটুকু পরান্মুখ হন নি। আধুনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[৪০] মনোজ্ঞ আলোচনায় দেখিয়েছেন এই পরস্পর বিরোধী কার্য কারণ তত্ত্বের সমন্বয়ই তৃতীয় স্তর হিসেবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার পক্ষে বলিষ্ঠ মতবাদ হিসেবে পরিগনিত হতে পারে। অথচ নাগার্জুন এই দু প্রকার বিরোধের সমন্বয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন অর্থাৎ অবাস্তব বলে বাতিল করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে কার্য কারণের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে বিরুদ্ধবাদীকে নস্যাৎ করে, যেমন ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শন পরস্পরের ক্ষেত্রে ঘটেছে, কিন্তু যদি এই দুই পরস্পর বিরোধী তত্ত্বকে সংহত করা হয় তাহলে কার্য-কারণ তত্ত্বের প্রকৃতি উপলব্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। আবির্ভাব বা উদ্ভব হলো দুই পরস্পর বিরোধের সমন্বয়ের ফল। এই পরস্পর বিরোধ যথাক্রমে হয় ও নয়।

কার্য উৎপত্তির পূর্বে যেমন কারণে নিহিত ছিল, তেমনই আবার সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় নিহিত নেই ও। এক কথায় কার্য একই সঙ্গে যেমন কারণে নিহিত শক্তি, তেমনই আরম্ভ ও।

আমরা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করলেই বৌদ্ধ কার্য কারণতত্ত্বের দ্বন্দ্ব পদ্ধতি অনুধাবন করতে পারব। প্রতীত্যসমুৎপাদ কথাটির মধ্যেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অন্তর্নিহিত। সমুৎপাদ কথাটির অর্থ উদ্ভব। আর প্রতীত্য কথাটির অর্থ 'পাওয়া' অর্থাৎ কোন কিছুর সৃষ্টি কোন কিছুকে ভিত্তি করেই। আপনাআপনি কোন কিছুই ঘটে না যা কিছু ঘটে পূর্ববর্তী কারণের জন্যই ঘটে। অতএব প্রতীত্যসমুৎপাদ কথাটির অর্থ প্রাপ্ত কারণ থেকেই কার্যের উৎপত্তি। অতএব প্রতীত্যসমুৎপাদ পরিষ্কার ভাবে দুটি সত্তার সমন্বয়কে সূচিত করছে। প্রতিটি সৃষ্টির মূলে দুই সত্তার অস্তিত্ব বর্তমান—একটি সদর্থক ও একটি নঙর্থক। সদর্থক ও নঙর্থক, এই দুয়ের দ্বন্দ্বের ফলেই বিকশিত হচ্ছে সমগ্র জগৎ। ফলে বৌদ্ধ কার্য-কারণতত্ত্ব একটি প্রবাহের পরিণতি। এই প্রবাহ যথাক্রমে হয় ও নয়ের প্রবাহ। বুদ্ধদেবকে আদি ও 'অন্ত' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে নীরব থাকতেন। তবে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলতেন, কোন কিছুর উৎপত্তি ও পরবর্তীকালে তার বিনাশ বা অভাবকেই সাধারণ-ভাবে আদি ও অন্ত বোঝাতেন। এইভাবে দ্বৈত সত্তার ব্যাখ্যায় যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে তাকে সমুদায় ও নিরোধ এই পরিভাষায় ব্যক্ত করেন। সমুদায় হলো বিভিন্ন সর্তের সমন্বয়। আর নিরোধ হলো সেই সমন্বয়ের নিবৃত্তি।

এইভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অনুসারে সে জড়ই হোক আর চেতনই হোক জগতের সকল কিছুই কোন না কিছু থেকে উদ্ভূত হয়। কোন বস্তুই শর্তহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটি ঘটনাই পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভরশীল বলে কোন ঘটনাই স্বয়ম্ভূ নয়। এইভাবে বৌদ্ধদর্শন সাংখ্য সৎকার্যবাদকেই সমর্থন করেছে। আবার তেমনি বৌদ্ধদর্শন যখন বলে কোন বস্তুই কোন কার্য উৎপাদন না করে ধ্বংস হয় না তখন ন্যায়-বৈশেষিক আরম্ভবাদকেই স্বীকার করে। এই কার্যকারণতত্ত্ব যেমন সর্বব্যাপী, পরস্পরের থেকে উদ্ভূত, তেমনি স্বতঃস্ফূর্তও। এখানে কার্যকে আরম্ভ হিসেবেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ অসৎকার্যবাদ স্বীকৃত।

কিন্তু নাগার্জুন এখানে প্রশ্ন তুলেছেন সৎ পদার্থমাত্রই যদি ক্ষণিক হয় তবে অসৎকার্যবাদ স্বীকারে দোষ ঘটে। দুটি ভিন্ন ক্ষণে পদার্থের কখনোই কোন ভাবে কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। এখানেই নাগার্জুনের ত্রুটি। দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেই বিষয়টির মূল প্রতিপাদ্যকে গুলিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। সৎ ও অসৎ দ্বন্দ্বে সকল সময়ের জন্য প্রবাহের আকারে সত্তার পরিপূর্ন বিনাশ কখনো ঘটে না। বুদ্ধদেব এখানে একটি সুন্দর উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। আমরা যখন বলি বীজ থেকে অংকুর উৎপন্ন হয় এর প্রকৃত অর্থ হলো, জল, তাপ ইত্যাদির দ্বারা বীজের বিনাশ সাধনের মধ্য দিয়েই অংকুরের উৎপত্তি বীজের অন্তিম ক্ষণই অঙ্কুরের প্রথম ক্ষণ। এ থেকে কি কোন ভাবে প্রমাণিত হয় দুটি ভিন্ন ক্ষণের কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। বরং বৌদ্ধ কার্য-কারণ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কিছুই একা একা সৃষ্টি হয় না, সমন্বয়েই সকল কিছুর সৃষ্টি। **ন কিঞ্চিৎ, একম্ একস্মাৎ, নাপে একস্মাদ অনেকম**। আরও স্পষ্ট করে বললে বোঝায় একক থেকে নয় সমগ্র থেকে সকল সৃষ্টি—**ন কিঞ্চিৎ একম একস্মাৎ সমগ্রাঃ সর্ব সম্পতে ;** আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মধ্যেই নাগার্জুনের যুক্তির খণ্ডন নিহিত আছে। যেমন প্রতিটি ঘটনার উৎপত্তিই পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভরশীল। একথার অর্থ কি এই যে দুটি ভিন্ন ক্ষণের পদার্থ পরিপূর্ণভাবে সম্পর্করহিত। তাছাড়া বুদ্ধদেবের স্পষ্ট উক্তিই তো বর্তমান কোন কার্য উৎপাদন না করে কারণ ধ্বংস হয় না। ঠিক এই কারণে বুদ্ধদেব ক্ষণিক উপাদানের স্কন্ধ বা সমাহারকেই আত্মা বলেছেন। আর এই স্কন্ধের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন অসৎ বলে। মাধ্যমিক পণ্ডিত নিজেই স্বীকার করেছেন যে স্কন্ধই যদি আত্মা হয় তাহলে আত্মা উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। আর যদি উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ বিশিষ্ট হয় তো নাগার্জুনের যুক্তি অসারতা প্রতিপাদিত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে আত্মার কথা আসে কী করে? উত্তরে বলা যায় যে চেতন ও জড় উভয়েরই উৎপত্তি যে বস্তু থেকে তা বুদ্ধদেব প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বেই ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধদেব ক্ষণিকতাবাদকে একটি প্রবাহ রূপে চিহ্নিত করেছেন। তার মানে কি এই যে সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্য দিয়ে সকল কিছুই শেষ হয়ে যায়। প্রবাহ ও প্রক্রিয়াই প্রমাণ কার্য ও

কারণ উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। তাহলে বাস্তব অস্তিত্ব মাত্রই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অনুযায়ী কার্য। অস্তিত্ব মাত্রই কেবল পুনরাবৃত্তি নয়, সদাসর্বদাই অর্থ ক্রিয়াকারী—**সত্তৈব ব্যাপৃতিঃ। অর্থক্রিয়া কারিত্বম্।** চেতন ও এইভাবে সৃষ্ট। এই ভাবে বৌদ্ধদর্শনের কার্য কারণ তত্ত্বের মূল, অধিক ব্যবহৃত বক্তব্য হলো—যা ভূতিঃ সৈব ক্রিয়া। ভূতপদার্থ মাত্রই ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি। দ্বান্দ্বিক নিয়মের অনিবার্য ফলশ্রুতি। ফলে কার্য-কারণতত্ত্ব যেমন সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী কেবল সৎকার্যবাদ নয় তেমনই কেবল অসৎকার্যবাদ ও নয়। উভয়ের সমন্বয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে এই জড় চেতন জগতের বিকাশ সংঘটিত হয়। এখান থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সাংখ্য-কার কপিল যেমন প্রধান বা অব্যক্ত বস্তুপুঞ্জকেই আদি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঠিক অনুরূপ ভাবে, যদিও প্রকাশ্যে সাংখ্য দর্শনের মত করে না বললে ও বুদ্ধদেব বস্তুপুঞ্জকেই যে আদি উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এ ব্যাপারে কোন রূপ সংশয় নেই। বুদ্ধদেব আদি ও অন্ত সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা ঠিক নয় মনে করেছেন। কেন না বিষয়টি গবেষণার। যা চর্চার স্তরে, তার সম্পর্কে চূড়ান্ত করে বলা কখনোই যুক্তি সংগত নয়। তবে বুদ্ধদেব যে সাংখ্য দ্বন্দ্বতত্ত্বকেই নতুন অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন এ ব্যাপারে আধুনিক চিন্তাবিদদের সমর্থন পাওয়া যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে চেরবাটস্কি ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে পারি।

এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় উপনিষদীয় ভাববাদের অপরিবর্তনীয় সনাতন আত্মার তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের পরস্পরের অনৈক্যকে কাজে লাগিয়ে নাগার্জুনের ঐকান্তিক প্রয়াস দার্শনিক ভাববাদ প্রতিষ্ঠা। এতখানি সম্ভব হত না যদি ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় কোনভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেত। এর পেছনে যে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের বৈরীতা ছিল তা বহুবার বহুভাবে আলোচনা করেছি। যেহেতু ভাববাদ বিরোধিতার সুষম বিকাশ রুদ্ধ হয়েছিল তাই ভাববাদ বিরোধীদের পক্ষে দার্শনিক ভাববাদকে পুরোপুরি খণ্ডন করা সম্ভব হয় নি। এক কথায় বাস্তব অবস্থাই ছিল এর পরিপন্থী। কিন্তু ভাববাদ খণ্ডনে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় ও দার্শনিকদের গুরুত্ব ছোট করে দেখলে ও ঠিক হবে না। এমন কি একথা ও বলা যায় একমাত্র ভারতীয় দর্শনেই বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ

পাশ্চাত্য দর্শনের বহু পূর্বেই ঘটেছে। কিন্তু প্রচার ও প্রসারের অভাবে আজ ও ভারতীয় দর্শন তার প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। আধুনিক বস্তুবাদ কোনভাবেই ভারতীয় দর্শনের এই বস্তুনিষ্ঠ অবদান অস্বীকার করতে পারে না।

পদার্থ প্রতিষ্ঠা

ভাববাদী দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বাহ্য জগৎ মিথ্যা ও অসৎ প্রমাণ করা। আর তাঁরা তা প্রমাণ করেছেন পদার্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। পদার্থ কথার অর্থ, পদস্য অর্থঃ, পদের অর্থ। এক কথায় পদের দ্বারা প্রকাশিত বস্তুই পদার্থ। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় পদ যার প্রতীক তাই পদার্থ। তাই ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায় পদার্থ নস্যাৎ কল্পে 'অর্থস্য পরীক্ষণাৎ, প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পদের অর্থ পরীক্ষণ করতে করতে কোথায় গিয়ে থামা যায়। ভাববাদী সম্প্রদায় পদের অর্থ পরীক্ষণ করতে করতে শূন্যে গিয়ে পেঁাচেছেন, যেখানে কোন প্রকার উপলব্ধি নেই। সর্ব শূন্য। এই যে অনুপলব্ধি তাই প্রমাণ করে পদার্থ বলতে আসলে কিছুই নেই, মিথ্যা অসৎ। অথচ আমাদের প্রতীত হয় যে পদার্থ বর্তমান। এই মিথ্যা প্রতীতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রসূত। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা যে কোন প্রকার পদার্থ হিসেবে বস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। বস্ত্রকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তো দেখা যায় বস্ত্রের অস্তিত্ব কোথাও নেই। বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। বস্ত্র তাহলে কি, তন্তু সমষ্টি। অতিরিক্ত বস্ত্র হিসেবে কোন কিছু নেই। এবার তন্তুর বিচার করা যাক। তন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তুলোর ছোট ছোট অংশ, অংশু মাত্র। তন্তু বলে অতিরিক্ত কোন কিছু নেই। এর পর অংশুকে বিচার করলে দেখা যাবে অংশু ও নেই। সবই শূন্য। অতএব কোন পদার্থেরই স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা, অসৎ। এইভাবে ভাববাদী সম্প্রদায় সমস্ত বস্তু জগৎকেই নস্যাৎ করেছেন। প্রথমে প্রমাণ খণ্ডন ও পরে প্রমেয় খণ্ডনের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছেন।

কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি ভাববাদী প্রমাণ খণ্ডন

স্ববিরোধিতা পূর্ণ দৃষ্টান্তদোষে দুষ্ট। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় পূর্বক প্রমাণ করেছেন যে প্রমাণের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্বেরই জ্ঞান হয়। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব। সকল কিছুই শূন্য, এ দাবী কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। এমন কি কার্যকারণ তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণিত শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হয় না, অবস্তু থেকে কখনো বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। কার্য তার উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্ত অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, অথচ প্রকাশিত কার্যের যে স্বরূপ সেই রূপে কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই নিহিত ছিল না। কার্য কারণের থেকে নতুন আঙ্গিক ও নতুন অবয়বে আবির্ভূত হয়। কার্য-কারণ আসলে দ্বন্দ্বের সুষম প্রকাশ। এইভাবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ভাববাদী কার্য-কারণ তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা তুলে ধরে বস্তুবাদী কার্যকারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার কেবল অর্থস্য পরীক্ষণাৎ অর্থাৎ পদার্থ পরীক্ষণ অংশই বাকী। আমরা এবার ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় কর্তৃক পদার্থ প্রতিষ্ঠার যুক্তিগুলি আলোচনা করব।

পদার্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাববাদী সম্প্রদায় পদার্থ সম্পর্কিত মূল তিনটি ভাববাদ বিরোধী তত্ত্বের খণ্ডন করেছেন। এই তিনটি তত্ত্ব যথাক্রমে, ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ। ভূতবাদ. প্রধানবাদ এবং পরমাণুবাদ অনুযায়ী ভূত পদার্থই এই জগৎ বৈচিত্র্যের আদিকারণ। পঞ্চ মহাভূত মহা সংঘাতের মাধ্যমে এই জগৎ রূপে প্রকাশিত। ভূতবাদ ও প্রধানবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছিল। তাই পরবর্তী ভাববাদী সম্প্রদায় ভূতবাদ ও প্রধানবাদকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নি যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন পরমাণুবাদ খণ্ডনে। ভাববাদের ক্রমবিকাশের পর্যায়ে যখন দিগ্‌নাগকে 'আলম্বন .পরীক্ষা' গ্রন্থ লিখতে দেখি তখন ভাববাদ বিরোধী কুমারিলকে লিখতে দেখি 'নিরালম্বনবাদ'। এইভাবে ভাববাদ ও ভাববাদ বিরোধিতা পদার্থ প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব চরম মতাদর্শের সংঘাতের রূপ গ্রহণ করে। আমরা ভাববাদী যুক্তি পদ্ধতি পূর্বেই দেখেছি। এখন আমরা পদার্থ প্রতিষ্ঠার যুক্তি পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা করব।

ভাববাদী সম্প্রদায়ের পদার্থ নস্যাৎ অংশকে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি মূল যুক্তি পাই। প্রথমতঃ ভাববাদী সম্প্রদায়ের মতে সাধারণের বিশ্বাসের বাহ্যবস্তু বলতে কিছুই থাকে না। সীমাহীনভাবে

বিভাজন পর্ব চলতেই থাকে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্রের অংশের পর অংশে বিভাজন পর্বের শেষে যদি কোথাও থামতে হয় তো সেই স্থান হলো অসীম শূন্যতা। অর্থাৎ বস্তু বলতে কোন কিছুই নেই। বস্তুর বিভাজন পর্বে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত, তা হলো অংশ ভিন্ন বস্তুর অংশের অতিরিক্ত কোন সত্তা নেই। আবার অংশের ও কোন প্রকার সত্তা নেই, অসীম শূন্যতাই একমাত্র স্থান যা বস্তুর অনস্তিত্বকেই সূচিত করে।

ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় এই মূল দুটি যুক্তিকে দৃষ্টান্ত করে তাঁদের পদার্থ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেন। মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষের এই বক্তব্যকে অযৌক্তিক প্রমাণ করেছেন। কারণ যুক্তি দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ বা স্ববিরোধী। তাঁর মতে বস্তুর যদি কোন প্রকার অস্তিত্বই না থাকে তো তার বিভাজন কি করে সম্ভব হয়। যেমন ধরা যাক ভাববাদী দৃষ্টান্ত বস্ত্রের উদাহরণ। ভাববাদী সম্প্রদায় বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে দেখিয়েছেন যে বস্ত্রের বিভাজনে বস্ত্রের অস্তিত্ব নেই। কি করে প্রমাণ করলেন, না বস্ত্র আসলে সূত্রের সমন্বয়। অর্থাৎ ভাববাদী সম্প্রদায় এখানে সূত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন। আবার পরমুহূর্তেই বলছেন সূত্রের বিভাজনে সূত্রের কোন অস্তিত্ব নেই, সূত্র আসলে অংশুর সমন্বয়। তবে কি অংশুর অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না? পরমুহূর্তে অংশুকেই পুনরায় অস্বীকার করছেন। যে বস্তুটিকে ভাববাদী সম্প্রদায় যে মুহূর্তে স্বীকার করছেন পর মুহূর্তেই অস্বীকার করছেন তা কি পরস্পর বিরুদ্ধ নয়? ভাববাদী সম্প্রদায়ের প্রবক্তাগণ সূত্র দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁদের লজ্জা নিবারণ করেন না, তার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেন। এর থেকে উপলব্ধি হয় যে 'সুতো' দিয়ে শরীর আবরণ হয় না, বস্ত্র দিয়েই হয়। তাহলে তো বস্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি নিশ্চয়ই হয়। আর যার স্বরূপেরই উপলব্ধি হয় না তার আবার বুদ্ধি দিয়ে বা যুক্তি বিচার কি করে সম্ভব হয়। যেমন 'শশশৃঙ্গ' বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকুসুম এসবের স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব নয় কেননা সম্পূর্ণ অলীক তাই এসবে যুক্তি বিচারও অসম্ভব। কিন্তু বস্ত্রের ক্ষেত্রে তো তা নয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ বস্ত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করেই শরীর আবরণ করে থাকেন। অতএব পদার্থের বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার না করে ভাববাদী সম্প্রদায়ের কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয়ত বস্তু বিভাজন পর্বে অন্তহীন অবস্থা যেমন অপ্রমাণিত তেমনি কোন প্রমাণ নেই সর্বশূন্যতার। বস্ত্রের বিভাজন পর্বে আমরা দেখেছি বস্ত্র থেকে সূত্র, সূত্র থেকে অংশু, অংশু থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপলব্ধ অদৃশ্য অংশ সবেতেই পদার্থের অস্তিত্ব বর্তমান। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য উপলব্ধ অদৃশ্য অংশই হলো পরমাণু। ফলে বস্তুর বিভাজনে অন্তহীন অবস্থা আসে কি করে? তেমনি সর্ব শূন্যতাই বা কিভাবে প্রমাণিত হয়? অতএব অন্তহীন বিভাজন যুক্তিটি অযৌক্তিক। তেমনই অযৌক্তিক সর্বশূন্যতার দৃষ্টান্ত। মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষের যুক্তির অসারত্ব প্রমাণ করতে বলেছেন[31] **ব্যহতত্বাদহেতুঃ** স্ববিরোধিতা সর্ব্বস্ব বলেই হেতু অহেতু। এমন কি ভাববাদী প্রশ্ন বস্ত্র যদি বস্তুই হয় তন্তু অতিরিক্ত বস্ত্রের স্বতন্ত্র জ্ঞান হয় না কেন, তার উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলেছেন, বস্তুর পৃথক জ্ঞান হবে কি করে, কেননা বস্তুটি তো তা উপাদান কারণে আশ্রিত হয়ে থাকে। বস্ত্রের দৃষ্টান্তে বস্ত্র কার্য এবং সূত্র হলো আশ্রয়, বস্ত্র হলো আশ্রিত। এই আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধে আছে বলেই সূত্র ছাড়া অন্য কোথাও বস্ত্রের উপলব্ধি হয় না। ভিন্ন উপাদানে কি করে বস্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি সম্ভব। এর থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে বস্ত্রের অস্তিত্ব নেই। মহর্ষি গৌতম বলেছেণ[32] **তদাশ্রয়ত্বাদপৃথগ্ গ্রহণম্**। অতএব বস্তু বিভাজনই প্রমাণ করে বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। সর্ব শূন্যতা অলীক কল্পনা মাত্র।

ভাববাদ বিরোধী প্রায় সকল সম্প্রদায়ই পরমাণুবাদের বক্তব্য কোন না কোনভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মূল বক্তব্য হলো যে কোন বস্তুকে বিভাজন করতে থাকলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে এসে থামতে হয়, যাকে আর কোনভাবে ভাগ করা যায় না। সেই সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু। এই পরমাণু খালি চোখে দৃশ্য নয় ঠিকই, কিন্তু তিন পরমাণুর সমন্বয়ে যে বস্তুকণা তা খালি চোখে দৃশ্য হয়। উদাহরণ হিসেবে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সূর্যরশ্মিতে উড়ন্ত ধূলিকণার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। পড়ন্ত বিকেলে গৃহিণীরা যখন চুল বাঁধে তখন জানলার ফাঁক দিয়ে যে সূর্যরশ্মি পড়ে তাতে যে অসংখ্য বস্তুকণা ঘুরে বেড়ায় তা সকলেরই চোখে না পড়ে পারে না। এই দৃশ্য তিন পরমাণুর সমন্বয়ের নাম ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক। দুই পরমাণুর

সমষ্টির নাম দ্ব্যণুক। অতএব পরমাণুই অবিভাজ্য শেষতম অংশ। এই পরমাণু সমূহের সংযোগেই এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন অদৃশ্য নিরবয়ব পরমাণু কি করে সংযুক্ত হয়? ভাববাদীদের মতে কেবলমাত্র অবয়বের সঙ্গে অবয়বেরই সংযোগ হয় পরমাণু নিরবয়ব। অতএব সংযোগের প্রশ্নই আসেনা। ন্যায়বৈষেশিক সম্প্রদায়ের মতে এই পরমাণু সকল স্বাভাবিক ভাবে নিষ্ক্রিয়। তাহলে পরমাণু সমূহে গতিরই বা সঞ্চার কিভাবে সাধিত হয়। যদি বলা যায় যে গতি হলো পরমাণুর স্বভাব তাহলে তো সৃষ্টির ব্যাপারটাই অন্তহীন হয়ে পড়ে। অনবস্থা দোষে দুষ্ট হয়।

ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় পূর্বপক্ষের এই সব প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন। তবে বাস্তব অবস্থা যা তা হলো ভাববাদ বিরোধী-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কিছুটা দোদুল্যমান। এই দোদুল্যমানতা অনগ্রসর বিজ্ঞান চিন্তার ফলশ্রুতি মাত্র। সেই যুগে দাঁড়িয়ে ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় সম্ভাব্য কারণের কথা বলতে গিয়ে ও শেষ পর্যন্ত সততার সঙ্গে স্বীকার করেছেন এই সংযুক্তির কারণ অদৃশ্য কোন কিছু এখানে অদৃশ্য বলতে যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় বলা হয়েছে। এই দুর্বলতাকে ভাববাদী সম্প্রদায় মূলধন করতে কসুর করেন নি। অদৃশ্য বা অদৃষ্টকে অতীন্দ্রিয় আখ্যা দিয়ে স্বকার্য সাধনে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে এই কৌশল অনাবিষ্কৃত থাকে নি। এই প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে। কেননা ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় পরমাণু সমূহের সংযোগের সদুত্তর দিয়েছেন। ন্যায় বৈশেষিকের সীমাবদ্ধতা থাকলে ও জৈন দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে নি। সত্য যা তা হলো এতদিন এই বিশেষ দিক বিশেষভাবে অনালোচিত ছিল।

ভাববাদী সম্প্রদায়ের মতে বস্তু বিভাজনেই প্রমাণিত বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তার বিভাজন যেমন সম্ভব নয়, যা বিভাজিত হয় তা যে সংযুক্ত ছিল একথা প্রমাণ করার জন্য বাড়তি কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যদি সমন্বয় বা সমষ্টি না হয় তো তাকে ভাগ করা যায় কি করে? তাহলে পরমাণুসকল সংযোগ সম্বন্ধে পদার্থে বর্তমান একথা স্বীকৃত। এখন প্রশ্ন কিভাবে সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্তির প্রশ্নে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় ব্যাখ্যা দিলে ও জৈন সম্প্রদায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে পরমাণুসকল সক্রিয়

ও পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। ন্যায়-বৈশেষিকের প্রসঙ্গ তুলে ভাববাদীদের বক্তব্য যে পরমাণু গতিহীন তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের মতে পরমাণুসকল গতি সম্পন্ন ও পরস্পর আকর্ষণকারী। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যেই ক্রিয়া নিহিত। এই ক্রিয়াকে বৌদ্ধ দর্শনে দ্বন্দ্ব বলা হয়েছে। দ্বন্দ্ব মাত্রই সদর্থক ও নঙর্থকের ক্রিয়া বিক্রিয়া বোঝায়। যা সাংখ্য দর্শনে ও সমানভাবে স্বীকৃত। তবে বৌদ্ধ দর্শনে যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব তাতে শুধু ক্রিয়া এবং বিক্রিয়া স্বীকৃত নয় তৃতীয় অবস্থা হিসেবে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সমন্বয় ও স্বীকৃত। অর্থাৎ বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব আসলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বতত্ত্বকেই সূচিত করেছে। কিন্তু সেই যুগে জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশের অভাবের জন্য আজকের বিজ্ঞান মানস যত নিশ্চিতির সঙ্গে দ্বন্দ্বতত্ত্বের কথা বলেছেন, প্রাচীন ঋষিদের পক্ষে হয়তো তা সম্ভব হয়নি। তাই সৃষ্টির কারণ হিসেবে পরমাণুসমূহের সক্রিয় সংযোগের কথা বলতে গিয়ে অদৃশ্য কোন কিছুকে সূচিত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যা বাস্তব সত্য তাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু অদৃষ্ট বা অদৃশ্য সেইযুগে কোন ভাবেই আধুনিক অর্থ বহন করেনি। পরবর্তী সমাজের ধারক বাহক সম্প্রদায়ই এই কদর্থ প্রচলিত করেছেন স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ মানসে। ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের সততার মূল্য ভাববাদী সম্প্রদায় দেন নি।

কি ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমানুবাদ সকল ভাববাদ বিরোধী তত্ত্বই একটি বিষয়কে মুখ্য করেছে তা হলো পদার্থ প্রতিষ্ঠা। আর এক্ষেত্রে ভাববাদী সম্প্রদায়ের কূট যুক্তিজালকে অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে খণ্ডন করেছে। সত্যের কি নিদারুণ পরিহাস যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যা সফল ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সকল সময় প্রমাণিত তাকেই অস্তিত্বশীল প্রমাণ করানোর জন্য কত অবিরাম প্রচেষ্টা করতে হয়। ছদ্ম শিষ্যদের কৃতীত্ব এ বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই। যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে দেখা যায় ক্রিয়া বা গতির গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে, সেই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে ঈশ্বরাধীন করতে ছদ্মশিষ্যদের এতটুকু কুণ্ঠা নেই। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করেছেন যে গতি বিশ্বের মূল তত্ত্ব। এই গতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কণাদ বলেছেন গতি হলো এমন যা দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে যা কোন গুণ নয় আর যা সংযোগ ও বিভাগের প্রত্যক্ষ অনপেক্ষ কারণ। গতি পাঁচ

প্রকার যথাক্রমে উৎক্ষেপন, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। কোন বস্তুকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো উৎক্ষেপণ। আর নীচের দিকে নিক্ষেপ করাকে অবক্ষেপণ। বস্তুর সংকোচ সাধন হলো আকুঞ্চন এবং আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া হলো প্রসারণ। এ সব বাদে যে কোন-ভাবেই হোক বস্তুর স্থান পরিবর্তনকে বলা হয় গমন। যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন বলে গতি দ্রব্যকে আশ্রয় করে সেই দর্শনই বা কি করে পরমাণুকে গতিহীন, নিষ্ক্রিয় বলে। আসলে এ হলো বিরুদ্ধ পন্থীদের আরোপিত অর্থ। পরন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন নিষ্ঠার সঙ্গে তৎকালীন অগ্রগামী চিন্তার পথিকৃৎ হিসেবে বস্তুজগতকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। আর যা সাধ্যে সম্ভব হয়নি তাকে অদৃশ্য বা অদৃষ্ট বলেই ব্যক্ত করেছিলেন। যেমনটি ঘটেছে অন্যান্য ভাববাদী বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। যাকে ভাববাদী সম্প্রদায় বিকৃতভাবে কাজে লাগিয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা জৈন, বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শনের ক্ষেত্রে অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে দেখা যায়। কারণ পরমাণু সমূহকে গতিশীল ও সক্রিয় বলে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। ফলে পরমাণু সংযোগের অনেকখানি উত্তর এখানেই পাওয়া যায়। তবে পরিপূর্ণ তত্ত্বের আকারে সমকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র বৌদ্ধ দর্শন থেকেই পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনই কেবল দ্বন্দ্বতত্ত্বের সঠিক রূপায়ণ করেছে। যা আধুনিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের পথ প্রদর্শক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। অব্যক্ত+ব্যক্ত ও ব্যক্তাব্যক্ত আধুনিক দ্বন্দ্বতত্ত্বের থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথেসিসকেই সূচিত করছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ। বৈচিত্র্যময় বাহ্যবস্তু বাস্তব সম্পন্ন ও অর্থক্রিয়াকারী। অর্থাৎ সফল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত। ভাববাদী সম্প্রদায়ের এই পদার্থ নস্যাৎ করার যে প্রচেষ্টা তা ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত প্রসূত ও স্ববিরোধী। তা যে কেবল যৌক্তিক দিক থেকেও প্রমাণিত শুধু নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও সমান-ভাবে প্রমাণিত। ভাববাদী সম্প্রদায়ের জীবনাচরণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে পদার্থজগতকে ভাববাদী সম্প্রদায় মিথ্যা, অসৎ বলে নস্যাৎ করছেন সেই পদার্থ সমূহের সফল ব্যবহারে জীবন নির্ব্বাহ করে থাকেন। ফলে ভাববাদী সম্প্রদায়ের যুক্তি আমদানি নিছক চাতুরী ও ভণ্ডামী। ভাববাদ বিরোধী

সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় যেটুকু অসম্পূর্ণতা সমকালীন চিন্তার সীমাবদ্ধতাই তার মূল কারণ। তবে এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। বিশেষ করে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ব অধিকাংশই প্রচলিত লোকায়ত মত থেকে সংগৃহীত। পুঁথি-পত্রের অপ্রতুলতা, বৈষম্য, অত্যাচার ইত্যাদির ফলে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় নি। আর যা গবেষণা নির্ভর সে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা কখনোই বলা যায় না। তবে এ পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায় ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত সিদ্ধান্তগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপ্রযুক্ত নয়। এ সবই আমাদের বাধ্য করে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সম্পর্কে সীমাবদ্ধতার তকমা (যা এতদিন কোন কোন পণ্ডিত করে এসেছেন) তাকে অবজ্ঞা করতে। কারণ ভাববাদী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কোন অংশেই গৌণ ছিলেন না, চিন্তার সীমাবদ্ধতা তো দূরের কথা। অবশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবশ্যই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হয়। তবে ভাববাদী সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কখনোই নয়। বরং বস্তুবাদের অগ্রগতির পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে গৌরবময় ভূমিকাই পালন করেছেন।

বস্তুবাদের ভিত্তি

ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের যে ইতিহাস পর্যালোচিত হলো তাতে আমরা দেখলাম কেবল মাত্র মহাযান সম্প্রদায় ও অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় ভিন্ন সকল দর্শন সম্প্রদায়ই কোন না কোন ভাবে ভাববাদ বিরোধিতাকে মুখ্য করে বস্তুবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু এতকাল বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার অভাবে ভারতীয় দর্শনের এই বিশেষ দিকটি চোখের আড়ালে ছিল। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই এর জন্য দায়ী। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাশেষে লোভনীয় হাতছানিতে কার্যত মেধা ক্রয় করে এই ব্যাপার সমাধা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব চিরকালই থাকে, যে আপন রক্ত বিন্দু দিয়ে

দীপশিখাকে অম্লান রাখে। যার প্রমাণ ভারতীয় দর্শনের এই নব পর্যালোচনা।

এতদিন ভারতীয় দর্শন মানেই বলা হত অধ্যাত্মবাদ। একটি আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি থেকেই নাকি ভারতীয় দর্শনের জন্ম। একথা সর্বাংশে সত্য নয়। অত্যন্ত সীমিত অংশের এবম্বিধ প্রচেষ্টা থাকলে ও বৃহত্তম অংশই বস্তু পৃথিবীর স্বরূপ উন্মোচনেই একনিষ্ঠ। এক্ষেত্রে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা কোন সম্প্রদায়ই পিছিয়ে নেই। ফলে বস্তুবাদই ক্রম বিকশিত হয়েছে তাঁদের দর্শনে। তবে যত সহজে বললাম তত সহজে কিন্তু বস্তুবাদের বিকাশ সম্ভব হয় নি। ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ মূলতঃ তিনটি মতবাদের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে, তা হলো যথাক্রমে ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ। ভূতবাদ সমৃদ্ধ হয়েছে চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শনে, সাংখ্য দর্শনে প্রধানবাদ এবং পরমাণুবাদ সমৃদ্ধ হয়েছে ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন ও মীমাংসা দর্শনে। ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ বিরোধীতায় এই তিনটি তত্ত্বই আমরা পাই। এই তিন মতবাদকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার বিশ্লেষণ করি তো ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের স্পষ্ট চেহারা পাব। যদিও একথা মনে রাখা দরকার এই বস্তুবাদকে আমরা কখনোই আধুনিক বস্তুবাদের সঙ্গে এক পর্যায়ে তুল্যমূল্য বিচার করব না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় দর্শনে যখন বস্তুবাদের উন্মেষ ঘটে তখন পৃথিবীর কোথাও তার চিহ্নমাত্র ছিল না। বহু পরে গ্রীক দর্শনে তার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু যেহেতু ভারতীয় দর্শনের সময়ানুগ আলোচনা হয় নি তাই বহির্বিশ্ব ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের অবস্থান সম্পর্কে এতদিন অজ্ঞাত থেকেছে। ফলে কার্ল মার্কস যখন আধুনিক বস্তুবাদের গোড়াপত্তন করেন তখন পাশ্চাত্য দর্শনে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশকে ধারাবাহিক আকারে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের সুযোগ তিনি যদি পেতেন তবে পূর্ববর্তী বস্তুবাদের ক্রম বিকাশ আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে স্থান পেত। কেন না পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যখন যান্ত্রিক বস্তুবাদের পর্যায় তার বহু পূর্বেই ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেখানে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির রেখা চিহ্ন বেশ স্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে যখন বস্তু থেকে চেতনার উন্মেষের

ব্যাপারে কোন প্রকার ইঙ্গিতই চোখে পড়ে না তখন ভারতীয় দর্শনে বস্তু থেকে চেতনার উন্মেষের লৌকিক ব্যাখ্যা উন্নত বিজ্ঞান চেতনার সুস্পষ্ট প্রমানবাহী। আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ও বহু পূর্বে চার্বাক দর্শন চেতনাকে বস্তু সৃষ্ট উপবস্তু রূপে চিহ্নিত করেছে, পান ও গুড়ের লৌকিক উদাহরণ দিয়ে। পাশ্চাত্য দর্শনে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেখা যায় বহু পরে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। এখন আমরা ভারতীয় বস্তুবাদের রূপরেখা চিত্রের আকারে প্রকাশ করতে পারি।
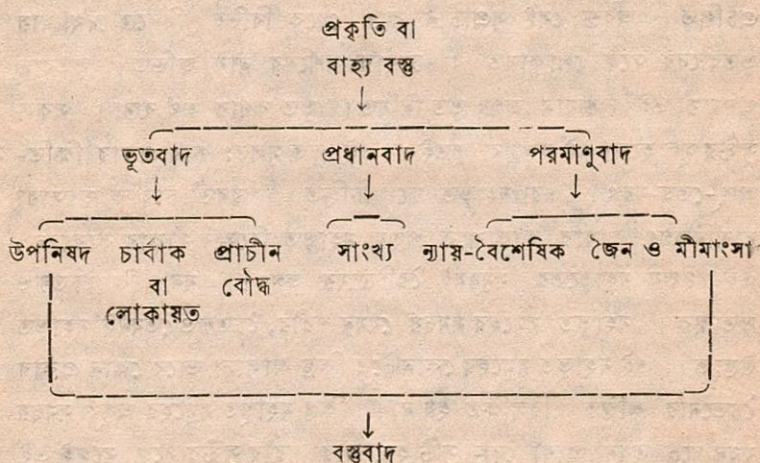
আমরা ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী চিন্তার যে রূপরেখা পেলাম তা ইতিপূর্বে কোন না কোনভাবে আলোচিত হলেও বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনা সম্ভব হয় নি। তবে ভাববাদ বিরোধিতার ইতিহাসে পরমাণুবাদ যতখানি বহুল বিশ্লেষিত ভূতবাদ কিংবা প্রধানবাদের আলোচনা অত্যন্ত সীমিত। সামাজিক অনুশাসনের শেকল পরিয়ে এই চর্চাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এর উদাহরণ আমরা মনুস্মৃতি থেকে ইতিপূর্বেই রেখেছি। তাই আমরা ভাববাদী শিবিরেও দেখি দার্শনিকগণ পরমাণুবাদ খণ্ডনকেই বস্তুবাদ খণ্ডনের একমাত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে। কিন্তু

ভূতবাদ ও প্রধানবাদ অবজ্ঞাত হলেও ভাববাদ বিরোধিতার ইতিহাসে পরমাণুবাদের সঙ্গে একত্রে আজও সমান প্রতিপক্ষ। আমরা একের পর এক তিনটি তত্ত্বই আলোচনা করব।

ভারতীয় দর্শনের কাল নির্ণয় এখনো গবেষণার বিষয়। তবে ভূতবাদ ভাববাদ বিরোধিতার ইতিহাসে যে প্রাচীনতম মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত এ সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। বেদ উপনিষদের যুগ থেকেই আমরা ভূতবাদের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের উন্মেষ দেখতে পাই। কিন্তু কিভাবে কবে কে এই ভূতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রচলিত। অবশ্য সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন পুঁথিপত্রে দেখা যায় ভূতবাদের সঙ্গে লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের নাম জড়িত। ভূতবাদ অনুযায়ী এই দৃশ্যমান জগৎ ভূত নির্মিত। ভূত কথার অর্থ বস্তু। সকল সৃষ্টির মূল হলো এই বস্তু বা ভূতই। এই ভূত মূলতঃ চার প্রকার ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ। এরা মহাভূত রূপে চিহ্নিত। পরবর্তী চার্বাক অনুসারী দার্শনিকগণ আবার আকাশকে পঞ্চম মহাভূত হিসেবে স্বীকার করেছেন। এই পঞ্চম মহাভূতের সমুদয়ই বৈচিত্র্যময় জগৎ। এমন কি চৈতন্যও ভূতাত্মক। মহাভূত সমূহের সমন্বয় যেমন শরীর, চৈতন্যও তেমনই মহাভূত উদ্ভূত। এই মহাভূত সমূহের কোনটিতে কিন্তু আলাদা ভাবে কোন প্রকার চৈতন্যের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মহাভূত সমূহের অপূর্ব সমন্বয় যখন ঘটে তখন প্রাণী দেহ সৃষ্টি হয়, আর শরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই চেতনার আগম ঘটে। চেতনা হলো উদ্ভূত উপবস্তু বা বাড়তি গুণ। ভূতবাদী এই তত্ত্বের উপলব্ধির জন্য লৌকিক উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন যা মূলতই বিজ্ঞানপ্রবণ। ভূতবাদিগণ যে অগ্রসর বিজ্ঞান চিন্তার ধারক ও বাহক ছিলেন এই বস্তু বিশ্লেষণ থেকেই অনুমান করা যায়। তাঁরা চৈতন্য উদ্ভবের ব্যাখ্যা হিসেবে পান ও গুড়ের লৌকিক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পান, সুপারি, চুন কিংবা খয়ের কোনটিই পৃথকভাবে লাল রঙ না হলেও সব কটি যখন এক সঙ্গে চর্বিত হয় তখন লাল রঙের উৎপত্তি হয়। তেমনি গুড় বা অনুরূপ গুণসম্পন্ন বস্তু নিচয়কে এক সঙ্গে গেঁজানো যায় তো তাতে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়। এই লাল রঙ ও মাদকশক্তি পৃথক ভাবে কোন একটিতে বর্তমান না থাকা সত্ত্বেও উৎপন্ন হয়েছে। কোথা থেকে এল

যদি বস্তু নিচয়ে কোনভাবে নিহিত না ছিল। আবার তেমনি যে কোন বস্তু নিচয় থেকেই এই লাল রঙ বা মাদকশক্তি উৎপন্ন হয় না। কেবল মাত্র অনুরূপ গুণসম্পন্ন বস্তু থেকেই উৎপন্ন হয়। এখান থেকে প্রমাণিত চৈতন্যও তেমনই শরীরাগত উপবস্তু।

এইভাবে ভূতবাদ প্রমাণ করল যে মহাভূত সমূহের অপূর্ব সমন্বয়ে যেমন জগতের বিচিত্র বস্তুরাজির সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনই সৃষ্টি হয় শ্রেষ্ঠ কল কলেবরের, উৎপত্তি হয় তার চৈতন্য। এই চৈতন্য গুণযুক্ত দেহই আত্মা। এই ভূত উপাদান থেকে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তু জগৎ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টি হয় তেমনই কালক্রমে ক্ষয় হতে হতে আদি উপাদানেই বিলীন হয়।

এই দৃশ্যমান বস্তুজগৎ যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয়, তেমনই আমাদের জীবন ও চেতনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব। এই জীবন বা চেতনার তাই স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। ভূত থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূত শরীর আশ্রয় করেই বর্তমান থাকে, আর এই ভূতশরীরের জটিল অবস্থাই হলো চেতনা বা জীবন। অতএব দেহই চৈতন্য আর চৈতন্যই দেহ। ফলে দেহ অতিরিক্ত চেতনা বা আত্মার কোন সত্তা নেই। দেহ অতিরিক্ত বা জগৎ অতিরিক্ত কোন কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে ধরা পড়ে না। এই ভাবে ভূতবাদ অনুযায়ী আত্মা, ঈশ্বর স্বর্গ, নরক এবং এসবের সমগোত্রীয় অমরত্ব পূর্বজন্ম, পরজন্ম, কর্মফল অদৃষ্ট ইত্যাদি অবাস্তব ও অলীক। কি প্রত্যক্ষে কি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় কি অনুমানে কখনোই এসব গোচরীভূত নয়। এ সবের কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই। মৃত্যুই জীবনের বিনাশ। মৃত্যুর পর জীবের কোন অস্তিত্বই থাকে না, মহাভূত সমূহে বিলীন হয়ে যায়। দেহের বিনাশে জীবন, চৈতন্য বা আত্মারও চির অবসান ঘটে।

ভূতবাদ অনুযায়ী ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাপুষ্ট অনুমানের দ্বারাই আমাদের জ্ঞান হয়। এর বাইরে কোনভাবে জ্ঞান সম্ভব নয় তবে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে একমাত্র বৈধ, নির্ভুল ও নিশ্চিত প্রমাণের উৎস বলে গণ্য করা হয়। এই প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক জীবনে যে অনুমান হয় তাও আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান দেয়। কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার বাইরে যে অনুমান তা ভ্রান্ত কষ্ট কল্পিত অবাস্তব ও অলীক। ভূতবাদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক জীবনাশ্রয়ী অনুমানই কেবল যথার্থ জ্ঞান লাভের

উপায়, উৎস ও প্রমাণ। তাই ভূতবাদ অনুযায়ী অপার্থিব অতীন্দ্রিয় স্বর্গসুখ বা মোক্ষ অস্বীকৃত। পাপ-পূণ্য-বর্ণাশ্রম-অদৃষ্ট সকলই মিথ্যা। সামাজিক মুক্তিই হলো এক মাত্র মুক্তি। ভূতবাদিগণ পরসুখবাদী। মনুষ্যত্বের সমান মর্যাদা দানই ভূতবাদিগণের মূল লক্ষ্য।

বৌদ্ধ দর্শনও ভূতবাদী। এই জগৎ জীবন স্বভাব, ক্রিয়া ও পরিণতি কখনোই অতীন্দ্রিয় কারণ সাপেক্ষ নয়, সকল কিছুই ভৌতিক। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী চার মহাভূতের সংঘাতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি যে শরীরও তার চৈতন্য মহাভূত সমূহের সংঘাতেই উৎপন্ন। চতুর্ভূ-তাত্মক শরীরের নামই হলো রূপকায়। এই রূপকায় বিশিষ্ট সকল কিছুই অস্থায়ী চঞ্চল। বৌদ্ধ মতে জগতের কোন কিছুই শাশ্বত নয়। বিনাশ কালে সকল কিছুই মহাভূতে বিলীন হয়। বৌদ্ধ দর্শনে তাই শাশ্বত আত্মা অস্বীকৃত। সনাতন আত্মা বলে কিছুই নেই। বৌদ্ধ দর্শন তাই নৈরাত্মবাদ রূপে চিহ্নিত। দৃশ্যমান জগতই সত্য। এর বাইরে কোন কিছুই নাই। বৌদ্ধ-দর্শনে ও কেবলমাত্র দুটি প্রমাণই স্বীকৃত যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রমাণসিদ্ধ অর্থক্রিয়াকারী সকল কিছুই সৎ। অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বলে কিছু নেই। মানুষই মানুষের নিয়ন্তা পূর্ণ স্বাধীনতাই অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছাই মুখ্য। কোন ব্যক্তি মালিকানা নয় জগতের সকল কিছুই সকলের জন্য। সকলের সমান ভোগ্য। অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে শ্রেণী বৈষম্য অস্বীকৃত।

ভূতবাদী হিসেবে চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন চিহ্নিত হলে ও উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল উভয়ই বর্তমান। পুরান পুঁথিতে যেমন চার্বাক ও বুদ্ধকে অভিন্ন বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখা যায় তেমনই মতপার্থক্যের কথা ও প্রকট করে জাহির করার প্রয়াস সমান ভাবে লক্ষণীয়। ডঃ দক্ষিনারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর চার্বাক দর্শন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[৪৪] "ন্যায় কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য এবং কুসুমাঞ্জলির প্রকাশটীকাকার বর্ধমান বুদ্ধকে চার্বাকের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রকার গণের আরও কেহ কেহ বুদ্ধকে চার্বাক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বা বৌদ্ধ মত ও চার্বাক মতের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।" অনুরূপভাবে চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শনের মতপার্থক্য বিষয়ে নানান আলোচনা ও বর্তমান তবে উভয়ে যে ভূতবাদী এ সম্পর্কে কোন প্রকার বিতর্ক নেই। আর ভূতবাদী হিসেবে বৌদ্ধদর্শন যে

চার্বাক পরবর্তী একথা স্পষ্ট। কেননা চার্বাক দর্শন যখন ভূতবাদের ব্যাখ্যায় স্বভাববাদকেই পাথেয় করেছে তখন বৌদ্ধদর্শন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথা তুলে ধরে বলেছেন জাগতিক সকল কিছুই দ্বন্দ্বের বিকাশ। সকল কিছুই পরিবর্তনশীল। এই নতুন দ্বন্দ্বতত্ত্বের কথা বলে বৌদ্ধ দর্শন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছেন। কতখানি অগ্রসর বিজ্ঞান চিন্তার অধিকারী হলে দর্শনে দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু চার্বাক দর্শন যতখানি সংস্কার মুক্ত ততখানি সংস্কার মুক্ত, প্রচারিত বৌদ্ধ দর্শন নয়। অবশ্য এসব যে বৌদ্ধদর্শনে পরবর্তী সংযোজন নয় একথা হলফ করে কেউ বলতে পারেন না। কেননা বুদ্ধদেব কোন পুঁথি রেখে যান নি। তাঁর জীবনাবসানের বহু পরে বাণীগুলি সংকলিত করার প্রয়াস দেখা যায় বিতর্কিত শিষ্য প্রশিষ্য বর্গের দ্বারা। তাই চার্বাক দর্শনের মত বৌদ্ধ দর্শনের মূল পুঁথিপত্র বলতে কিছুই নেই। চার্বাকদর্শনের মূল বক্তব্য যেমন আজও টিকে আছে তেমনই টিকে আছে প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের মূল বক্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে ভূতবাদ বা ভূতচেতনাবাদ ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ভিত্তি গঠনের বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যদিও আধুনিক বস্তুবাদের সঙ্গে ভূতবাদের কোনরূপ তুলনা চলে না তবুও খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা চিন্তা করলে ভূতবাদের ভূমিকা বস্তুবাদের ইতিহাসে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা প্রমাণিত হয়। কারণ কেবলমাত্র ভূতবাদেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অত্যন্ত সূচনা পর্যায়ে হলেও তার উল্লেখ বর্তমান। আর বুদ্ধদেব কেবল এই দ্বন্দ্ব পদ্ধতির শুধু উল্লেখই করেন নি, জগৎ ব্যাখ্যায় ব্যবহারিক ভাবে কাজেও লাগিয়েছেন। ভূতবাদে জীবন ও দর্শনের এমন অপূর্ব সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হয়।

ভূতবাদের মতই সুপ্রাচীন মতবাদ হলো প্রধানবাদ। এই প্রধানবাদকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কেউ কেউ আদি দর্শন রূপে চিহ্নিত করেছেন আর প্রধানবাদ প্রতিষ্ঠাতা কপিলকে আদি বিদ্বানরূপে চিহ্নিত করা হয়। ভূতবাদের মত প্রধানবাদেরও কোন স্বীকৃত সূত্র নেই। লোকায়ত সংগ্রহ থেকেই প্রধানবাদের আদি রূপ সম্পর্কে জানা যায়। প্রধানবাদ সম্পূর্ণতই বিচার প্রধান দর্শন। প্রধানবাদ অনুযায়ী দর্শন, জ্ঞানশাস্ত্র ও

বিজ্ঞানশাস্ত্র মূলতঃ একই তাই প্রধানবাদ অনুযায়ী সম্যকজ্ঞানই মানবমুক্তির একমাত্র পথ।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে প্রধানবাদের সঙ্গে যে দর্শনের নাম জড়িয়ে আছে তা হলো সাংখ্য দর্শন। প্রধানবাদ অনুসারে প্রধান বা প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। এই অব্যক্ত অবস্থাতে কোন গতি ও ক্রিয়ার উদ্ভব হয় না। অতএব এই অবস্থায় কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে গতির উদ্ভব হয় পরস্পর বিরোধী গুণের প্রভাবের ফলে। গুণগুলোর বিরূপ পরিণাম থেকে যে গতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় তা থেকেই ক্রমান্বয়ে জগতের আবির্ভাব ঘটে। প্রলয়কালে সৃষ্ট বস্তু প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। এই জগৎ তাই প্রধান বা প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশ।

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সম্ভাবনারূপে সুপ্ত বা অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতেই ছিল। ক্রমিক অভিব্যক্তি বা জাগরণই হলো পরিণাম। আর তা ঘটে পুরুষের সান্নিধ্যে। পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে প্রবল আলোড়নের ফলে জগতের বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়। যদিও সাংখ্য দর্শনে পুরুষ স্বীকৃত তবুও স্পষ্টই বলা আছে প্রকৃতি বা প্রধানই জগতের আদি পুরুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যদিও পুরুষের আমদানি সাংখ্য দর্শনে দ্বৈতবাদের ইঙ্গিতবহ তবুও আধুনিক পণ্ডিতদের মতে সাংখ্য দর্শনে পুরুষ তত্ত্ব বেমানান। তাঁদের মতে কপিলের আদি দর্শনে পুরুষের উল্লেখ ছিল কিনা সন্দেহ। ঈশ্বরতত্ত্বের মত পুরুষতত্ত্ব ও পরবর্তী সাংখ্যকারদের আমদানি যা সাংখ্য-দর্শনের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হয়নি। এখানে আমরা আধুনিক বিদ্বান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত তুলে ধরতে পারি।[৪৭] "পরবর্তী কালে সাংখ্য দর্শনে 'প্রকৃতি' বা প্রধান হিসেবে উল্লিখিত আদিম অচেতন কারণটির সঙ্গে 'পুরুষ' নামে এক চেতন তত্ত্ব সংযোজিত হলেও দর্শনটির আদিরূপে হয়তো ছিল না : অচেতন প্রধান থেকে স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই জগৎ-উৎপত্তি। এই কারণেই কি পরবর্তী সাংখ্য 'পুরুষ' সংযোজিত হলেও তা 'উদাসীন এবং অপ্রধানের' চেয়ে বেশী মর্যাদা পায় নি ? যদি তাইই হয়, তাহলে সুখলালজী এবং সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আদি সাংখ্যকে ও কোন এক রকম প্রাচীন বস্তুবাদ বলে অনুমান করার সুযোগ আরো জোরদার হয়।

জৈন দার্শনিক শীলাঙ্ক তো সরাসরি এই কথাই বলেছেন।"

এখন প্রশ্ন আদি সাংখ্যর রূপটি তাহলে কি? ইতিপূর্বেই এ নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমানে তার পুনরুল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির জন্যই তা জরুরী। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুখলাল জি সাংভি স্পষ্ট করেই বলেছেন 'চরক সংহিতায়' আদি সাংখ্যের পরিচয় পরিস্ফুট। সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে প্রকৃতি থেকেই পুরুষের উৎপত্তি। আদি সাংখ্য অনুযায়ী প্রকৃতিই আদি সত্তা, চরম সত্তা। পুরুষ বা চেতনা হলো প্রকৃতি উদ্ভূত। প্রকৃতি ত্রিগুনাত্মক। গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই জগতের সৃষ্টি। এই প্রধানরা কোন না কোন ভাবে ভূতবাদকেই সমৃদ্ধ করছে। প্রধানবাদ অনুযায়ী অব্যক্ত বস্তু সত্তাই আদি কারণ। অবস্তু থেকে কখনোই বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না। বস্তু থেকেই বস্তুর উৎপত্তি। চৈতন্যও প্রকৃতি উদ্ভূত। শরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ও সৃষ্টি হয়। 'আমি' 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান প্রবাহই আত্মা। সকল জ্ঞানই সবিষয়। জ্ঞান হচ্ছে অথচ বিষয় নেই এ হলো প্রলাপোক্তি। প্রধানবাদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ববাদী সম্মত। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ণিত হলেই অন্যান্য প্রমাণ সহজ হয়ে যায়। অনুমিতি শাব্দ প্রমাণ প্রত্যক্ষনির্ভর। অতএব সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষের বিচার আবশ্যক। ইন্দ্রিয় ভেদ প্রত্যক্ষ ভেদে হয়। ইন্দ্রিয় যেমন ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ ও ছয় প্রকার। ছয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই প্রধান। আধুনিক ব্যাখ্যা কর্তা পণ্ডিতগণ সাংখ্য দর্শনে তন্মাত্র কে পরমাণু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তৎ+মাত্র তন্মাত্র, কেবল সেইটুকু। তাছাড়া সাংখ্য দর্শনে গন্ধতন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও রূপ তন্মাত্র প্রভৃতি নামে বস্তুবিশেষকে বোঝানো হয়েছে। যার পর নাই সূক্ষ্ম পদার্থের নাম পরমাণু। তন্মাত্রাবস্থায় রূপ -রস-গন্ধ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। পরে আবির্ভূত হয়। যেমন হলুদ-চুন মেশালে লাল রঙ উৎপন্ন হয়। কপিল মতে পদার্থমাত্রেই কর্ম বা স্বভাব বর্তমান। কোন পদার্থ প্রকৃতি, কোন পদার্থ বিকৃতি। প্রকৃতি কারণ, বিকৃতি কার্য। এই ভাবে সাংখ্য দর্শনে স্বভাববাদ স্বীকৃত। মহাভারতের শান্তি পর্বে এর স্বীকৃতি রয়েছে। এই ভাবে প্রধানবাদে অব্যক্ত বস্তু পুঞ্জই একমাত্র সত্য। অতীন্দ্রিয় কোন কিছুই সত্য নয়, অতএব ঈশ্বর-পরলোক প্রভৃতি অসিদ্ধ। সাংখ্যমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ বা মুক্তি।

ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ এর ইতিহাসে ভূতবাদ ও প্রধানবাদের পাশাপাশি পরমাণুবাদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। এক অর্থে ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ বিরোধী দার্শনিক সম্প্রদায়ই কোন না কোন ভাবে পরমাণু-বাদকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু পরমাণুবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে যে নাম জড়িয়ে আছে তা হলো ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়। জৈন দর্শনে ও পরমাণু বা পুদগলের কথা আলোচিত কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ততখানি গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু মীমাংসা দর্শন সমধিক গুরুত্ব দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছে। কেবলমাত্র পরমাণুবাদ আলোচনা করলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণীত হয়ে যায়। এখানে এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়। তাই পরমাণুবাদের প্রধান যুক্তিগুলো এখানে উল্লেখ করব।

পরমাণুবাদ অনুযায়ী পরমাণুই জাগতিক সকল কিছুর আদি উপাদান। আমাদের দেখা সকল বস্তুই যৌগিক বা সংযোগ থেকে নিষ্পন্ন। যৌগিক বলতে বিভিন্ন সংমিশ্রিত অংশকে বোঝায়। প্রতিটি যৌগই গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে দ্রব্য নামে পরিচিত। ফলে দ্রব্য মাত্রেই সত্তাবান পদার্থ। পরমাণু সমূহের সংমিশ্রনে এদের উৎপত্তি এবং তার বিভাজনে এদের বিনাশ সম্পন্ন হয়। এখন প্রশ্ন দ্রব্য বা জড়বস্তুর তাহলে আদি উপাদান কি? ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের উত্তর, এর জবাব দ্রব্য বা বস্তুতেই বর্তমান। একটি দ্রব্য বা বস্তুকে যদি বিভাজন করা যায় অর্থাৎ ক্রমাগত খণ্ড বিখণ্ড করতে থাকলে সব শেষে এমন কতগুলি সূক্ষ্ম জড়কণা পাওয়া যায় যাকে আর কোনভাবে ভাগ করা যায় না, সেই অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য, সূক্ষ্ম জড়কণাই হলো পরমাণু। ফলে পরমাণু মাত্রেই নিরংশ পরস্পরের থেকে পৃথক, কিন্তু একত্রে জগতের উপাদান কারণ। এই পরমাণু নিত্য দ্রব্য, অবিনাশী বহিঃশক্তির দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে জগৎ গঠন করে।

জৈন দর্শনে ও পরমাণু পুদ্গল রূপে চিহ্নিত। সংযোগ ও বিভাগের যোগ্য পদার্থই পুদ্গল। দুই বা ততোধিক কণার সংযোগে স্থূল জড়দ্রব্যই সংঘাত বা স্কন্ধ। বিশ্ব হলো মহাস্কন্ধ। এমনকি মন, প্রাণ, শ্বাস, প্রশ্বাস সকলই জড় থেকেই উৎপন্ন। পরমাণু সকল বিভিন্ন সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন ভূত পদার্থের উদ্ভব ঘটায়। জৈনমতে পরমাণু সকল সক্রিয়। ফলে পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। পরমাণু-

গুলি সগুণ। পরমাণুগুলি মৌলিক ও নিত্য দ্রব্য।

মীমাংসা দর্শনে ন্যায়-বৈশষিক পরমাণুবাদই স্বীকৃত। যুগের প্রয়োজনে পরবর্তী মীমাংসকগণ পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠায় বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য খণ্ডনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। পরমাণুর সমন্বয়ই এই জগৎ। জাগতিক বিষয় সত্য ও বাস্তব। বিষয় ব্যতীত কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। বিষয়ের সৃষ্টি-বিনাশ আছে কিন্তু জগৎ সৃষ্টি বিনাশ রহিত। বিষয়ের অনবরত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে কিন্তু এই নানা পরিবর্তনের মাঝে ও জগৎ আদি, অন্তহীন ভাবে চলে আসছে। মীমাংসকগণ পরমাণু অতিরিক্ত অপূর্ব নামে এক প্রকার শক্তিকে স্বীকার করলে ও কিন্তু আত্মাকে একটি দ্রব্য বলে মনে করেন। চৈতন্য হলো আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম।

আমরা দেখলাম ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদ অধিকাংশ ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ই কোন না কোনভাবে ব্যক্ত করেছেন। ব্যাখ্যার তারতম্য ছাড়া প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায়ই পরমাণুকে জগতে আদি কারণ চিহ্নিত করেছেন। কোন দর্শন সম্প্রদায়ই ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় কোন কিছুকে স্বীকার করে নি। সনাতন আত্মা বলে কোন কিছু নেই। পরমাণু সৃষ্ট আত্মা বা চৈতন্য দেহেরই ধর্ম। এই জগৎ সত্য, জগতের বিষয়রাজি জ্ঞানে ধরা দেয়। প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ, অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ নির্ভর। প্রবৃত্তি সামর্থ যার আছে তাই যথার্থ জ্ঞান। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। তা সত্বেও এই সব দর্শন সম্প্রদায়ের যে কোন প্রকার অসম্বদ্ধতা নেই তা নয়। পরমাণুকে উপাদান কারণ বলা সত্বেও এই সব সম্প্রদায়ই আবার পরমাণু অতিরিক্ত একটি শক্তিকে স্বীকার করেছে। যেমন ন্যায়-বৈশেষিক ঈশ্বর, জৈন অদৃষ্ট এবং মীমাংসা অপূর্ব। আমরা পূর্বের আলোচনাতেই দেখেছি গৌতম, কণাদ জৈমিনি কেউই তাঁদের মূল সূত্রে যেমন ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি, তেমনি অতীন্দ্রিয় কোন সত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার প্রভাবিত করার প্রয়াস করেন নি। শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় এই সব তত্ত্বের আমদানি করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তবে পরমাণুগুলিকে নিষ্ক্রিয় বলার কারণ কি থাকতে পারে? যদি বলা যায় যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেই যুগে ঠিকমত সাধিত হয় নি বলেই গৌতম, কণাদ বা জৈমিনি পরমাণুগুলিকে সক্রিয় বলতে পারেন নি। এই কথা কিন্তু মানা যায় না। কেননা সেই সময়কালেই জৈন দর্শনে

পরমাণু সকল পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণকারী সক্রিয় বলে স্বীকৃত। অতএব পরমাণু অতিরিক্ত শক্তির আমদানি করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন তবে জৈন দর্শনে কেন অদৃষ্টের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দুটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ জৈন দর্শনের পুঁথিপত্র মহাবীর পরবর্তী সময়ে শিষ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা রচিত। আর মহাবীর পরবর্তী শিষ্য সম্প্রদায় বহুধা বিভক্ত। ফলে নিজস্ব সম্প্রদায়গত সব বিচার বোধ যে এই সব গ্রন্থ রচনায় কাজ করেছে এ বলার অপেক্ষা রাখে না। আর নিজস্ব সম্প্রদায়গত বিচারবোধ আর্থ-সামাজিক প্রভাবপুষ্ট না হয়ে উপায় নেই। ফলে পরবর্তীকালে দার্শনিক তত্ত্বে কতখানি আমদানিকৃত আর কতখানি মহাবীরবাণী তা বস্তুনিষ্ঠ বিচারের অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়তঃ অদৃষ্ট শব্দটি অধুনা যে অর্থে প্রচারিত সমকালীন সময়ে সেই অর্থে প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ অর্থে প্রচলিত ছিল। যা দৃষ্ট নয় তাই অদৃষ্ট। পরমাণুর সংযোগ যেহেতু অভিজ্ঞতার বাইরে তাই অদৃষ্ট বলেই আখ্যায়িত। কিন্তু শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় যুগপ্রভাবের শিকার হয়ে অদৃষ্ট শব্দে অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধ পরবর্তী বৌদ্ধ-দর্শনে যেমন শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় মূল দর্শনে বিকৃতি সাধন করেছে ভাববাদের সমর্থনে, জৈনদর্শনে ও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। কেননা কখনোই এই অদৃষ্ট শক্তিকে ধী শক্তির রূপে চিহ্নিত করা হয় নি, বরং অদৃষ্টকে জড় বা অচেতন রূপে চিহ্নিত করেছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতির সীমাবদ্ধতাই পরমাণুসকলকে সক্রিয় বলা সত্ত্বে ও জগৎ বৈচিত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না দিতে পারার জন্য দায়ী। যেমন জৈন দর্শনের ক্ষেত্রে তেমনই দেখি মীমাংসা দর্শনের ক্ষেত্রে সেখানেও কুমারিল আদি দার্শনিকগণ শেষ পর্যন্ত অপূর্ব শক্তির উল্লেখ করে চিন্তার সীমাবদ্ধতা ঢেকেছেন। শব্দ চয়নের মধ্যেই অসীম বিস্ময়ের চিহ্ন বর্তমান। যা অদৃষ্টকেই সূচিত করছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অনুরূপ সীমাবদ্ধতাই গৌতম ও কণাদকে এ বিষয়ে নীরব থাকতে দেখা যায়। মূলসূত্রে ঈশ্বর অস্বীকার কি করে যে পরবর্তীকালে পরমাণু অতিরিক্ত শক্তিরূপে চিহ্নিত হয় তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই নতুন করে আর সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছি না। আধুনিক পরমাণুবাদ পরস্পরের সংযুক্তির প্রশ্নে সমাধান যত দ্রুত করতে পারে খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয়

শতাব্দীতে তা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। যে দর্শন সম্প্রদায়গুলি বস্তুর বিভাজন করে অবিভাজিত মৌল অংশে পৌঁছতে পারে, এমনকি মন বা চেতনা বা আত্মা যে পরমাণু উৎপন্ন এমন ব্যাখ্যা দিতে পারে সেই দর্শন কি করে মূল তত্ত্ব বিরোধী অতীন্দ্রিয় কোন শক্তির প্রয়োজন অনুভব করতে পারে? কারণ ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন-মীমাংসা স্পষ্টতই প্রমাণবাদী। প্রত্যক্ষকে জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ বলেছেন। সেখানে অতীন্দ্রিয় কোন শক্তির প্রশ্ন তো অবাস্তব। তবুও দেখা যায় পরবর্তী কালীন বশম্বদ শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায়কে ভাববাদের সপক্ষে কৌশল অবলম্বন করতে। এ তো ভারতবর্ষের শ্রেণী চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। আমরা এখানে জৈনদর্শনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। মহাবীর প্রচারিত জৈন দর্শন পুরুষকারের দর্শন। পরিষ্কার শ্রেণী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে জৈন দর্শনে। সেই সময় উচ্চ ব্যবসায়ী যারা বৈশ্য সম্প্রদায় বলে পরিচিত তারা তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের জয়গান গেয়েছেন। সামন্ততন্ত্রের থেকে বণিকতন্ত্র প্রগতি ভাবাপন্ন। তাই জৈন দর্শনে ব্যক্তি স্বাধীনতার উজ্জীবন দেখা যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠীতন্ত্রের মূল কথা। সামন্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাই জৈনদর্শনকে উন্নত চিন্তার ঘোষণা করতে হয় জীব নিজেই নিজের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে। অদৃষ্ট অর্থাৎ যা দৃষ্ট নয় তাই মানুষ তার নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় সর্বস্ব এই দর্শন যে কি করে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তাকে স্বীকার করতে পারে তা চিন্তার অগম্য। দর্শন প্রতিষ্ঠাতাদের ইতস্তত বোধ পরবর্তী শিষ্যদের উৎসাহিত করেছে পাদ পূরণ করতে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্ববিরো-ধিতা-দুষ্ট অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আমদানি। মূল সূত্রের ক্ষেত্রে যা একান্তই বেমানান। একনিষ্ঠ ছাত্রমাত্রই এ বিষয় অনুধাবন করবেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে কি ভূতবাদ, প্রধানবাদ ও পরমাণুবাদ স্বতন্ত্রভাবে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ভিত্তি হিসেবে পরি-গণিত না হলেও একত্রে যদি তিনটি মতবাদকেই ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে বিচার করা যায় তো দেখা যাবে সেই সুপ্রাচীন কালে বিশ্বের কোথাও যখন বস্তুবাদের বিকাশ সম্ভব হয় নি বা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল তখন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ সমগ্র বিশ্বে দিক দিশারী হিসেবে চিহ্নিত হত। যদি ভারতীয় দর্শনের এই বস্তুবাদী দিক কার্ল মার্কসের

নজরে আসতো তো তার অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাতে কখনোই বিরত থাকতেন না। যা হয়নি তা নিয়ে অনুশোচনা না করে বস্তুবাদের স্বরূপ নির্ণয় করাই বর্তমানের মুখ্য কাজ হওয়া উচিৎ। কিন্তু তা এই গ্রন্থে সম্ভব নয়, পরবর্তী গ্রন্থে এ নিয়ে সম্যক আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করব।

———

গ্রন্থপঞ্জী

প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

1. মনুসংহিতা ৪।৩০, ২।১০-১১
2. ঋক্ ১০।৯০
3. ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮৬ পৃঃ ৫৬
4. বৃহদারণ্যক ১. ৪. ১০-১৪
5. Communist Manifesto, K. Marx, Moscow.
6. মনু : ২।১০
7. মনু : ১।১০২
8. মনু : ১।৯১
9. ঐ ১০।১২৫
10. ঐ ৮।৪১৩-১৪
11. ঐ ২।১০-১১
12. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭. ১. ৪.
13. A. C. Ewing :Idealism : A critical survey, london, 1934, P-2
14. Radhakrishnan : An Idealist view of life : London 1947 P,P 16-17
15. E. Troeltsch, Encyclopaedia of Religion and Ethies, vol-3. PP 89-90
16. A. c. Ewing : op cit PP. 2-3
17. P. T. Raju : Idealist Thought of India, London, 1953 P-15
18. Debiprasad chattopadhyaya : what is living and what

is dead in Indian Philosophy : New Delhi, 1976 : PP. 216-17

19. Tanjur MDS. cxxx.111.9. papers on sfchervatsky translated by H. C. Gupta and Edited by D. Chattopadhyaya Calcutta, 1969.
20. মঝ্ঝিম নিকায়—২।২।৩, দীঘ নিকায়—১।৯।৩।১৬
21. Ryhs Davids : Buddhism : Its History & Literature, Newyork & London 3rd Ed. 1896, P 115
22. F. Engels : Ludwig Feuerbach and the End of classical German philosophy. Marx & Engels, selected works, Moscow. 1975, P 596
23. Kant's critique of pure Reason : Abridged Edition by Norman kemp Smith, London, 1934, P 137
24. Kemp Smith : Prolegomena to an Idealist theoy of Knowledge P. 1. Quoted by A. C. Ewing, op cit, P-2, note.
25. Dr. Radhakrishnan : An Idealist view of life. P-16
26. S. N. Dasgupta : Indian Idealism, Cambridge 1962.
27. D. Chattopadhyaya : Indian Atheism : A Marxist Analysis, Calcutta 1969, PP 95-108
28. Burtrand Russell : Problems of Philosophy P. 16.
29. Dale Reipe : The Naturalistic Tradition of Indian Thought ; University of Washington Press, Scattle, 1961, P—5-7.
30. Radhakrishnan : History of Philosophy, Eastern and Western, London 1953, Vol. 1, P. 21.
31. G. Tuci : The Proceedings of the Indian Philosophical Congress, 1935, P. 35.
32. S. N. Dasgupta : Indian Idealism, Cambridge, 1962,

PP. 27-28.

33. D. Chattopadhyaya : What is Living…op cit. PP. 216-17.

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. Dasgupta : Indian Idealism : op cit. PP. 11-29.
2. Bu-Ston : History of Buddhism, translated by E, obermiller, Heidelberg. 1932, Part II, P. 124.
3. R. G. Bhandarkar : Vaisnabism, Saibism and Minor Religious System : Strassburg, 1913, P. 1.
4. G. Thibaut : Sacred Books of the East, Vol. 34, Introduction, P. C. ii.
5. P. Deussen : Outlines of Indian Philosophy, Berlin. 1907, P. 22.
6. বৃহদারণ্যক উপনিষদ : ১,৪,১,
7. ঐ ২,১,২০
8. ছান্দোগ্য : ৬,৩,৩
9. কঠ : ২,২,৭
10. কঠ : ১,২,১৮
11. বৃহদারণ্যক : ৪,৪,১২
12. ঐ ১,৪,১
13. ঐ ৪,৪,১৯
14. তৈত্তিরীয় : ২,৪
15. মৈত্রী : ২,৮
16. মাণ্ডুক্য ১,১.১-৩
17. বৃহদারণ্যক ২,৪,৩
18. ঐ ৪,৪,২২
19. ঐ ২,৩,৬

20. কঠ ১,৩,১৫
21. Radhakrishnan : Indian Philosophy, India, 1985, Vol. 1. P. 591.
22. Ryhs Davids : Buddhism.
23. M. William : Buddhism, Chap. vii
24. Stchervatsky : Further Papers of Stchervatsky, Calcutta, 1971. P. 26
25. Ibid, PP 21-22
26. Radhakrishnan : Indian Philisophy Vol. 1, P 342
27. Ibid, Vol 1, P 608
28. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Delhi, 1975 Vol 1, P 78
29. Hiriyanna : Outlines of Indian Philosophy, India, 1979, P 146
30. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম পৃঃ ৫১
31. রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বৌদ্ধদর্শন, ১৩৯১, কলিকাতা, পৃঃ ১-১০
32. Ryhs Davids : Buddhism : P 115
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঃ বৌদ্ধদর্শন পৃঃ ১১
33. Radhakrishnan : Indian Philosophy, P 605
34. Ibid, PP 607-8
35. D. Chattopadhyaya : What is Living, P 533
36. Stchervatsky : The Conception of Buddhist Nirvana Reprint, Delhi, 1977 P-53
37. Vally Pousin : Encyclopaedia of Religion and Ethies Ed Hastings Edinburgh 1908-18 IX : 851-2
38. N Dutta : Mahayana Buddhism : Revised Ed ; Delhi : 1978 PP IX-X
39. History of Buddhism in India : Taranath translated from the Tebetan by Lama Chimpa & Aloka Chatto-

padhyaya, Ed. by D. Chatto : Simla, 1970, P 108

40. Stchervatsky : The Conception of Buddhist Nirvana P 42
41. K. Venkat Raman : Nagarjuna's Philosophy as presented in the Maha-Prajnaparamita Sutra, Rutland, Vermont, Tokyo, Japan, 1966, P 336
42. Ibid P 25
43. Ibid
44. Tanjur, MDO XXXIII, 32, XI, IV, 27
45. Journal of Royal Asiatic Society, 1934 PP 307-325, 1936, PP 237-252, 423-425
46. K. Venkat Raman : op cit P 30
47. Bu-Ston : op cit, Vol 1, P 50
48. মাধ্যমিক শাস্ত্র ২৪.১৮
49. ঐ ১.১
50. ঐ ২৪.১৮
51. ঐ ১৩.৮
52. বৃহদারণ্যক ৪.৪
53. Stchervatsky : The Conception of Buddhist Nirvana, P 42
54. Mukherjee Satkari : The Nava Nalanda Mahavihara Research Publication, Nalanda, 1957 P 121
55. P. T. Raju : Idealist thought of India, P 15
56. মহাবস্তু ১.১২০
57. Valle Poussion : Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 8, P 330
58. Stchervatsky : Madhyanta Vibhanga : Discourse on discrimination between Middle and Extremes, Re-

print, Calcutta, 1971, P 14, 15, 27

59. রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বৌদ্ধদর্শন পৃঃ ১০৩

60. আলম্বন পরীক্ষা ৬-৮

61. D. Chattopadhyaya : What is Living, P 56-74

62. পঞ্জিকা পৃঃ ১২৩

63. তত্ত্বসংগ্রহ ৩৩০

64. ঐ কাঃ ২০৮৪

65. ঐ কাঃ ২০৭৯

66. ঐ কাঃ ৩৫৩৫

67. Stchervatsky : The Conception of Buddhist Nirvana, op cit. P-71

68. Dasgupta : A History of Indian Philosophy : op cit : Vol. I. P-429

69. Stchervatsky : op cit, P-44

70. Radhakrishnan : Indian Philosophy : op cit, Vol. I, P-467

71. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, op cit, Vol. II, P-77

72. Radhakrishnan . The Brahmasutra : Translation (1.13), P-240

73. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, Unwin (R) Paperbacks, 1978, P-152

74. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, op cit, Vol. I, PP 4—9

75. Stchervatsky : The Conception of Buddhist Nirvana op cit, P-102

76. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, op cit, Vol. I, P-493

77. Ibid PP-423—28

78. Radhakrishnan : Indian Philosophy : op cit, Vol. II, P 471
79. Ibid, Vol. II, P 470

তৃতীয় অধ্যায়

1. মৈত্রী উপনিষদ ঃ ৫.২
2. মাধ্যমিক কারিকা ৫৭
3. লঙ্কাবতার সূত্র ৫৬, ৬৭, ৬৮, ২২২, ২২৯
4. বৃহদারণ্যক ঃ ৪.২.২
5. কঠ ঃ ২.৯
6. Vaidalya-Sutra and Prakarana. The Texts are preserved in Tebetan Translation, Tanjur, MDO, xvii 3 and xvii 8
7. Adhyas Bhasya : Eng. trans. G. Thibaut, Sacred Books of the East

অংশ-২

চতুর্থ অধ্যায়

1. মনুসংহিতা ৪।৩০
2. রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড) ১০০।৩৮।৩৯, মহাভারত ১২।১২।৫, ৩।৩০-৩১
3. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন, ১ম খণ্ড, নিউ এজ, কলিকাতা ১৯৬৯ পৃঃ ২
4. মনুসংহিতা ১২।১০৬
5. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৯
6. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: ভারতীয় দর্শন, এন, বি, এ, ১৯৬০, পৃঃ ১৩৫-৩৬

7. ঐ পৃ: ১০
8. R. Garbe : The Philosophy of Ancient India, The Open Court Publishing Co. Chicago, 1899 P II
9. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন পৃ: ১৫৪
10. ঐ পৃ: ১৩৭
11. ছান্দোগ্য ৮.৮.৫
12. ছান্দোগ্য ৮.৮
13. ঐ ৮.৮
14. ঐ ৬.৬
15. ঐ ৬.৮
16. ঐ ৬.৮
17. বৃহদারণ্যক ২.৪.১২
18. M. N. Roy : Indian Philosophy and Radhakrishnan : The Philosophy of Radhakrishnan, Ed Paul Arthur, Schelpp (New York) Tudor Publishing Co. 1952, P 561
19. W. Ruben . Studies in Ancient Indian thought, Calcutta, 1966, P 79-87
20. ছান্দোগ্য ৮.৭-৮
21. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন পৃ: ১০৬
22. মীমাংসা সূত্র : শবর ভাষ্য ৩.৩.৪৪
23. Radhakrishnan : Indian Philosophy Vol. 2 P 427
24. Khandadeb Misra in Jha PMS, Appendix 60
25. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন পৃ: ২৩৯-৪০
26. ছান্দোগ্য ৫.১১.১
27. মঝ্ঝিম্ নিকায় পৃ: ৩৪৮ (রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বৌদ্ধদর্শন)
28. Oldenberg : Buddha. P-204
29. মঝ্ঝিম্ নিকায় ৬৩
30. কুমারিল : তন্ত্রবার্তিক ১.৩.৪

31. রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বৌদ্ধদর্শন : অনুঃ পণ্ডিত ধর্মাধর মহাস্থবির, কলিকাতা ১৯৮৪ পৃ ২৬
32. শ্বেতাশ্বেতর : ১.২
33. চার্বাক দর্শন : দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী : ভূমিকা
34. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম পৃ ৫১ : Dasgupta : Ind Phil. P. 78
35. Stchervatsky : Buddhist Logic, Leningrad 1932, Vol. I, P-3
36. Buddhist Philosophy : A. B. Keith, Cambridge. University Press, P 567
Brihadaranyak-vartik Sureswara, P 15 Stanga-28
Hiriyanna : Out lines of Indian Philosophy, P-148
37. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol-I, P-166
38. Ryhs Davids : Buddhism, op cit, P-115
39. রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বৌদ্ধদর্শন ঐ, পৃ ৩৭-৩৮
40. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol. I, op cit, P-169
41. অনয়যোগ ব্যবচ্ছেদিকা : দ্বাত্রিংশিকা ২৮
42. ঐ ২২
43. উমাস্বাতি : তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ৫.৩৭
44. ঐ ৫.২৯
45. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-63—64
46. Ibid P-65
47. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol-I, op cit, P-197
48. Ibid P-192

49. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-70
50. Ibid P-67
51. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol-I, P-280
52. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী ১ম খণ্ড, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং, কলিকাতা ১৯৫৬, পৃ ৪৪০
53. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-84
54. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন পৃ ২৩
55. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-84
56. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol-I, op cit, P-285
57. Ibid P-282
58. Ibid P-283
59. S. C. Chatterjee : The Nyaya Theory of Knowldege C. U. 1978, XV.
60. Radhakrishnan : Indian Philosophy : 2nd Vol, op cit, P-29
61. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায় দর্শন : প্রথম খণ্ড : রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পৃ ১২-১৩
62. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারত দর্শন সম্ভার : পৃঃ ন্যায় ১
63. মহাভারত (শান্তিপর্ব) ১৮০.৪৭-৪৯
64. রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড) ১০০.৩৮-৩৯
65. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায়দর্শন প্রথম খণ্ড ১৪-১৬
66. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন পৃঃ ৩৬-৩৭
67. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায় দর্শন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬-২৭

68. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, কলকাতা, অনুষ্টুপ ১৯৮৭, পৃঃ ১৯৮
69. ঐ
70. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-89
71. Das gupta : A History of Indian Philosophy, Vol-I, op cit, P-319
72. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-102
73. Macdonell : Vedic Reader, P-107
74. ঋক্ ১০.১২
75. শ্বেতাশ্বেতর ৬.১৩
76. কঠ ৩.১০.১১
77. ছান্দোগ্য ৬.৪. ১।২. ৫।৪.২
78. মৈত্রী ৩.২
79. মহাভারত ১২.১৩৮ শান্তিপর্ব ৩০৩-৩০৮
80. মনুস্মৃতি, প্রথম অধ্যায়
81. শারীরক ভাষ্য ২.১.১২
82. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শন পৃ ৮
83. Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol 2, op cit, P-258
84. গৌড়পাদ : সাংখ্যকারিকাভাষ্য ১১।।
85. Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol 2, op cit, P-253
86. সাংখ্যকারিকা ৭২।।
87. তর্করহস্যদীপিকা ১০৯।।
88. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ৩য়, খণ্ড, রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃঃ ৫০৮

89. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, op cit, P-213
90. Ibid P-213
91. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-106
92. Ganganath Jha : Purba Mimamsa in its Sources, Benaras Hindu University 1942, P-3
93. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, P-109
94, Stchervatsky : Buddhist Logic : op cit, P-19
95. Garbe : The Philosophy of Ancient India, op cit, P-21-23
96. Hiriyanna : The Essentials of Indian Philosophy, op cit, 7-124
97. শঙ্কর : শারীরক ভাষ্য : ১,১,১
98. মাধবাচার্য : সর্বদর্শন সংগ্রহ : ১
99. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, op cit. Vol-I, P-53
100. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, ১ম খণ্ড, পৃ ৭৯
101. বৃহদারণ্যক : ২.৪.১২
102. ছান্দোগ্য ৮.৮.৫
103. কঠ : ৫.৭
104. ছান্দোগ্য ৬.৩.৩
1 05. শঙ্কর, শারীরক ভাষ্য ১.১.৮
106. চার্বাকদর্শন, ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, মুখবন্ধ, পৃ ৮
107. গুণরত্ন, তর্করহস্যদীপিকা, ৩০০
108. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, ১ম, খণ্ড পৃ ১০
109. ছান্দোগ্য ৭.১
110. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, ১ম খণ্ড পৃ ২৬১

111. বৃহদারণ্যক ২.৪.১২
112. ছান্দোগ্য ৬.৮
113. বৃহদারণ্যক ৪.৪.১২
114. ঐ ৪.৪.১৯
115. ঐ ২.৪.৫
116. সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ ২.৭
117. মধুসূদন সরস্বতী, গীতাভাষ্য, ১৬.৮
118. কঠ ৬.২
119. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, ১ম খণ্ড, প: ২৫৬-২৬০

পঞ্চম অধ্যায়

1. সাংখ্যকারিকা : ৫
2. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারত দর্শন সম্ভার, পৃ ১
3. ন্যায়সূত্র ১,১,৪
4. মীমাংসা সূত্র ১,১,৪
5. ন্যায়সূত্র ১,১,৮
6. ঐ ৪,২,২৯
7. ঐ ৪,২,২৭
8. ঐ ৪,২,৩৫
9. ঐ ৪,২,৩৭
10. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারত দর্শন সম্ভার, ন্যায়, পৃ ১৫৩
11. কুমারিল, শ্লোকবার্ত্তিক, নিরালম্বনবাদ কারিকা ৩৩।।
12. ঐ ৩৫।।
13. ঐ ৭৯।।
14. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃ: ২৪
15. ঐ ৫ম খণ্ড পৃ ২৭০
16. ঐ ৫ম খণ্ড পৃ ২৭৫
17. ন্যায়সূত্র, ৪,২,৩৭

18. কুমারিল, শ্লোকবার্তিক, নিরালম্বনবাদ কারিকা, ৬॥
19. ঐ ৭॥
20, ঐ ৮॥
21. বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১
22. কুমারিল, নিরালম্বনবাদ কারিকা, ৬-২০॥
23. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বৌদ্ধদর্শন, পৃ ২৮৩
24. D. Chattopadhyaya : What is living and what is dead in Indian Philosophy. 2-372
25. শুভগুপ্ত, বাহ্যার্থসিদ্ধি ৬৫
26. ঐ ৭৫
27. Hiriyanna : Outlines of indian Philosophy : op cit, 2 280
28. C. D. Sharma : A Critical Survey of Indian Philosophy : Bombay, 1979, 2-15
29. Hiriyanna : Outlines of Indian Philosophy : op cit, 144
30. D. Chattopadhyaya : What is living : op cit, 2-93
31. ন্যায়সূত্র ৪,২,২৭
32. ঐ ৪,২.২৮
33. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২ মুখবন্ধ, পৃ চ
34. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, অনুষ্টুপ, ১৯৮৮ পৃ ২৪৭

গ্রন্থপঞ্জী

সংস্কৃত/বাংলা

বৃহদারণ্যক উপনিষদ

ছান্দোগ্য উপনিষদ

তৈত্তীরীয় উপনিষদ

মুণ্ডক উপনিষদ

কঠোপনিষদ

মৈত্রী উপনিষদ

মাণ্ডূক্য উপনিষদ

মনুসংহিতা

রামায়ণ

মহাভারত

ন্যায়সূত্র

মীমাংসাসূত্র

সাংখ্যকারিকা

শারীরক ভাষ্য

মাধ্যমিক কারিকা

তত্ত্ব সংগ্রহ

লঙ্কাবতার সূত্র

তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র

অনয়যোগ ব্যবচ্ছেদিকা : দ্বাত্রিংশিকা

তর্করহস্য দীপিকা

নৈষাধচরিত

সর্বদর্শন সংগ্রহ

সর্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ

মহাবস্তু

শ্লোকবার্ত্তিক

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

মঝ্ ঝিম্ নিকায়/দীঘনিকায়/

বাহ্যার্থসিদ্ধি

হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং কলিকাতা ১৯৫৬

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা ১৩২৪-৩৬

রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বৌদ্ধ দর্শন : অনু : পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, কলিকাতা ১৯৮৪

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, প্রথম খণ্ড, নিউ এজ ১৯৬৯, কলিকাতা, ভারতীয় দর্শন, এন, বি, এ, ১৯৬০, ভারতদর্শন সম্ভার, ন্যায়, নবপত্র, কলিকাতা, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে : অনুষ্টুপ ১৯৮৭, কলিকাতা ১৯৮২

ডঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, চার্বাকদর্শন, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২

ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো।

Bu. Ston — *History of Buddhism* Translated by E. Obermeller, Heidelberg, 1932

Bhandarkar R. G. — *Vaisnabism, Saibism and Minor Religious Systems.* Strassburg, 1913

Bulletin on Tibetology — Vol IV, Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, 1967

Chattopadhyaya, D. — What is living and what is dead in Indian Philosophy, New Delhi, 1966

,, — Indian Atheism, Calcutta, 1962

Dasgupta, Surendranath Indian Idealism, Cambridge, 1969

" A History of Indian Philosophy, Vol-I, New Delhi, 1975

Dale Reipe The Naturalistic Tradition in Indian Thought, University of Washington Press, Scattle, 1961

Dharmakirthi Santanantara Siddhi Pramanvartika

Dutta, N. Mahayana Buddhism, Revised Edition, Delhi, 1978

Deussen, P. Outlines of Indian Philosophy, Berlin, 1907

Encyclopaedia of Religion and Ethics

Engels, F Ludwig Feuerback and the End of Classical German Philosophy. Marx & Engels, Selected Works, Moscow, 1975

Ewing, A. C. Idealism : A Critical Survey, London, 1934

Garbe, R. The Philosophy of Ancient India, The Open Court Publishing Co., Chicago, 1899.

Hiriyrnna, M. Outlines of Indian Philosophy, Bombay, 1979

The Essentials of Indian Philosophy, Unwin (R) Paperback, 1978

Journal of Royal Asiatic Society 1934, 1936

Mookherjee, Satkari — The : Nava-Nalanda-Mahavihara Resarch Publications Nalanda, 1957

Nagarjuna — Vigraha Vyawartani, English Translation by Satkari Mookerjee in The Nava Nalanda Mahavihara Nalanda, 1957

Baidalya-Sutra and Prakarana.

Kant — Critique of Pure Reason. Abridged Edition by Norman Kemp Smith, London, 1934

" — Prolegomena to an Idealist theory of Knowledge.

Radhakrishnan, S. — Indian Philosophy, London, 1923

History of Philosophy Eastern and Western, London, 1953

An Idealist View of Life, London

Raju, P. T — Idealist thought of India, London, 1953

Shah, N J — Akalanka's Criticism of Dharmakirti's Philosophy, Ahmedabad

Ryhs, Davids — Buddhism . Its History and Literature, Newyork & London, 3rd Ed , 1896

Stchervatsky — Papers of Stchervatsky : Translated by H. C. Gupta and Edited by D. Chattopadhyaya.

The Conception of Buddhist Nir-

vana, Reprinted, Delhi, 1977

Madhyanta Vibhanga : Discourse on discrimination Between Middle and Extremes, Reprint Calcutta, 71.

Buddhist Logic, Reprint, New York, 1962

Tucci, G. — In, The Proceedings of the Indian Philosophical Congress. 1925

Taranatha — History of Buddhism in India. Translated from Tibetan by Lama Chimpa & Aloka Chattopadhyaya Simla, 1970

Tribaut, G. — Sacred Books of the East Vols xxxiii —xxxiv

Venkat Raman, K. — Nagarjuna's Philosophy : As presented in the Mahaprajna-Paramita-Sastra, Rutland Vermont-Tokyo Japan, 1966.

কিন্তু পূর্বের প্রমাণ পরীক্ষণে দেখানো গেছে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে এই ব্যবহারিক জগৎ শূন্য, অলীক ভিন্ন কিছুই নয়। যেমন স্বপ্ন, ভ্রম, মায়ার প্রভাবে আমরা মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করে থাকি। কিন্তু সেই ব্যবহারিক জগৎ ও বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ও আকাশকুসুমের মতই অলীক কল্পনাপ্রসূত। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সম্বৃতি সত্য আবরণস্বরূপ কাজ করে। অতএব সত্য দু প্রকার, সম্বৃতি বা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শঙ্কর তিন প্রকার সত্যের উল্লেখ করেছেন— প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। আসলে সম্বৃতি সত্যকে তিনি দু ভাগে ভাগ করেছেন। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক। তাঁকে যাতে কেউ সরাসরি মহাযানপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করতে না পারে। সেই জন্যই শঙ্কর প্রাতিভাসিক সত্যের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য শঙ্কর প্রাতিভাসিক সত্যের উল্লেখ করলেও জোর দিয়েছেন ব্যবহারিক সত্যের উপরই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। মনে হয় ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। কিন্তু পারমার্থিক সত্যের দিক থেকে ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা বা সংহারকর্তা কিছুই নয়। অজ্ঞতার জন্যই এই জগতকে সত্য বলে মনে করি। ব্রহ্মকে স্রষ্টা বলি। কিন্তু ব্রহ্মের এইরূপ বর্ণনা তাঁর স্বরূপ লক্ষণের বর্ণনা নয় তাঁর আকস্মিক বা তটস্থ লক্ষণের বর্ণনা। ব্যবহারিক দিক থেকে ব্রহ্মন্‌কে নির্গুণ নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ সগুণ সক্রিয় ব্রহ্মন্ সসীম ও বিশেষ হয়ে পড়ে। ক্রিয়াসর্বস্ব হয়ে যান। ক্রিয়া মানেই পরিবর্তন। কিন্তু ব্রহ্মের কোন অবস্থান্তর সম্ভব নয়। মায়াধীন ব্রহ্মন্ মায়া শক্তির প্রভাবে জগৎ রূপে প্রকাশিত হলো। অজ্ঞ ব্যক্তি অবিদ্যার প্রভাবেই ব্যবহারিক জগতকে একমাত্র সত্য বলে জানে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ মাত্রেই জানেন এই জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নামরূপময় ব্যবহারিক জগৎ প্রহেলিকায় মিলিয়ে যায়। তাই ব্রহ্মবিদের কাছে মায়া নাই, জগৎ নাই আছে শুধু অসীম অনন্ত ব্রহ্ম— পারমার্থিক সত্য।

ভাববাদ বিরোধী দর্শন সম্প্রদায়

ভাববাদ বিরোধিতা যে ভারতীয় দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক একথা যেমন আজও পর্যন্ত অনালোচিত তেমনি আলোচিত লোকায়ত মত ও ঘৃণ্য বিতণ্ডাসর্বস্ব বলে পরিত্যক্ত। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে[1]

পাষণ্ডিনঃ বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীন্ চ বাঙমাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।

হৈতুক পাষণ্ডদের, শঠ, বিড়াল তপস্বীদের সঙ্গে বাক্যালাপও বারণ। কেবল মনুই যে এই অনুশা[illegible] াজে তার যে কঠোর প্রয়োগ [illegible] আধুনিক বিদ্বানো লোকা[illegible] াতে রাম ভরতগ্রহণ করেছেন যেমন, পিটার্সবার্গ অ[illegible] দেশ দেন—[2] য়ালিসম্ বা বস্তুবাদ। মনিয়ার-[illegible]

[illegible] ী দার্শনিক ক্লীবলিঙ্গে নি[illegible]

[illegible] ন তর্করত্ন, রাধাকৃষ্ণণ প্র[illegible]

অ[illegible] অর্থাৎ বস্তুবাদী,—দর্শন অ[illegible]

[illegible] োপাধ্যায় নানান উদ্ধৃতির, মধ্য দিয়ে [illegible] লোকায়ত দর্শনই হলো বস্তুবাদী দর্শন।

এই লোকায়ত দর্শন ও দার্শনিকদের ভারতীয় দর্শনে নানান পর্যায়ে নানান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যথাক্রমে হৈতুক, নাস্তিক, বিতণ্ডা, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি নামে। আর সকল ক্ষেত্রেই এদের ঘৃণার নিষ্ঠীবন ছিটোনো হয়েছে প্রতিপক্ষীয় দার্শনিকদের দিক থেকে। অবশ্য লোকায়তিকগণও কম যান নি। বেদনিন্দায় তাঁরা কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। সকল প্রতিপক্ষীয় দার্শনিকই একবাক্যে বলেছেন লোকায়ত দর্শন বেদ বিরোধী। মনুর ভাষায়, **'সঃ সাধুভিঃ বহিষ্কার্যঃ নাস্তিকঃ বেদ নিন্দকঃ'।** তাঁরা টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেছেন, **'হৈতুকা বেদবিরোধিতর্ক ব্যবহারিণঃ।** অযোধ্যাকাণ্ডে ও রাম ভরতকে বলেছেন, **বুদ্ধিম্ আন্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থকং প্রবদন্তি তে।** এইভাবে লোকায়ত মতকে কখনোই দর্শনের পরিধির মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নি।

অপরপক্ষে পরা বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হলো ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা

জানা যায়, অর্থাৎ যার দ্বারা ওঁকার বা ব্রহ্মণ্‌কে জানা যায়। এখান থেকে প্রমাণিত যে পরা এবং অপরা বিদ্যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম বিদ্যা ও লোকায়ত বিদ্যা, যার উপহাস পূর্বক ব্যাখ্যা অবিদ্যা, এই দুই প্রকার বিদ্যাই দু প্রকার দর্শন। যথাক্রমে লোকায়ত দর্শন ও ব্রহ্মদর্শন।

লোকায়ত শব্দটি নিয়ে প্রায় সকল চিন্তাবিদই একমত যে এটি—**লোকেষু আয়তঃ**। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে দর্শন তাই হলো লোকায়ত। অতএব লোকায়ত দর্শন হলো জনগণের দর্শন। আধুনিক অভিধানে এই লোকায়ত শব্দটিকে ইংরেজী মেটিরিয়ালিজম্‌, শব্দার্থ ও করা হয়েছে। আধুনিক বিদ্বান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা[৪] আমরা তুলে ধরছি "স্বভাব[illegible]য়ত শব্দটিকে সরাসরি বস্তুবাদ অর্থে [illegible] লোকায়তের শব্দার্থ মেটি[illegible]ন উচ্চারণ করেছেন তা নয়, স[illegible] পুংলিঙ্গে শব্দটির অর্থ বস্তুবা[illegible] আমরা রামায়ণে পাই। অযোধ্যাক[illegible] জকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চা[illegible]ল সংবাদাদি জিজ্ঞেস করার পর [illegible]লোক বা ইহলোক-সর্বস্ব, [illegible] ব্যবহৃত।"

[illegible]**ত্তকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে** [illegible]করেছেন যে

> **[illegible]হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥**
> **[illegible] মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।**
> **বুদ্ধিম্ আন্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থকং প্রবদন্তি তে ॥**

রাম বলেন হে বৎস, তুমি লোকায়ত ব্রাহ্মণদের সেবা করছ না তো? তারা অনর্থকুশল পণ্ডিতাভিমানী ও বালকের মত মূর্খ। ধর্মশাস্ত্র অবজ্ঞা করে লৌকিক তর্কপদ্ধতি আশ্রয় করে অর্থহীন বচসা করে।

এই ভাবে আমরা অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরতে পারি যেখানে দেখা যাবে যে লোকায়তদের অপাঙ্‌ক্তেয় করার বিধান বর্তমান। এর থেকে বোঝা যায় সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই দু প্রকার দর্শনই সমাজে প্রচলিত। মুণ্ডক উপনিষদে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে। দু প্রকার বিদ্যা বর্তমান। একটি অপরা বা নিকৃষ্ট, আর একটি পরা বা শ্রেষ্ঠ। অপরা বিদ্যাই অবিদ্যা। পরা বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। এখন পরাবিদ্যা কি? বিদ্যা হলো সেই বিদ্যা—**যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে**। যার দ্বারা সেই অক্ষরকে

হলো ব্রহ্ম দর্শন। মনু তাঁর সংহিতায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে[4]—

'আর্ষং ধর্মোপদেশং চ বেদ-শাস্ত্র অবিরোধিনা।
যঃ তর্কেণ অনুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ ন ইতরঃ ॥'

বিরোধবাধক তর্ক পরিহার করে গভীর মনোনিবেশে যিনি বেদ শাস্ত্রও ধর্মশাস্ত্র রপ্ত করেন তিনিই কেবল মাত্র প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেন, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। এখানে প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র বলতে মনু ব্রহ্মশাস্ত্রকে বুঝিয়েছেন। সমগ্র বৈদিক ভাবনায় অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে যা ছিল একত্ববাদ তা উপনিষদে স্পষ্ট হয়ে উঠে ব্রহ্মবাদে এই—ব্রহ্মাণ্ড জড় ও চেতন : বিষয় ও বিষয়ীরূপে প্রকাশিত। বিষয়গত জগতের অন্তর্নিহিত স্বরূপ ব্রহ্ম আর বিষয়ীগত জগতের অন্তর্নিহিত স্বরূপ আত্মা। কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন। শুধু উপলব্ধির দুই রীতির জন্য এই প্রকার ভেদ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা তত্ত্বমসি' উপলব্ধিতেই পূর্ণ সত্তার পরিচায়ক। এই অদ্বৈত চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভবই হলো ব্রহ্ম বিদ্যা বা ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর উৎসই এই ব্রহ্মণ্ বা আত্মন্ তাই ব্রহ্মবাদ চেতনকারণবাদ রূপে চিহ্নিত। চেতনকারণবাদের নামান্তরই হলো ভাববাদ। চিন্তা, ভাব, ধারণা ইত্যাদি এককথায় চেতনাই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা। চেতনাই একমাত্র অদ্বৈত পরম বা চরম সত্য। এই একতত্ত্ববাদী ব্রহ্ম দর্শনই ভাববাদ রূপে চিহ্নিত।

এখান থেকে এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ ও ভাববাদবিরোধিতা পাশাপাশি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। রাজা ও প্রজার বিরোধের মত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণিত যে ব্রহ্মদর্শন বা ভাববাদই ছিল রাজদর্শন। অপর-পক্ষে লোকায়তদর্শন বা বস্তুবাদই ছিল প্রজাদর্শন। স্বভাবতই ভাববাদ রাজদর্শন হওয়ার জন্য অস্ত্র ও অর্থে পুষ্ট হয়ে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী হয়েছিল, তা সত্ত্বেও জলে যেমন মাছ থাকে তেমনই প্রজার মধ্যে শিকড় চারিয়ে রেখেছিল লোকায়ত দর্শন। কিন্তু রাজন্যপুষ্ট প্রচারের ঢক্-কানিনাদে ও অত্যাচারের বন্যায় ভারতীয় দর্শনের ভাববাদ বিরোধিতার দিক অনালোচিত ও অন্তরালে স্থান পেয়ে কোনরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে

রেখেছে। রাজা রামচন্দ্রের উক্তি থেকেই একথা প্রমাণিত যে সর্বকালের সর্ব দেশে ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় টিকে ছিল। রাজন্য সহায়তা বঞ্চিত হয়ে তেমন কেউ প্রতিভাধর এগিয়ে এসে রাজন্য অত্যাচার প্রতিহত করে ভাববাদী বিরোধী ধারাকে কোন সংহত রূপ দান করতে পারেন নি। তাহলে পাশ্চাত্য জগতে ও পূর্বে, প্রাচ্য দর্শনের যে দ্বান্দ্বিক রূপ প্রকটিতছিল তা উদ্ঘাটিত হোত। তবু ও আক্ষেপের সময় নেই। ভাববাদ বিরোধী দর্শনকে স্বমহিমায় স্থিত করতে হবে।

বিরল ব্যতিক্রম বিদ্বান অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণায় দেখি তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে[৫] "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষটি সর্বপ্রথম রূপায়িত হয় দেহাত্মবাদ-বনাম-দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বসংক্রান্ত মত সংঘর্ষ হিসাবেই।" অতএব ভাববাদ বিরোধিতার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সেই প্রাচীন বৈদিক যুগেই যেতে হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভাববাদ ও তো সেই বেদ-উপনিষদ আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য যে বেদ উপনিষদে বিশেষ করে উপনিষদের শেষতম পর্যায়ে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু আদিতে বেদ-উপনিষদে ভাববাদী ধারা তো ছিলই না বরং সেই ভাবধারা এমনই আদিম পর্যায়ে ছিল যে সেখানে প্রকৃতিবাদ ভিন্ন অন্য কোন ভাবধারাই গড়ে ওঠার অবকাশ পায় নি। কারণ কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে অমূর্ত দার্শনিক চিন্তার অবকাশ কোথায়? অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে[৬] "অন্ন চিন্তাই যেন বৈদিক কবিদের পরম চিন্তা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য নয়। সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে তাই কয়েকটি নেহাৎই পার্থিব কামনার যেন অন্তহীন পুনরুক্তি এবং কামনাগুলিও ওই অনুন্নত পর্যায়ের অনুরূপ, অন্নের কামনা, পশুর কামনা, সন্তানের কামনা, ইত্যাদি। ঋগ্বেদের ঋষিরা তো ননই—এমনকি উপনিষদের ঋষিরাও সর্বত্র সমানভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণার বাস্তবতা এবং অন্নের গরিমা উপেক্ষা করেন নি।"

অবশ্যই অন্যান্য আদিম ও অনুন্নত মানুষদের মনেও পৌরাণিক বিশ্বাস ছিল। ঋগ্বেদ তাই বহু দেবতার কথায় ভরপুর। কিন্তু এই দেবতাদের নজির থেকে ও ঋগ্বেদে প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ প্রমাণিত হয় না। কেননা পার্থিব কামনাই এই দেব কল্পনার প্রধানতম উপাদান এবং বৈদিক দেবতা
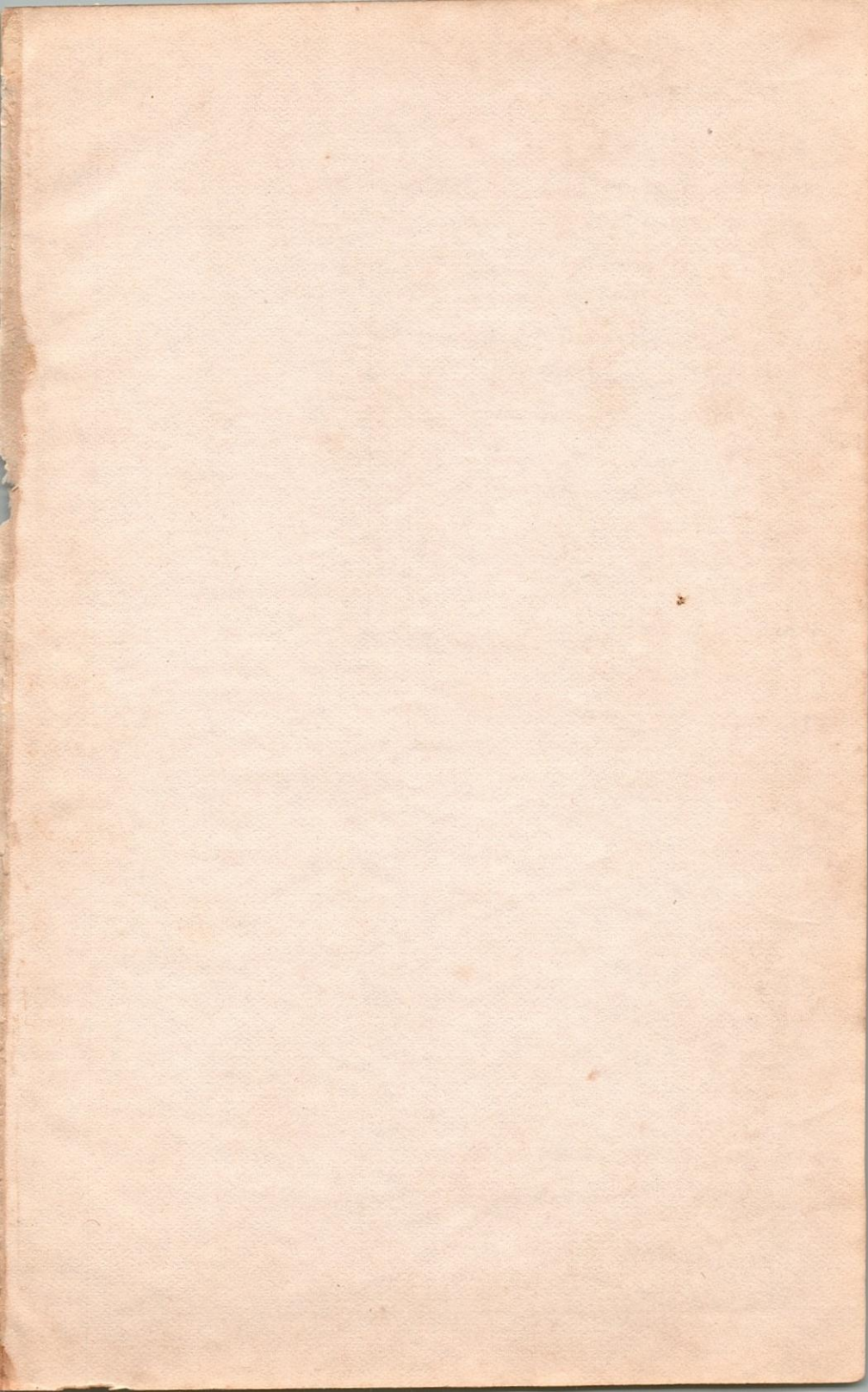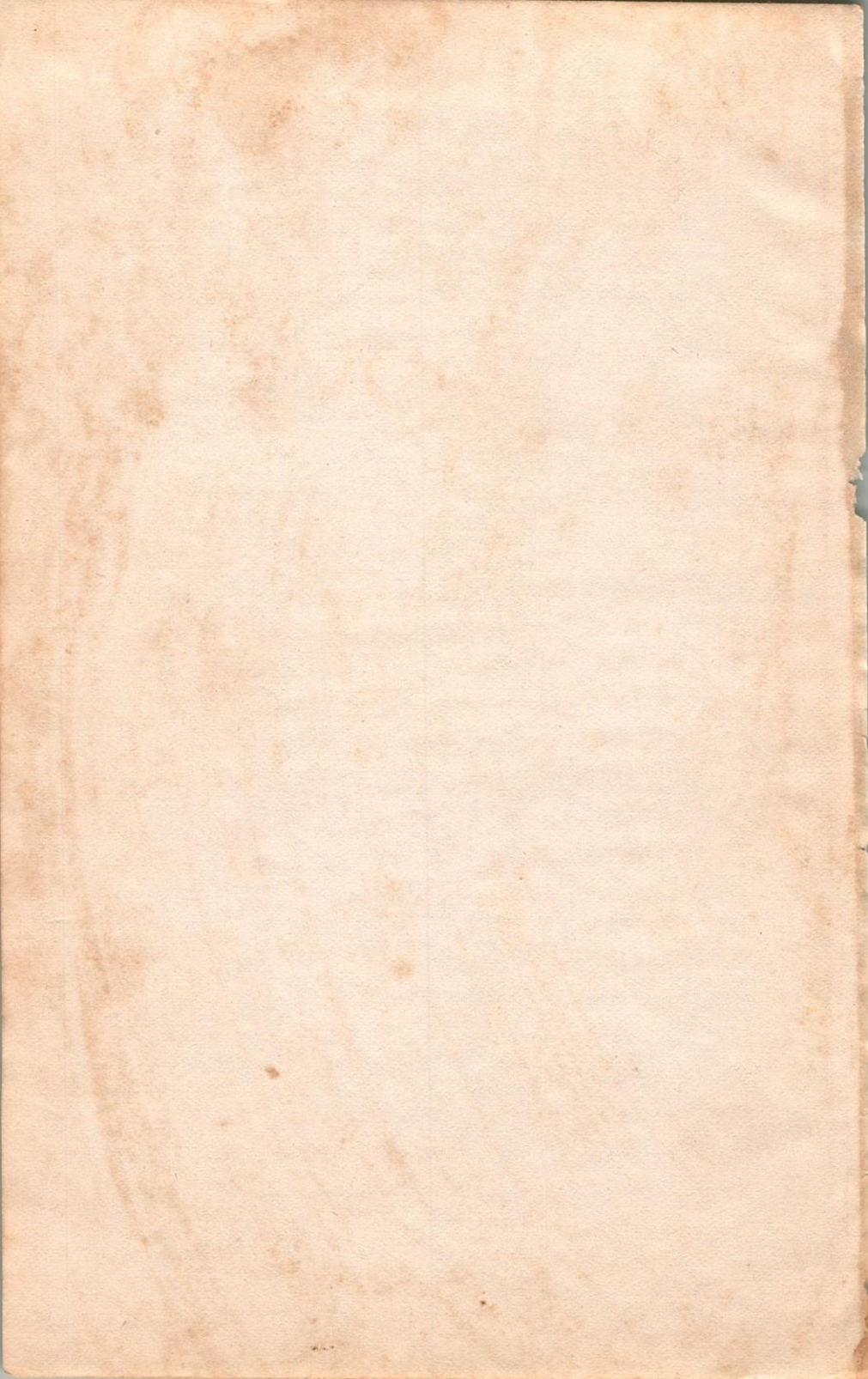
Page No. 12, 13, 14, 15

missing, alas!

Page No. 13 "চতুর্থ অধ্যায়"

"ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়"

ভারতবর্ষে দর্শনচর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। নানান প্রথিতযশা চিন্তাবিদ নানাভাবে এই ভারতীয় দর্শনের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পরিতাপের বিষয় ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আজও ভুল বোঝার অবকাশ বর্তমান। দেশে, বিদেশে বিদ্বান থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের আজও বিশ্বাস ভারতীয় দর্শন অধ্যাত্মবাদ সর্বস্ব, ভাববাদী। আবার অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ নয়, তবু অনেকেই এক করে দেখতে অভ্যস্ত। অথচ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস মোটেও তা নয়। উন্মেষলগ্ন থেকেই পরস্পর মত সংঘর্ষে বিপরীতমুখী ধারায় ভারতীয় দর্শন সমৃদ্ধ। এই দুই ধারা হলো, বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ। ভাববাদী দর্শন চিন্তার পাশাপাশি বস্তুবাদী দর্শনচিন্তার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তা নিয়ে গর্ব করার কারণ আছে। ভারতীয় দর্শনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির অনুকূলে বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বর্তমান গ্রন্থটির পরিকল্পনা।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক ডঃ দত্ত পেশায় অধ্যাপক। নিরন্তর দর্শন চর্চার পাশাপাশি সাহিত্যের আঙিনায় অনায়াস পদচারণার স্বাক্ষর তিনি ইতিমধ্যেই রেখেছেন।

আঠাশ টাকা